ঝড়

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ৯

প্রকাশক : শ্রীফণিভূষণ দেব
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রক : শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন
কলিকাতা ৯

প্রচ্ছদ : সুবোধ দাশগুপ্ত

প্রথম সংস্করণ : জুলাই ১৯৫৯

ঝড়

ওবেলা ভাতে জল দিয়ে রেখেছিল সে। কাজেই এবেলা নতুন করে উনুন ধরিয়ে ভাত ফুটাবার হাঙ্গামা করতে হবে না ভেবে সে খুশি হলো।

নিজের জন্য কে এত পরিশ্রম করে।

সময় সময় ওদিকে গেলে রেলস্টেশনের স্টল থেকে সে পাঁউরুটি কিনে আনে। মুড়ি পেলে মুড়িও নিয়ে আসে।

কতদিন তেলমুড়ি চিবিয়ে বা একটু চিনি দিয়ে পাঁউরুটি খেয়ে রাত্রের আহারটা সে সেরে নেয়।

তার অর্থ দু'বেলা উনুন ধরিয়ে রাঁধতে বসা পোষায় না। কোনো পুরুষের পক্ষেই তা সম্ভব না।

উনুন গুঁতোগুঁতি করা হাঁড়ি ঠেলা মেয়েদের কর্ম।

ওরা এসব খুব পারে। ভালও বাসে।

অবশ্য এর ব্যতিক্রমও দেখা যায়। পুরুষের মতন রান্নার ব্যাপারটাকে যমের মতন ভয় করে এমন মেয়েও আছে। সে নিজের চোখে দেখেছে।

যাই হোক, কোন্ মেয়ে রাঁধতে ভালবাসে, কোন্ মেয়ে বিছানায় শুয়ে কেবল নভেল পড়তে কি সেজেগুজে জানালার পাশে চুপ করে বসে থাকতে পছন্দ করে বেশি, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার তার সময় ছিল না।

সূর্য গাছের মাথায় নেমে এসেছে।

তার মানে বড় জোর আর এক ঘণ্টা বেলা আছে। তারপর অন্ধকার হয়ে যাবে। কার্তিক মাস। যেন এখন থেকেই একটু ঠাণ্ডা পড়তে আরম্ভ করেছে। সকালের দিকে তো বটেই, বেলা পড়ে এলেও ঠাণ্ডাটা বেশ অনুভব করা যাচ্ছে।

বুদ্ধি করে ঘরে কিছু শুকনো মাছ রেখে দিয়েছে সে। আর উঠোনের গাছে তো লঙ্কা আছেই। কাজেই রাত্রে ফিরে এসে খাওয়ার জন্য কোনোরকম হাঙ্গামা তাকে করতে হচ্ছে না, শুকনো মাছটা পুড়িয়ে নিলেই হবে। মোটের ওপর সন্ধ্যার আগেই সে ওখানে গিয়ে পৌঁছতে চায়। তা ছাড়া আজ শনিবার। রণধীর নিশ্চয় সকাল সকাল বাড়ি ফিরেছে।

হুঁ, রণধীর বাড়ি ফিরেছে জেনেই সে এখন ওখানে যাবে। রণধীর বাড়ি না থাকলে সে যেত না, পারতপক্ষে সে যায়ও না।

কথাটা চিন্তা করে মনে মনে সে হাসল। তার বন্ধু। বাল্যবন্ধু। অথচ কত যেন পর হয়ে গেছে। তাই হয়। রণধীর বিয়ে করেছে। টুকটুকে বৌ রয়েছে ঘরে। আর সে এখনো 'ভেরেণ্ডা ভাজছে'। এটা অবশ্য রণধীরের কথাই।

যাই হোক, ব্যাচেলার মানুষ, হুটহাট ওদের আস্তানায় ছুটে যাওয়াটা কিছু কাজের কথা নয়। বেশ একটু সঙ্কোচবোধ করে সে। শুনলে অবশ্য ওরা দু'জনেই হাসবে। এবং রণধীর যে তার পিঠে তৎক্ষণাৎ একটা কিল বসিয়ে দিয়ে 'হাম্বাগ, স্কাউণ্ড্রেল—তোমার পেটে পেটে এত—' ইত্যাদি বলে গালি-গালাজ শুরু করবে তাও সে জানে। এবং আর একজনও, গালি-গালাজ করবে না, তবে রণধীরের মতন প্রথমটায় এক দফা হেসে নেবে। তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যাবে, ভুরু দুটো ঈষৎ টান করে কালো চোখের দৃষ্টি খরতর করে তার মুখটা দেখবে, তার চোখ-মুখ পরীক্ষা করবে এবং পরীক্ষা করা হয়ে যাবার পর দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে নিয়ে একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলবে। ছবিটা কতদিনই কল্পনা করেছে সে।

অবশ্য ঐ ছবি ঐ মুখ কল্পনা করতে তার ভালই লাগে।

কেবল মুখ না চোখ না, গোটা মানুষটাই যেন যখন-তখন ছবির মতন তার চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়, কথা বলে, হাসে, আবার গম্ভীরও হয়, দীর্ঘশ্বাসও ফেলে সময় সময়।

সত্যি, ব্রততীর কালো চোখ যখন হাসির রৌদ্র লেগে ঝকমক করতে থাকে আবার মুহূর্তের মধ্যে গম্ভীর হয়ে যাবার পর সেই চোখ সেই মুখই মেঘলা আকাশ হয়ে থমথম করতে থাকে, তখন যে তার কী ভাল লাগে সেই মুখ দেখতে।

এটা তার ভিতরের কথা, মনের গভীরের গোপন কথা। ব্রততীর হাসি তার কাছে যেমন সুন্দর তেমনি তার হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যাওয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলার দৃশ্যও তার কাছে সুন্দর। আত্মহারা হয়ে যাবার মতন অবস্থা ঘটে তার।

তখন সে নিজেকে ধমক দেয় শাসন করে—ছি, তোমার বন্ধুপত্নী, রণধীর তোমাকে মায়ের পেটের ভাইয়ের মতন বিশ্বাস করে, ভালবাসে ; ব্রততী তোমাকে বিশ্বাস করে, শ্রদ্ধা করে। এই অবস্থায় একটা লোভ একটা বাসনা ভিতরে লুকিয়ে রেখে ওখানে আনাগোনা করা এবং হাঁ করে ওর দিকে তাকিয়ে থাকা তোমার পক্ষে অত্যন্ত অন্যায়। পাপ বলা যায় এটা। হতে পারে যুবতী সুন্দরী, অঘ্রানের রৌদ্র-লাগা পাকা খড়ের মতন তার গায়ের চামড়া উজ্জ্বল, আঁটোসাটো শরীর ফুলের ডাঁটের মতন দীর্ঘ ঋজু, অনবদ্য হাত-পায়ের আঙুল, মাথার চুল ভুরু। তা হলোই বা, পৃথিবীতে কি আর রূপসী নেই, যুবতী নেই। তুমি ওদের দিকে যতক্ষণ খুশি তাকিয়ে থাক, ওদের ছবি যত খুশি মনের পটে আঁকতে থাক তাতে দোষ নেই, কিন্তু এখানে—

সে দমে যায়। এমন কি একটা অনুশোচনা নিয়েও সে মাঝে মাঝে ওখান থেকে ফিরে এসেছে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছে, এই মন নিয়ে, এই দৃষ্টি নিয়ে আর সে ওদের কাছে যাবে না। যাওয়া উচিত নয়। হয়তো রণধীরও পাশেই বসা ছিল তখন, ব্রততী চা করছিল। রণধীর যেমন তার সঙ্গে গল্প করছিল, তেমনি ব্রততীও চুপ করে ছিল না। চুপ করে সে কখনই থাকে না। ফোয়ারার মতন তার মুখ থেকে অনর্গল কথা ঝরছিল, হাসি উপছে পড়ছিল। ওদিকে

তার হাতও যে অবসর ছিল এমন না, কেটলিতে চা ভিজিয়ে সে রুটি সেঁকছিল, সেঁকা হয়ে যাবার ওর প্রত্যেকটা রুটির টুকরোয় যত্ন করে মাখন মাখাচ্ছিল, হয়তো ঘুরে বসে সে হাতের কাজ শেষ করে যাচ্ছিল। আর এদিকে রণধীরের সঙ্গে কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে চোরের মতন চোখটা এক-একবার আড় করে সে ব্রততীর সুন্দর শরীরটা দেখেছে, চাঁপার কলির মতন তার আঙুলগুলির নড়াচড়া দেখেছে। রণধীরও তখন স্ত্রীর দিকে চোখ রেখে কথা বলছিল কিনা। সেই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছে সে। রণধীর যেইমাত্র তার দিকে চোখ ফিরিয়েছে সে-ও ব্রততীর দিক থেকে চোখটা সরিয়ে এনেছে বা ব্রততীর সঙ্গে যদি ঐ অবস্থায় চোখাচোখি হয়ে গেছে তো তৎক্ষণাৎ কেমন অপ্রস্তুত হয়ে অনেকটা অপরাধীর চেহারা নিয়ে সে অন্যদিকে তাকিয়েছে।

এই নীচতা কেন, এই জঘন্য মনোবৃত্তি কেন তার। রণধীর বুঝতে না পারুক, ব্রততী মেয়ে—মেয়েদের দিকে একটি পুরুষ চুরি করে কখন তাকায় কেন তাকায়, পর পর ক'দিনই ব্রততীর কাছে ধরা পড়ে যাবার পর ব্রততী কি তার সম্পর্কে খুব একটা উঁচু ধারণা পোষণ করে আছে বলে সে আশা করতে পারে! না, তা আর কি করে সম্ভব।

কিন্তু বুদ্ধিমতী ব্রততী যে সেই জিনিস তাকে ঘুণাক্ষরেও বুঝতে দেবে না, এ-ও ঠিক। তাই তো সে দেখে আসছে।

এই জন্যই তার অস্বস্তি বেশি।

এই জন্যই সময় সময় ভয়ঙ্কর অনুতাপ হয়। ব্রততীর হাসি তাকানো কত নিষ্কলুষ, কত সরল সহজ তার কথা বলার ভঙ্গি। কত নির্মল আন্তরিকতায় ভরা তার আদর-আপ্যায়ন।

যদি একদিনও এর একটু ব্যতিক্রম দেখতে পেত সে তবে বুঝি তার ভিতরের অপরাধের বোঝাটা লাঘব হতো।

তাই এক-এক দিন ওদের ওখান থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে তার মনে হয়েছে, আর একদিনও সেখানে তার যাওয়া হবে না।

তারপর দু'-তিন দিন হয়তো যায়ও নি।

কিন্তু দেখা গেল তিন দিন পার হবার পর চতুর্থ দিন সন্ধ্যাবেলা রণধীর নিজে তার ডেরায় এসে উপস্থিত। চা-বাগান থেকে হয়তো বাড়িও ফেরে নি। সেখান থেকে মোটর সাইকেলে চড়ে সে সোজা তার এখানে চলে এসেছে। চোখেমুখে একটা ব্যস্ততা একটু যেন উদ্বেগও লেগে রয়েছে।

'কি হলো, হঠাৎ এমন ডুব দিয়ে আছিস যে?'

রণধীর তার কাঁধে হাত রেখে প্রথমেই এই প্রশ্ন করবে। করেছে। আর তখন 'কাজের চাপ ছিল' 'শরীরটা তেমন ভাল ছিল না' ইত্যাদি মিথ্যা কথা তাকে বলতে হয়েছে। এ ছাড়া আর কি বলত সে!

রণধীর তাই বিশ্বাস করেছে।

'বেশ তো, আজ নিশ্চয় আর তেমন কাজ নেই, আজ বোধ করি শরীর ভালই আছে, চল আমার সঙ্গে।' শিশুর মতন চমৎকার হেসে এমন একটা আব্দারের ভঙ্গি নিয়ে রণধীর তার কাঁধ ধরে সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁকুনি দিয়েছে যে, 'যাব না' এমন কথা মুখ দিয়ে বার করতে সে লজ্জাবোধ করেছে। অগত্যা তখন গা ঝাড়া দিয়ে সে উঠে বসেছে, তারপর জামা-কাপড় পরে ঘরের জানালা-টানালা বন্ধ করে দরজায় তালা ঝুলিয়ে রণধীরের সাইকেলের পিছনে চেপে বসেছে। তার নিজের মোটর সাইকেল নেই, ওই জিনিস চালান তার অভ্যাসও নেই। রণধীর যদি দু'চাকার গাড়িটা নিয়ে তাকে কোনোদিন ডাকতে এসেছে তো তার গাড়ির পিছনে বসেই সে রাণীরবাগ রণধীরের আস্তানায় চলে গিয়েছে। এখান থেকে দূর কম না। তিন মাইলের বেশি পথ। তা ছাড়া সব জায়গায় রাস্তা ভাল না। একটা বড় নালা আছে, ভাঙন আছে খানিকটা জায়গায়। তখন আর গাড়ি চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। দু'দিক থেকে কাঁটালতা এমনভাবে এসে গায়ে মাথায় লাগে, পায়ে হেঁটে সাইকেলটাকে ঠেলে নিয়ে জায়গাটা

পার হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। তেমনি বাঁশের সাঁকোর ওপর দিয়ে নালাটা পার হবার সময়ও মোটর বাইক হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে হয়। তা দু'-এক জায়গায় এধরনের অসুবিধা থাকলেও গাড়ি চড়ে যাওয়া আর হেঁটে এতটা পথ যাওয়ায় অনেক তফাৎ। একলা যেদিন তাকে হেঁটে হেঁটে রাণীরবাগ যেতে হয় সেদিন সে পথের দূরত্বটা বিলক্ষণ টের পায়।

এমন তো হয়েছেই। সেদিন সে তার এই জঙ্গলের ডেরায় দাঁতমুখ খিঁচে চুপ করে বসে আছে। রাণীরবাগ ছুটে যাবার প্রবল ইচ্ছা তাকে ঝড়ের মতন এক-এক সময় নাড়া দিয়েছে সত্য, কিন্তু প্রলোভন জয় করতে হবে, কিছুতেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হতে দেবে না—কথাটা মনে হওয়া মাত্র পাথরের মতন সে স্থির হয়ে গেছে। ভিতরে ভিতরে কষ্ট হয়েছে, যন্ত্রণা পেয়েছে—তা হলেও নিজেকে বুঝিয়েছে, আজ কষ্ট হবে কাল কষ্ট হবে, কিন্তু তারপর এই জিনিস সহ্য হয়ে যাবে—একটি মানুষকে ভুলতে, একটি মুখ চিরদিনের মতো ভুলে যেতে বেশি সময় লাগার তো কথা নয়, বিশেষ করে এই মানুষের সঙ্গে তার সম্পর্ক কী—ক'দিন সে তাকে দেখেছে? এক বছর দেড় বছর? না, দেড় বছর হবে না, আশ্বিনে আশ্বিনে এক বছর—তার আগের এক শ্রাবণের তেইশ তারিখে রণধীর বিয়ে করেছিল। ভয়ানক দুর্যোগের রাত ছিল। তার পরিষ্কার মনে আছে। তাদের কলকাতার পটলডাঙার মেস থেকে বৃষ্টি মাথায় নিয়ে রণধীর বিয়ে করতে রওনা হয়েছিল। রণধীরের অন্য বন্ধুদের সঙ্গে সে-ও বিয়ের আসরে উপস্থিত ছিল বৈকি। তাকে তো থাকতেই হতো, বিয়ের আলাপের সূত্রপাত থেকে পাকা দেখা পর্যন্ত অগ্রণী হয়ে তাকেই সব করতে হয়েছিল না? মেসের অন্য বন্ধুরা আর ক'দিনের, সেই ছেলেবেলা থেকে রণধীরের বন্ধু সে। সুকিয়া স্ট্রীটের অ্যাডভোকেট নিবারণ চক্রবর্তীর কলেজে পড়া মেয়ে ব্রততীর সঙ্গে রণধীরের বিয়ের প্রস্তাবটা ঠিক কে তাদের সামনে এনে তুলে ধরেছিল আজ আর তার ভাল মনে নেই, মনে

থাকার কথাও নয়, ডাক্তারী পাশ করেছে, স্বাস্থ্য ভাল, দেখতে শুনতে চমৎকার, সচ্চরিত্র—এমন ছেলের পাত্রী জোটাবার জন্য কত ঘটক না ছুটোছুটি করেছিল সেদিন। যাই হোক, এক শ্রাবণের বিকেলে রণধীরের সঙ্গে সুকিয়া স্ট্রীট গিয়ে মেয়েটিকে দেখে এসেছিল সে। ব্রততীকে তার এই প্রথম দেখা। দেখে তার ভাল লেগেছিল। একটু রোগা বলে রণধীর প্রথমটায় একটু খুঁত খুঁত করেছিল যদিও। কিন্তু বন্ধুকে সে তখন বার বার বুঝিয়েছিল, এই রোগা চেহারা থাকবে না মেয়ের, বিয়ের পর সব ঠিক হয়ে যাবে। তাই অবশ্য হয়েছিল, বিয়ের ছু'মাস পরেই আশ্চর্য সুন্দর স্বাস্থ্য হয়েছিল ব্রততীর। না, মোটা নয়, যেন একটি লতা, বৃষ্টির অভাবে সামান্য শুকনো চেহারা ধরেছিল যা, কিন্তু যেই বর্ষা নামল, ঝুপঝুপ করে পুরুষের ভালবাসার বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করল, অমনি দেখতে দেখতে শীর্ণ লতা পরিপুষ্ট হয়ে উঠল, সতেজ লাবণ্য নিয়ে অমিত আবেগ নিয়ে সুখেলাস্যে ব্রততী যেন থরথর করে কাঁপছিল। বিয়ে করে রণধীর বেলগাছিয়া পুলের কাছে আলাদা বাসা নিয়েছিল।

রণধীরের জন্য এই বাসা সে-ই খুঁজে দিয়েছিল। এই জন্যও তাকে ক'দিন কম হাঁটাহাঁটি করতে হয় নি। অবশ্য তারপর কলকাতায় রণধীরকে আর বেশি দিন থাকতে হয় নি। মাস তিনেক পরেই নতুন চাকরি নিয়ে এখানে চলে আসে। তাদের সেই বেলগাছিয়ার বাসায় ব্রততীকে দেখে কথাটা তার প্রথম মনে পড়েছিল। হুঁ, তার নিজের দূরদর্শিতার কথা। তার ভবিষ্যদ্বাণী কেমন .অক্ষরে অক্ষরে ফলে গিয়েছিল। যেন চৈত্রের ক্ষীণতোয়া নদী ভাদ্রের শেষে কানায় কানায় ভরে উঠেছিল। সেদিন তার খুব ইচ্ছা হয়েছিল রণধীরকে কথাটা স্মরণ করিয়ে দেয়। ঐ ইচ্ছা পর্যন্তই— এই সম্পর্কে রণধীরকে কিছু বলতে আর যেন সে সাহস পায় নি। তাই তো, বিয়ের আগে ব্রততী সম্পর্কে অনেক কিছু মন্তব্য করার অধিকার তার ছিল, মেয়ে দেখতে গিয়ে তাকে খুঁটিয়ে দেখা, তার রূপ

যৌবন গায়ের রং মাথার চুল যাচাই করা, তার হাঁটা পরীক্ষা করা, গলার স্বর কেমন সেই সম্পর্কে স্পষ্ট মতামত প্রকাশ করার পথে তার কোনো বাধাই ছিল না। এবং রণধীর তার কাছে তাই আশা করেছিল। কাজেই গলা বড় করে সে-ও তার মতামত ব্যক্ত করেছিল। কিন্তু তাদের বিয়ের পরদিন থেকেই তো সে তৃতীয় ব্যক্তি হয়ে গেল। হতে পারে রণধীর তার বন্ধু, কিন্তু বন্ধুপত্নীর রূপযৌবন নিয়ে সমালোচনা করার অধিকার তার ছিল কি? ছিল না।

চা-বাগানের ডাক্তার হয়ে ব্রততীকে নিয়ে রণধীর রাণীরবাগ চলে আসার প্রায় ছ' মাস পর সে এখানে আসে। অবশ্য বলতে গেলে রণধীরই গরজ করে তাকে এখানে আনিয়েছে। কাঠের ব্যবসা করবে বলে সে এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করছিল। জায়গা পছন্দ হচ্ছিল না। জঙ্গল থাকবে, জঙ্গলে বড় বড় গাছ, যেমন শাল, সেগুন, সুন্দরী ইত্যাদি থাকবে, আবার শুধু গাছ থাকলেই হলো না, গাছ কাটতে পারে, চিরতে পারে এমন লোকজন হাতের কাছে পাওয়া চাই, তারপর সেসব শহরে বাজারে গঞ্জে পাঠাবার জন্য লরী ওয়াগন বা নৌকার সুবিধাও থাকতে হবে, তবে, তবে তো কাঠের ব্যবসা চলবে। এখানে প্রায় সব ক'টা সুবিধা রয়েছে দেখে রণধীর তাকে খবর দিয়ে কলকাতা থেকে নিয়ে আসে। এবং সে এসে চারদিক দেখে-শুনে খুশিই হয়েছিল। এমন জায়গাই সে মনে মনে এতকাল খুঁজেছিল। অবশ্য প্রথম দু'তিন মাস তাকে খুবই কষ্ট করতে হয়েছে। জঙ্গল ইজারা নেওয়া, লোকজন যোগাড় করা, একটা ট্রাক সংগ্রহ করা, তারপর কারখানার জন্য চালা তোলা, নিজের থাকার মত একটা ঘর তোলা—রণধীরও নানাভাবে তাকে সাহায্য করেছে এবং চিঠি লেখালেখি করে রণধীর যখন জানতে পারল সীতাংশু এখানে চলে আসতে রাজী তখন রণধীর খুবই খুশি হয়েছিল। এমন কি একই খামে করে সে এবং ব্রততী পরের ডাকেই তাকে অভিনন্দন

জানিয়ে কলকাতায় চিঠি দেয়। চিঠি দুটো সে যত্ন করে তার স্যুটকেস-এ রেখে দিয়েছে।

এটা অবশ্য তার অনুমান। এখানে আসার পর আজ পর্যন্ত এই সম্পর্কেও রণধীরকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে সে সাহস পায় নি। ব্রততীকে তো নয়-ই।

তার কেন জানি কেবল মনে হয়েছে, কলকাতায় বেলেঘাটার টিমটিমে কাঠের ব্যবসা গুটিয়ে ফেলে সরাসরি জঙ্গলে এসে ভাল করে সীতাংশু ব্যবসা ফেঁদে বসুক, রণধীরকে এই বুদ্ধি ব্রততীই যেন দিয়েছিল। তাই কি?

কথাটা এত গোপনীয় যে এ জিনিস মুখ থেকে বার করা যায় না। এই নিয়ে রঙিন কল্পনার জাল বুনতেই ভাল, এবং ততক্ষণই জিনিসটা সুন্দর থাকে। মুখ থেকে বের করলেই তা অশোভন অশালীন হয়ে পড়বে। সীতাংশু তা বোঝে। এই নিয়ে সে সময় সময় নিজেকে শাসনও করেছে। এটা তোমার নিছক কল্পনা। রণধীর তোমার বাল্যবন্ধু, এক সঙ্গে বড় হয়েছ, এক জায়গায় থেকে দু'জন লেখাপড়া করেছ। দেশ ছেড়ে কলকাতায় এসেও একজন আর একজনকে ছেড়ে থাকতে পার নি। আজ রণধীর তার কর্মস্থলে গিয়ে যদি তোমাকেও কাছে টেনে নিয়ে যেতে চায় তো তাতে অবাক হবার কিছুই নেই। এটাই তো তার পক্ষে স্বাভাবিক। সে তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী। চাকরির দিকে তোমার মন নেই, ব্যবসা-বাণিজ্য করে জীবনে প্রতিষ্ঠালাভই তোমার চিরদিনের কাম্য। কলকাতায় থাকতেও সে তোমাকে সাহায্য করেছে। রণধীর অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। কাঠের ব্যবসা করার মতন পুঁজি তোমার হাতে ছিল না। রণধীরই টাকা-পয়সা দিয়ে প্রথমটায় তোমাকে সাহায্য করেছিল। আজ যদি রণধীর মনে করে রাণীরবাগ কি তার ধারে-কাছে কোথাও কাঠের ব্যবসা খুলে বসলে তুমি সকাল সকাল উন্নতি করতে পারবে এবং এই নিয়ে সমস্ত বিষয় খুলে-মেলে তোমায় পর পর সে চিঠি দিয়ে

থাকে তো সেটাই তো একমাত্র সত্য, এর সঙ্গে ব্রততীকে তুমি জড়াতে চাইছ কেন? ব্রততী হয়তো এ-ব্যাপারে হ্যাঁ, না, কিছুই বলে নি। একমাত্র রণধীরের ইচ্ছায় তুমি এখানে চলে এসেছ। রণধীরের লেখা চিঠিগুলিও তো তোমার স্যুটকেস-এ রয়েছে। কাজেই—

কল্পনাটা রঙিন এবং সুখকরও বটে।

আবার এইজন্য বিবেকের দংশনও সে কম অনুভব করছে কি?

যেন ব্রততী তাকে মনে মনে ভালবাসে। যেন রণধীরের সঙ্গে কলকাতা ছেড়ে এখানে চলে আসার পর সীতাংশুর অদর্শনে সে শুকিয়ে মরছিল। তাই স্বামীকে জপিয়ে জপিয়ে তাকে দিয়ে চিঠি লিখিয়ে সীতাংশুকে সে এখানে নিয়ে এসেছে।

ছি, এমন একটা চিন্তা তার মনে উদয় হয় কেন, সে বুঝতে পারে না। তাদের বিয়ের পর বেলগাছিয়ার বাসায় সীতাংশু ক'দিনই তো গিয়েছিল। ব্রততীর চোখে চেহারায় এমন কোনো জিনিস কি সে দেখতে পেয়েছিল?

কাজেই এই অদ্ভুত আজগুবি ভাবনাটার জন্য তার নিজের ওপর অনেক সময় রাগ হয়েছে, নিজেকে ধিক্কার দিয়েছে সে। এই পাপ চিন্তার প্রশ্রয় দিয়ে ব্রততীর ওপর অবিচার করবে না এমন প্রতিজ্ঞাও মনে মনে কতবার সে করেছে, কিন্তু কতক্ষণ? অবুঝ দামাল শিশু যেমন সহস্র নিষেধ সত্ত্বেও আগুনের দিকে হাত বাড়াতে চায়, তেমনি তার অবাধ্য অশান্ত মন আবার সেই চমৎকার বর্ণাঢ্য চিন্তায় বেলুনটা নিয়ে লোফালুফি করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

কাজেই তার চিন্তার অপরাধের বোঝা ক্রমে বেড়েই চলছিল।

হুঁ, যে কথা হচ্ছিল, তিনদিন রাণীরবাগ গেল না সে, চতুর্থ দিন রণধীর মোটর বাইক নিয়ে ছুটে এল। আর বলামাত্র সীতাংশু তার গাড়ির পিছনে চেপে বসল।

'বুঝলি সীতাংশু', রাস্তায় রণধীর একসময় কথাটা বলে ফেলল। 'ব্রততী ভয়ানক মন খারাপ করে বসে আছে।'

'কেন!' সীতাংশুর বুকের ভিতর হয়তো ঢিব করে উঠল। 'হঠাৎ মন খারাপ কেন?' উৎসুক হয়ে সঙ্গে সঙ্গে সে প্রশ্ন করেছে।

রণধীর হেসেছে।

'তুই অনুমান কর দিকি নি কেন মন খারাপ?'

সীতাংশু চুপ করে থেকে রণধীরের মাথার পিছনটা দেখছিল। তার যেন মনে হলো ডাক্তারের মাথায় শীগ্‌গির টাক পড়বে। মাথার পিছনে খানিকটা জায়গার চুল ইতিমধ্যে বেশ পাতলা হয়ে এসেছে। বস্তুত এই বয়সেই যদি রণধীরের মাথায় টাক দেখা দেয় তো ব্রততী মন খারাপ করবে কি-না সীতাংশু চিন্তা করতে লাগল।

'কি হলো, আমার কথার উত্তর না দিয়ে চুপ করে আছিস যে?' এবার ঢালুর পথে গাড়িটা হঠাৎ নেমে যাচ্ছিল তাই ঝাঁকুনি লেগে রণধীরের কাঁধ দুটো ঈষৎ নেচে উঠল। বলিষ্ঠ কাঁধ। একটু বেঁটে হলেও অত্যন্ত আঁটোসাটো শরীর তার। রণধীরের প্রশস্ত পিঠ ও মজবুত ঘাড়ের ওপর চোখ রেখে সীতাংশু ভাবল, অল্প বয়সে মাথায় টাক পড়ুক কি এখনই দাঁত পড়তে আরম্ভ করুক, রণধীরের লোহার মত শক্ত পিটানো শরীরটা ভাঙতে অনেকদিন লাগবে। যেন সত্তর বছর বয়সেও এই শরীরের কিছুই হবে না।

সীতাংশু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এবং আর চুপ করে থাকা অশোভন হচ্ছে চিন্তা করে সে ঈষৎ হাসল।

'কেন, খুব ঝগড়া-টগড়া করে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলি নাকি, হঠাৎ ব্রততী মন খারাপ করতে যাবে কেন! সব সময় হাসিখুশি থাকে যে মানুষ?'

রণধীর এবার শব্দ করে হেসে উঠেছে।

'তোর যেমন মাথা, যেমন তোর চিন্তার ধারা; ব্রততীকে তুই যতটা নরম ননীর পুতুল মনে করিস আসলে সে তা নয়। বরং তার

উল্টো। কেননা আমার চেয়ে তো তাকে আর কেউ বেশি চেনে নি। আমি জানি বেশ শক্ত ধাতের মেয়ে সে। আমি ঝগড়া করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলে মন খারাপ করে সে গালে হাত দিয়ে বসে থাকার মানুষ মোটেই নয়। বরং দিব্যি খুশি হয়ে খেয়ে-দেয়ে লম্বা হয়ে বিছানায় শুয়ে এক ঘুম ঘুমিয়ে উঠবে।'

'যাঃ', সীতাংশু ছোট করে একটা ধমক দিল। 'মোটেই ব্রততীকে দেখে সে ধরনের মেয়ে মনে হয় না। মনে হয় অত্যন্ত মায়া-মমতায় ভরা তার মন, স্পর্শকাতর এবং অভিমানীও বটে।'

'ওফ্, যেন আমার চেয়ে তুই মানুষটাকে বেশি চিনে ফেলেছিস।' যেন রণধীর আর হাসল না, ভেংচি কাটল। রাস্তা সমান পেয়ে তার গাড়ি দ্রুতবেগে ছুটছিল। কাজেই হঠাৎ সে চুপ করে রইল। সীতাংশুও কথা বলছিল না। দেখতে দেখতে সেই কাঁটা-জঙ্গলে ভরা রাস্তাটা এসে গেল। এবার গাড়ি থামিয়ে দু'জনকে নামতে হলো। রণধীর পকেট থেকে রুমাল বের করে কপাল মুছছিল। সীতাংশু গাড়ির হ্যাণ্ডেল ধরে দাঁড়িয়েছিল। জায়গাটা অত্যন্ত নির্জন। ঝিঁঝি ডাকছিল। এলোমেলো বাতাস বইছিল। গাছের পাতার সরসর শব্দ হচ্ছিল। যেন দাঁড়িয়ে একটু বিশ্রাম করে নিয়ে রণধীর হাঁটতে আরম্ভ করল। সীতাংশু সাইকেলটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল।

'না, আমি আর ব্রততীকে তেমন করে কি করে চিনব।' যেন সীতাংশু হার মানল। 'আমার চেয়ে তুমি তাকে অনেক বেশি চেন জান। সে তোমার স্ত্রী।'

যেন কথাটা শুনে রণধীর খুশি হলো। হাঁটতে হাঁটতে ঘাড় ঘুরিয়ে বন্ধুকে একবার দেখে নিল। সাইকেল নিয়ে সীতাংশু পিছনে হাঁটছিল।

সামনের দিকে চোখ রেখে রণধীর হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'সব স্বামীই যে তাদের স্ত্রীকে ষোল আনা চিনতে পারে, বুঝতে পারে, আমার কিন্তু তা মনে হয় না।'

চমকে উঠে সীতাংশু বন্ধুকে দেখছিল। মুখ দেখা যাচ্ছিল না। মাথার পিছনটা যেখানে চুল পাতলা হয়ে এসেছিল সেই জায়গাটাই সে আবার দেখছিল।

'তা অন্য সব স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কটা শেষ পর্যন্ত কেমন দাঁড়ায় জানি না, কিন্তু সে-সব স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে তোদের দু'জনের তুলনা করলে তো চলে না।'

'কেন চলে না ?' মুখ না ঘুরিয়ে রণধীর প্রশ্ন করল।

'যেহেতু তোদের দু'জনকে আমি সর্বদা দেখছি—' কেশে গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিয়ে সীতাংশু বলল, 'তোদের মধ্যে ভালবাসা একটু বেশি।'

এবার রণধীর দাঁড়িয়ে পড়ে হো-হো করে হাসতে আরম্ভ করল। সীতাংশুকেও দাঁড়াতে হলো। হাসতে হাসতে রণধীরের চোখে বুঝি জল এসে গেল। আবার পকেট থেকে রুমাল বার করে সে চোখ-মুখটা মুছে নিল। তারপর সীতাংশুর কাঁধে হাত রেখে বলল, 'এবার আমি হার মানলাম তোর কাছে—এবার তুই জিতে গেছিস—সত্যি, তোর চোখকে ফাঁকি দেওয়া আমার তো নয়-ই ব্রততীরও সাধ্য নেই —হুঁ, কেন সে মন খারাপ করছিল শোন্, পরশু সারা দুপুর বসে বসে এত ক্ষীরপুলি তৈরি করেছিল বেচারা।'

'হু, তারপর ?' সীতাংশু ভুরু কুঁচকে রইল।

আগের দিন তুই যাস্ নি, ভেবেছিল পরশু যাবি—গেলি না, পরদিনও তোর পাত্তা নেই, কাল পর্যন্ত ক'টা পুলি তোর জন্যে রেখে দিয়েছিল। আজ সকালে সেগুলো পচে উঠতে কুকুরটাকে দিয়ে দিয়েছে।'

কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে গিয়ে সীতাংশু হাসল।

'ও, এই জন্যই ব্রততীর মন খারাপ ?'

'স্বাভাবিক।' রণধীর মাথা ঝাঁকাল। 'রোজ না হোক একদিন অন্তর তো তোকে আমরা কাছে পাই—আত্মীয়-বন্ধু বলতে এখানে

আর আমাদের কে আছে, অথচ তিনদিন তোর দেখা নেই—ওদিকে তোর নাম করে ব্রততী নিজের হাতে ক'টা পিঠে তুলে রাখল, সেগুলোও নষ্ট হলো। আমার পর্যন্ত মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তাই তো আজ ছুটে এলাম। ভাবলাম, কি জানি বেঁচে আছিস কি মরে গেছিস।'

সীতাংশু অন্যদিকে চোখ ফেরাল। বিড়বিড় করে বলল, 'শরীরটা ভাল ছিল না—' তারপর রণধীরের চোখে চোখ রেখে বলল, 'ঠিক আছে, এখন তো তোর সঙ্গে যাচ্ছি, আজ ব্রততীকে গিয়ে বলব আবার পিঠে ভাজতে, পেটভরে তার হাতের পিঠে খেয়ে আসব।'

'আজ অন্য রকম মেনু।' রণধীর ক্ষীণ গলায় হাসল। 'আজ যেন হরিণের মাংস রান্না করছে।'

সীতাংশু লম্বা করে ঘাড় কাত করল।

'বেশ তো, হরিণের মাংসই পেটভরে খাওয়া যাবে।'

হরিণের মাংসই রান্না করেছিল ব্রততী। মাংস দিয়ে ভাত খেতে খেতে সেদিন চোখ আড় করে কতবার যে সে চুরি করে ব্রততীকে দেখল। তিন দিন দেখে নি, তাই চতুর্থ দিন রণধীরের পাশে খেতে বসে ক'দিনের অদর্শনের অভাবটা কড়ায়-গণ্ডায় সে পূরণ করে নিল। তারপর ওখান থেকে বেরিয়ে নিজের আস্তানায় ফেরার সময় শুরু হলো দুঃসহ অন্তর্জ্বালা। এমনও হয়েছিল, যেন পথ চলতে তার কষ্ট হচ্ছিল, একটা গাছের নিচে বসে পড়েছে সে। তারপর চিন্তা করেছে, এখান থেকে তার সরে যাওয়াই ভাল, কলকাতা ফিরে যাবে ; কেননা সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল, টিয়াটুলির এই জঙ্গলে কাঠের ব্যবসা সে চালাতে পারুক না পারুক, রাণীরবাগের একটি শান্তির নীড়ে সত্যি একদিন আগুন ধরিয়ে দেবে হয়তো।

আগুনের স্বপ্ন কি সে দেখছে? আগুন নিয়ে খেলতে কি তার বুক ছট্‌ফট্ করছে!

প্রতিনিয়ত নিজেকে শাসন করেছে সে, কিন্তু তার ভিতরের অবাধ্য পশু সেই শাসন শুনছে কি?

পরিবেশন করতে কি দুই বন্ধুকে খেতে দিয়ে তাদের গল্প শুনতে ব্রততী যতবার রণধীরের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, ততবার পশুটা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। যেন ব্রততীর শরীরের গন্ধ, নিশ্বাসের শব্দ, হাসি কথা ও তাকানোটাই তার প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল—পাতের জিনিসগুলির দিকে একেবারেই মন ছিল না।

তাই ভয় করছিল সীতাংশুর।

ক্রমেই যেন জিনিসটা বেড়ে যাচ্ছে। বলা যায় কি, টিয়াটুলি থেকে রাণীরবাগ মোটে তিন মাইল পথ। কবে সে সেখানে গিয়ে একদিন উপস্থিত হবে, তারপর একটা অনর্থ ঘটিয়ে বসবে; নিজের ওপর যখন তার হাত নেই। কাজেই তার সরে যাওয়াই উচিত। যে-কোন একটা অজুহাত দেখিয়ে সে কলকাতা ফিরে যেতে পারে, এখানকার জলহাওয়া সহ্য হচ্ছে না, টিম্বারের ব্যবসা তেমন ভাল জমছে না—একটা কিছু বললেই হলো। রণধীর বিশ্বাস করবে, ব্রততী বিশ্বাস করবে।

একমাত্র ঐ দুটি মানুষের কাছেই তো জবাবদিহি দেবার প্রয়োজন হবে। আর তাকে কে চেনে এখানে।

এভাবে একদিন, তার পরিষ্কার মনে আছে, রাণীরবাগ থেকে ফিরে আসবার সময় রাস্তার পাশে একটা গাছের নিচে বসে সে প্রায় ঠিক করে ফেলেছিল, এখানে তার কিছুতেই থাকা উচিত হবে না। অন্ধকার বনের পিছনে তখন চাঁদ উঠতে আরম্ভ করেছিল। তার যেন হঠাৎ মনে হয়েছিল, ঐ পরিচ্ছন্ন সুন্দর চাঁদটা হলো ব্রততী।

আর নিচের এই জঙ্গলের অন্ধকার হলো তার, সীতাংশু বাগচীর, মন। কেবল শ্বাপদ ও সরীসৃপের আনাগোনা যেখানটায়।

শ্বাপদ সরীসৃপ চাঁদের কিছু ক্ষতি করতে পারে কি? পারে না। একথাও সে চিন্তা করেছিল।

চাঁদ তার রূপ নিয়ে হাসি নিয়ে পবিত্রতা নিয়ে আকাশে জ্বলবে। আর পৃথিবীর যত গ্লানি অন্ধকার ও অপবিত্রতা নিয়ে সীতাংশু এখানে মাটি কামড়ে পড়ে থাকবে।

তার বন্ধু রণধীর, কত কাছের মানুষ, অথচ কত দূরে আজ সে। চাঁদের দেশে বাস তার এখন। তাকে ঘিরে রূপালি চাঁদ একটা উজ্জ্বল বৃত্ত রচনা করে রয়েছে। না, সীতাংশুর সাধ্য নেই রণধীরের দিকে হাত বাড়াবার। সেই আলোর বৃত্ত ভেদ করা তার পক্ষে কঠিন। অথচ রণধীর দেখাচ্ছে, কত যেন সে আপনজন। তিন দিন সীতাংশুর দেখা নেই, তাই পাগল হয়ে সে ছুটে এসেছে তার জঙ্গলের ডেরায়। অথচ এই রণধীরই সবচেয়ে বেশি সচেতন। সীতাংশু ও তার মধ্যে আজ আকাশ-পাতাল ব্যবধান।

যেন এই জন্যই রণধীর চাইছে সীতাংশু ছুটে ছুটে তার রাণীরবাগের আস্তানায় গিয়ে দেখুক সে কত সুখী, কত তৃপ্ত, কত সম্পূর্ণ।

সীতাংশু যেতে না চাইলেও রণধীর জোর করে তাকে টেনে নিয়ে গেছে।

এই পর্যন্ত চিন্তা করে সে একটা গভীর নিশ্বাস ফেলল।

বস্তুত এ-ধরনের চিন্তা এর আগে তার মাথায় আসে নি। অন্ধকার গাছতলায় বসে সেদিন সমস্ত জিনিস্‌টা যেন সে নতুন করে দেখল। এবং সেদিনই প্রথম একটা ঈর্ষার কাঁটা তার বুকের ভিতর খচ্‌খচ্‌ করে উঠল।

রাত বাড়ছিল। চাঁদটা আকাশের অনেক উঁচুতে উঠে গিয়েছিল। গাছের মাথায় একটা রাত-জাগা পাখির ডানার ঝাপ্‌টা শুনতে পেয়ে তার খেয়াল হলো, ঘরে ফিরতে হবে। আস্তে আস্তে সে উঠে দাঁড়াল।

পরদিন, তার মনে আছে, ঘুম থেকে উঠে দরজার বাইরে চোখ

পড়তে সে চমকে উঠল। কোথায় অন্ধকার, বনের ভিতর রোদ ঢুকে পড়ে সব কেমন ঝলমল করছে, ক্ষুদ্র তৃণটি পর্যন্ত চোখ মেলে তাকিয়ে আছে, শিশিরের ফোঁটা মাথায় নিয়ে প্রত্যেকটা ঘাসফুল হাসছে, হলুদ ঠোঁট আর হলুদ পা নিয়ে কুচকুচে কালো রঙের দুটো শালিক ঘাসের বুকে পোকা খুঁটে খাচ্ছে, ঘাসফুলের মতন ছোট সাদা প্রজাপতির ঝাঁক ঘুরে ঘুরে নাচছে।

দৃশ্যটা দেখে সীতাংশু নিশ্চিন্ত হলো। অনেকটা আরামবোধ করল। শ্বাপদ সরীসৃপের চিহ্নমাত্র দেখতে পেল না সে।

তবে আর ভয় কি। তার আত্মবিশ্বাস ফিরে এল। এই বনের মতন তার মনের মধ্যেও রৌদ্র ঝলমল করে উঠতে পারে, ফুল ফুটতে পারে, পাখি গান গাইতে পারে।

না, কলকাতা ফিরে যাবার কোনো অর্থ হয় না। রাত্রে তার মন দুর্বল হয়েছিল, সকালেব আলো দেখে মন সতেজ হয়ে উঠল।

সে এখানে নিজের কাজ করে যাবে। চিরদিনই তো কাজপাগলা সে। ব্যবসা-বাণিজ্য তার প্রাণ। যে জন্য বিয়ে-থা করে সুস্থির হয়ে সংসার পেতে বসতে আজ পর্যন্ত তার হয়ে উঠল না।

সেই মানুষ আর-একটা সংসারের দিকে তাকিয়ে লম্বা লম্বা নিশ্বাস ফেলবে?

সেই সংসারের ছবি দেখতে সেখানে ছুটে ছুটে যাবে?

না, এতটা মূর্খ সে নয়।

এই টিয়াটুলির জঙ্গলেই সে থেকে যাবে—ভুল করেও রাণীর-বাগের দিকে পা বাড়াবে না। হ্যাঁ, রণধীর যদি তার সঙ্গে দেখা করতে আসে, ভাল। বন্ধুকে যেমন আপ্যায়ন করার করবে, তার সঙ্গে বেড়াবে, তার সঙ্গে বসে গল্প করবে। কিন্তু তার রাণীরবাগের আস্তানায় সে যাবে না। করুক সাধাসাধি। তাকে ফিরিয়ে দেবে সীতাংশু। তেমন মনের জোর তার আছে। যদি তাতে বন্ধুবিচ্ছেদ হয়—হবে।

কথাগুলি সে চিন্তা করছিল আর ঘুরে ঘুরে বনের গাছ লতা গুল্ম দেখছিল। এমন সময় একটা মজার ব্যাপার ঘটল। করাতীদের একটি ছোট ছেলে হাসতে হাসতে তার কাছে ছুটে এল। ছেলেটির নাম মাধব। খুবই উত্তেজিত দেখাচ্ছিল মাধবকে। দূর থেকেই সীতাংশু লক্ষ্য করছিল, মাধবের হাতে সাদা মতন একটা কী যেন রয়েছে। বুকের কাছে জিনিসটাকে আঁকড়ে ধরে পড়িমরি করে ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর দিয়ে ছুটে আসছিল। কাছে আসতেই দেখা গেল একটা খরগোসের ছানা ধরে নিয়ে এসেছে সে।

দেখে সীতাংশু খুশি হলো। খরগোস তার চিরদিনের প্রিয়। 'কোথা থেকে ধরে আনলি ?' এক গাল হেসে সে প্রশ্ন করল।

'হুই জঙ্গল থেকে।' আনন্দের আতিশয্যে মাধব ভাল করে কথা বলতে পারছিল না। আঙুল দিয়ে দূরের পলাশ ঝোপটা দেখাল।

'চমৎকার দেখতে!' সীতাংশু হাত বাড়িয়ে খরগোসটাকে ধরতে গেল। মাধব তৎক্ষণাৎ বাচ্চাটাকে তার হাতে তুলে দিল।

'তোমার জন্যে নিয়ে এলাম বাবু, তুমি এটাকে পুষবে।'

শুনে সীতাংশুর আরো ভাল লাগল।

সাদা ধবধব করছে গায়ের রং, পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে দুটো চোখ। কী মোলায়েম শরীর। বুকের কাছে তুলে খরগোস শাবকের গায়ে গাল ঘষতে লাগল সে।

এবং তার মনে হলো তার অন্তরের ইচ্ছা ঈশ্বর পূরণ করল। হয়তো এমন কিছু একটা সে চেয়েছিল। আদর করবে, যত্ন করবে, ভালবাসবে। তা খরগোস মন্দ কি। কাঠের ব্যবসা দেখাশোনা করা ছাড়াও তার হাতে কখনো কখনো প্রচুর সময় থাকে। সেই সময়টা একটা কিছু নিয়ে তাকে কাটাতে হয়। ব্রততীর কালো চোখ ঝকঝকে শরীর লম্বা ছিপছিপে আকৃতি বার বার ঘুরে ঘুরে কেবল চোখের সামনে উপস্থিত হয়। এ বড় বিশ্রী। এবার এই

জিনিস বন্ধ হবে। মনে মনে করাতীদের ছেলেটাকে সে আশীর্বাদ জানাল, বেঁচে থাক বাবা, তোর দীর্ঘজীবন লাভ হোক, অসময়ে তুই আমার এমন উপকার করলি।

একটা খাঁচা তৈরি করে ফেলল সে। নিজের হাতে কচি কচি ঘাস ছিঁড়ে এনে বাচ্চাটাকে খাওয়ায়, গরম জল ও সাবান দিয়ে স্নান করিয়ে দেয় কোনো কোনো দিন। ঠাণ্ডা পড়ছিল। খড়ের ওপর তুলো বিছিয়ে চমৎকার গরম বিছানা তৈরি করে দিয়েছে ওটাকে। এসব কাজে মাধবও তাকে প্রচুর সাহায্য করেছিল। বাবু খরগোস পুষছে। তার উৎসাহটাও দেখবার মতন ছিল। মোটের ওপর খরগোস ছানাটাকে নিয়ে মাধবের মতন সেও কেমন যেন ছেলেমানুষ হয়ে গিয়েছিল ক'দিন। একবারও রাণীরবাগের কথা তার মনে হয় নি।

একটা চামড়ার বেল্ট-এর গায়ে ঘুঙুর বেঁধে বাচ্চাটার গলায় পরিয়ে দিয়েছিল সীতাংশু। খুব সরু হাল্কা চামড়া, যাতে বাচ্চাটার কষ্ট না হয়। ওটা ছুটোছুটি করলেই চমৎকার ঘুঙুরের বোল শোনা গেছে। বাচ্চাটা যখন ঘাসের ওপর ছুটোছুটি করত, তখন সীতাংশু ও মাধব এক সঙ্গে হাততালি দিত, শিস দিত, যেন তাতে উৎসাহ পেয়ে খরগোস শাবক আরো বেশি ছুটোছুটি করত।

এভাবে দিনগুলি চমৎকার কেটে যাচ্ছিল। কেটে যেত। একদিন হঠাৎ আবার রণধীর এসে হাজির। প্রায় দশ দিন পর। ব্রততীর হাতের রাঁধা হরিণের মাংস খেয়ে আসার পর কি করে দশটা দিন কেটে গিয়েছিল সীতাংশুর খেয়াল ছিল না।

রণধীর তাকে কথাটা মনে করিয়ে দিল। এবং সেই সঙ্গে বন্ধুকে একটু গালমন্দও করল। 'এত কাছে থেকে এভাবে ডুব দিয়ে থাকার কোনো মানে হয় না। এদিকে আমরা দু'জন ভেবে মরছি অসুখ-বিসুখ হল কি না—এখন দেখছি বেশ সুস্থ শরীর নিয়ে বেঁচে আছিস —খরগোসের বাচ্চা নিয়ে দিব্যি খেলাধূলো করছিস—'

কথাটা মিথ্যে বলে নি সে।

তার ডেরার বাইরে বড় নিম গাছটার কাছে রৌদ্রে বসে সীতাংশু ও মাধব খরগোসের বাচ্চাটাকে নিয়ে খেলছিল।

রণধীর বলল, 'ক'দিন ঠায় ব্রততী আমায় তাড়া দিচ্ছিল, যাও, একবার গিয়ে দেখে এসো, একলা জঙ্গলে পড়ে থাকে—কোনো বিপদ-আপদ ঘটে থাকলেও কি আমরা জানতে পারব, যতক্ষণ না কেউ এসে খবর দেবে—'

'বিপদ-আপদ কিছু ঘটলে খবর ঠিকই পেতে—' রণধীরের চোখের দিকে তাকিয়ে সীতাংশু অল্প শব্দ করে হাসল। 'তা ছাড়া আমি এখানে একলা আছি কি না তুই তো দেখছিস—কুলীরা আছে করাতীরা আছে, কাঠুরিয়ারা আছে, ব্রততী নিশ্চয় তোর কাছে শুনেছে।'

'ও তো আজ আমার সঙ্গে প্রায় চলে আসছিল, সীতাংশুবাবুর নিশ্চয় আবার শক্ত কোনো অসুখ-বিসুখ হয়েছে—সেদিন ইনফ্লুয়েঞ্জা থেকে উঠল—এতদিন হয়ে গেল আসছে না কেন, এমন তো বড় একটা হয় না। ভীষণ চিন্তা করছিল সে কাল থেকে।'

সীতাংশুব বুকের ভিতর ঝলক দিয়ে উঠল। সে রাণীরবাগ যাচ্ছে না, দুশ্চিন্তায় কাতর হয়ে পড়েছে একটি মানুষ। মুহূর্তের জন্য তার কপালে ক'টা রেখা জেগে তখনি আবার মিলিয়ে গেল। আগের যাত্রা তিন দিন পর যখন সেখানে গিয়েছিল সে, ইনফ্লুয়েঞ্জার কথাই অবশ্য বলতে হয়েছিল তাকে। ইচ্ছা করে আমি আসি নি—রণধীরের স্ত্রী কি রণধীরের মুখের ওপর কথাটা বলতে কেমন বাধো বাধো ঠেকছিল সেদিন।

'কি হলো, আজ যাবে আমার সঙ্গে?'

রণধীর তার চোখ দুটো দেখছিল।

সীতাংশু মাথা নাড়ল। গম্ভীর হয়ে বলল, 'আজ একটু ব্যস্ত থাকব আমি, ওয়াগন বুক করা হয়ে গেছে। বেলা দুটোর মধ্যে

স্টেশনে ট্রাক পাঠাতে হবে।'

রণধীর চুপ করে গাছের পাতা দেখতে লাগল। একটু যেন ক্ষুণ্ণ হয়েছে বোঝা গেল। চেহারাটা দেখে সীতাংশুর কষ্ট হলো।

'তু-একদিনের মধ্যে আমি যাচ্ছি,—এদিকের কাজ একটু হাল্কা হলেই—'

সীতাংশুকে কথা শেষ করতে দিল না। রণধীর মাথা ঝাঁকাল। যেন অভিমান হলো তার। গলার স্বরটা সেরকমই শোনাল।

'সেটা তোর ইচ্ছে, খোঁজখবর না পেলে মনটা খারাপ হয় তাই ছুটে আসি—এখন তুই যদি ওদিকে যাবার মতো একেবারেই সময় না পাস তবে আর বলার কিছু থাকে না। চলি—'

রণধীর ঘুরে দাঁড়াল। সীতাংশু ব্যস্ততার ভাব দেখাল।

'সে কি, চা-টা কিছুই খেলি না?'

'এইমাত্র চা খেয়ে বেরিয়েছি, এখন আর খাব না।' ওদিকে বেড়ার ধারে মোটরবাইকটা দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছে সে। সেদিকে চোখ রেখে রণধীর একটু সময় চুপ করে রইল।

'নে সিগারেট খা।' পকেট থেকে সিগারেট দেশলাই বার করে সীতাংশু বন্ধুর দিকে বাড়িয়ে দিল। রণধীর তার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। সিগারেট নিল না। ভুরু কুঁচকে বলল, 'আমার এখন মনে হয় কি, তুই আমাদের একটু এড়িয়ে চলতেই ভালবাসিস।'

'কেন!' সীতাংশু যেন অবাক হলো।

'তাই তো দেখছি। হাজার মাইল দূরে থাকি না আমরা, চল্লিশ মিনিটের রাস্তা। একদিন অন্তর কি তু'দিন পর পরও একবার সেখানে বেড়াতে বেড়াতে অনায়াসে চলে যাওয়া যায়। তা ছাড়া, আমি যতটা জানি, রাত্রে কাঠ কাটা হয় না, চেরাও হয় না, ট্রাক বোঝাই করে বেলাবেলি স্টেশনে মাল পাঠাবার কথা। কাজেই সন্ধ্যের পর হাতে কাজ আছে বললেও আমি বিশ্বাস করব না।'

সীতাংশু চুপ করে ছিল। রণধীর চুপ করে থাকল না।

'এই জন্যই বলছিলাম রাণীরবাগে যাবার সময় হয় না কথাটা ঠিক না, তোর ইচ্ছে করে না, তাই যাস না—নিজেকে নিয়ে থাকতে তুই ভালবাসিস।'

'না, এভাবে আমাকে বিচার করা তোর অন্যায়।' সীতাংশু ক্ষুব্ধ হলো। যেন লজ্জাও পেল। এটা তার বাইরের চেহারা। কিন্তু কেন যাচ্ছে না—বার বার তার মন রাণীরবাগের পথে ছুটে যেতে চাইছে, অথচ কেন মনকে সে সংযত করছে শাসন করছে—বাল্যবন্ধুর আস্তানায় যেতে তার বাধা কোথায়, এ কথা আর মুখ ফুটে সে বলে কি করে। তাই 'এভাবে আমাকে বিচার করা তোর অন্যায়—' বলতে আরম্ভ করেও বেশি দূর সে অগ্রসর হতে পারল না। একটা সলজ্জ হাসি মুখে ঝুলিয়ে কেমন যেন বোকা বোকা চেহারা করে সিগারেট টানতে লাগল।

'যা বলেছি ঠিকই বলেছি।' রণধীর বলে চলল, 'কলকাতা থাকতে বোঝা যায় নি, বাইরে এসে বোঝা যাচ্ছে। হুঁ, যেখানে আমাদের কাছে প্রায় সবই অপরিচিত সবই নতুন, তা ছাড়া একটা বিশেষ বয়সে এসে না পৌঁছনো পর্যন্ত মানুষের মনের আসল চেহারাটা প্রকাশও পায় না। সেই বয়সে আমরা পৌঁছে গেছি, এখন বোঝা যাচ্ছে বন্ধুর প্রতি তোর কত দরদ আর তোর জন্য আমারই বা কতটা টান; তাই তো ব্রততী সেদিন বলছিল, তুমি আমি সীতাংশুবাবুর জন্যে ছটফট করলে কি হবে, আসলে সীতাংশুবাবু একা একা থাকতেই ভালবাসেন—আত্মীয়তা বন্ধুত্বের বড় একটা ধার ধারেন না।'

'আমি যাব, ঠিকই যাব', সীতাংশু যেন জোর করে হাসতে আরম্ভ করল। 'কাল যদি সময় করতে না পারি পরশু ঠিকই যাব—গিয়ে ব্রততীকে বুঝিয়ে আসব আমার সম্পর্কে কত বড় একটা ভুল ধারণা নিয়ে সে বসে আছে—'

কিন্তু তার হাসি রণধীরের মুখে হাসি ফোটাতে পারল না। হাতঘড়ির ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সে ঘুরে দাঁড়াল।

'আমার আর সময় নেই, এখনি একবার বাগানে যেতে হবে—যাক গে, অসুখবিসুখ যখন কিছু হয় নি, সুস্থ আছিস দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে গেলাম—'

রণধীর বেড়ার কাছে গিয়ে মোটরবাইকে চেপে বসল। তারপর ফটফট আওয়াজ তুলে জঙ্গলের সরু পথ ধরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সীতাংশু হাল্কা নিশ্বাস ফেলল।

তারপর ক্রমাগত তিনদিন ধরে সে ভেবেছে। রাণীরবাগ যাবে কি যাবে না। কাল বিকেলে খরগোসের বাচ্চাটা মরে গেছে। এক টুকরো কাঠ এসে ছিটকে পড়েছিল গায়ে। কুড়াল দিয়ে একটা কুলি কাঠ চিরছিল। খরগোসটা ছুটতে ছুটতে সেখানে চলে গিয়েছিল। নরম শরীর। কাঠের টুকরোটা ছিটকে এসে গায়ে লাগার সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাটা ঘাসের ওপর লুটিয়ে পড়ল। তারপর একটু সময় ছটফট করে পরে চোখ বুজল। মাধব কেঁদে ফেলেছিল। সীতাংশু কাঁদে নি। তবে তার খুব কষ্ট হয়েছিল। মাধব জলটল দিয়ে বাচ্চাটাকে বাঁচিয়ে তুলতে অনেক চেষ্টা করেছিল। কিছু ফল হয় নি।

কাল সকালে এই দুর্ঘটনা ঘটে। কাল সারাদিন সীতাংশু মন খারাপ করে তার ডেরায় বসে ছিল। কুলি বা মিস্ত্রীদের কাজকর্ম দেখতে একবারও বাইরে যায় নি।

তার যেন মনে হয়েছিল কারো অভিশাপ লেগেছিল। না হলে এমন দুরন্ত সজীব ছটফটে বাচ্চাটা হুট করে মরে যায়! পনেরো দিনের বেশি হয়ে গেল, সে তার সমস্ত উৎসাহ মনোযোগ প্রীতি স্নেহ এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত করতে পেরে নিশ্চিন্ত হয়েছিল। তার সমস্ত ভয়-ভাবনা দূর হয়ে গিয়েছিল। আর তার মনোযোগ অন্য কোনোদিকে বিক্ষিপ্ত হবে না, ভালবাসার একটি জিনিস পেয়েছে সে। হোক না খরগোসছানা, শিশু যেমন খেলনা নিয়ে মেতে থাকে

তেমনি খরগোসের বাচ্চাটাকে নিয়ে সে মেতে উঠেছিল। পৃথিবীর আর কোনো সুন্দর জিনিসের কথাই তার মনে পড়ে নি। রাণীর-বাগের চা-বাগানের ডাক্তারের কুঠিতে এক রূপসী বসে আছে, আজ ছ' মাস ধরে সে টিয়াটুলির জঙ্গলের একটা মানুষকে আকর্ষণ করছে—এই অবাঞ্ছিত জিনিসটা চাপা দিতে সীতাংশু কি কম চেষ্টা করেছিল! পারে নি। দুদিন তিনদিন দম খিঁচে থেকেছে। রাণীরবাগের কথা মনে হলেই হাত দিয়ে মাছির মতন সেটাকে উড়িয়েও দিয়েছে। কিন্তু তিনদিন পর আবার শাল সেগুনের ছায়া ধরে ধরে কাঁটাগুল্মের ঘন গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে আঁকাবাঁকা অসমান পথের লাল ধুলো উড়িয়ে ডার্বি জুতোর দুপদাপ শব্দ তুলে রাণীরবাগ ছুটে গেছে।

তারপর হঠাৎ সেদিন, ঠিকই ভেবেছিল সে, ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতন একটা কিছু তার হাতে এসে পড়েছিল। মাধবের কাছ থেকে খরগোসের বাচ্চাটা উপহার পেয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটা রইল না। তার কেবলই মনে হচ্ছিল রাণীরবাগের কুঠিতে বসে সেই মানুষটি প্রচণ্ড আক্রোশ নিয়ে রাতদিন অভিশাপ দিচ্ছিল বাচ্চাটাকে। হুঁ, তার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছিল একরত্তি খরগোসটা। সীতাংশু যে আর কোনোদিনই ওটাকে ছেড়ে টিয়াটুলির জঙ্গল থেকে নড়বে না, সে বুঝতে পেরেছিল। অভিশাপ ঠিক লাগল। বাচ্চাটা মরে গেল।

এবার?

কাল বিকেল থেকে সীতাংশুর জিদ চেপে গেছে। বেশ, না হয় যাবে সে সেখানে। রণধীর খুশি হবে, ব্রততীর মুখে হাসি ফুটবে। কালো চোখে হাসির রোদ লেগে সরসীর মতো ঝলমল করে উঠবে। উঠুক। রণধীরের সঙ্গে বসে সে চা খাবে, গল্প করবে। তারপর এক সময় উঠে চলে আসবে। একবারও চুরি করে সেই মানুষটিকে দেখবে না। তার আবেগ উৎসাহ মোহ বিস্ময় খরগোসের মরা

বাচ্চাটার সঙ্গে কবরের নিচে চলে গেছে। সীতাংশুর ডেরার পিছনে বড় ঝাউগাছটার নিচে মাধব বাচ্চাটাকে কবর দিয়েছিল। এমনি ফেলে রাখলে কাক শকুনে ছিঁড়ে খেত; পুড়িয়ে ফেলতেও কষ্ট হয়েছিল তাদের। তার চেয়ে কবর দেওয়া ভাল। ওপরে মাটি চাপা দিয়ে তারা সেখানে ক'টা ক্রিসেন্থিমামের চারা পুঁতে দিয়েছে। এবং চারদিকে ঘিরে মাদারের ডাল দিয়ে বেড়া তৈরি করে দিয়েছে। মাধব ও সে ঠিক করেছে বেড়ার গায়ে অপরাজিতা লতা বাইয়ে দেওয়া হবে। বর্ষায় ঘননীল অপরাজিতা ফুটবে, শীতে ফুটবে ক্রিসেন্থিমাম। টিয়াটুলির জঙ্গলে এটাই সবচেয়ে সুন্দর জায়গা হবে একদিন। সীতাংশুর সবচেয়ে আদরের একজন এখানে ঘুমিয়ে আছে।

আজ সকালে কথাটা শুনে মাধব একটু অবাক হয়েছে। কাল এত বড় একটা শোক পেল বাবু, আর আজই কি না রাণীরবাগ বেড়াতে যাচ্ছে!

'আমি যাব আর চলে আসব।' মাধবের বিমর্ষ চেহারা দেখে তার বলতে ইচ্ছা হলো, 'এই শোকের খবরটা দিতেই আমি বন্ধুর স্ত্রীর কাছে যাচ্ছি। তারা জানুক আমি কতটা রিক্ত শূন্য হয়ে গেলাম। একটা খরগোসছানাকেও যে আমি কত ভালবেসেছিলাম, তার মৃত্যুতে আমি কী নিদারুণ আঘাত পেয়েছি, আমার চোখ দেখে তারা বুঝবে।' তাই তো, মনে মনে চিন্তা করলাম, শোকটা এক জায়গায় ধরে রাখতে মানুষের কষ্ট হয় বেশি, শোক চারদিকে ছড়িয়ে দিতে পারলে বুকের ভিতরটা অনেক হাল্কা হয়। এই জন্যই শোকের খবর পাওয়া মাত্র আত্মীয় বন্ধু এবং পড়শীরা নিজে থেকে ছুটে আসে, এটাই নিয়ম। তার অর্থ তারাও কিছু কিছু করে শোকের ভাগ নেয়, বিলাপ করে, দরকার মত দু' ফোঁটা চোখের জল ফেলে। তাতে শোকার্ত মানুষ শান্তি পায়, মাটির শয্যা ছেড়ে সে উঠে বসে, কেবল মৃত্যুর অন্ধকারের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ না রেখে জগতের দিকে জীবনের দিকে আবার একটু সময়ের জন্য চোখ তুলে তাকাতে

পারে। এখানে রণধীর ছুটে আসছে না, তার স্ত্রী ছুটে আসছে না। তারা সীতাংশুর খরগোসছানার মৃত্যুসংবাদ পায় নি। কাজেই সীতাংশুকে সেখানে যেতে হবে। আমার শোকের ভাগ দু'জনকে কিছু কিছু দিয়ে আসি। ভার একটু লাঘব হবে।

অবশ্য এত সব কথা যে করাতীর ছেলেটি বুঝবে না সীতাংশু জানত। বাবু প্রলাপ বকছে মনে করে ফ্যালফ্যাল করে সীতাংশুর মুখটা কেবল দেখত সে, একটাও শব্দ করত না। তবে বাবু যে রাণীরবাগ বেশি সময় থাকবে না এই জিনিসটা মাধব নিজেও খুব বুঝত।

সীতাংশু যতটা সম্ভব নিরাসক্ত থেকে সকাল ও দুপুরের খানিকটা সময় করাতীদের কাজকর্ম একটু দেখল, কুলিদের এটা ওটা ফরমায়েস করল, তারপর স্নান খাওয়া সেরে একটু গড়িয়ে নিয়ে উঠে পড়ল। গাছের মাথায় লাল রোদ দেখতে দেখতে সে রাণীরবাগ চলে যেতে চায় এবং সন্ধ্যাবাতি লাগার সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে ফিরে আসবে—এই মতলব। ফিরতে তাকে হবেই। এবং ঘরে এসে খাবে। কেননা সতেরো দিন পর সেখানে যাচ্ছে সে। ডাক্তার-গিন্নী মাছ মাংস পিঠে পায়েস যা-হোক একটা কিছু ভাল জিনিস রান্না করে তাকে খাওয়াতে চেষ্টা করবে, ডাক্তারও খুব পীড়াপীড়ি করবে। কিন্তু অবিচল থাকবে সে, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করবে না সীতাংশু। তা ছাড়া ক্লান্ত বিধ্বস্ত শোকাহত সে। অন্যবারের সঙ্গে এবারের তুলনা হয় না। বন্ধুত্ব রক্ষা করতে একটু চা-ই খাবে শুধু। দশ পনেরো মিনিট ডাক্তারের সঙ্গে গল্প করবে। তারপর অন্য কোনোদিকে না তাকিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে আসবে।

তার যেন মনে হলো খরগোসের বাচ্চাটা মরে গিয়ে ভালই হলো। একটা শোকের অস্ত্র সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে সে। কোনোরকম দুর্বলতা তাকে আক্রমণ করতে পারবে না। আবেগ মোহ লোভ লালসা রোমাঞ্চ—ব্রতভীর সামনে গিয়ে দাঁড়ানো মাত্র চোরের মত সব তার

বুকের ভিতর এই ক'মাস মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। আজ সব কমে গেছে, ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। নির্ভয়ে সে সেখান থেকে একবার ঘুরে আসতে পারে।

টর্চ দেশলাই ও সিগারেটের প্যাকেট পকেটে পুরে দরজায় তালা দিয়ে সে যখন বাইরে ঘাসের ওপর পা রাখল তখন মাধব এসে সামনে দাঁড়াল। রুক্ষ চুল শুকনো মুখ। পায়ে এক গাদা ধুলো। হাতে একটা কাগজের মোড়ক।

'কোথায় ছিলি সারাদিন?' সীতাংশু প্রশ্ন করল। সকালের পর থেকে ছেলেটাকে যেন আর একবারও দেখতে পায় নি। তার বাপও তাকে তখন খোঁজাখুঁজি করছিল।

'চাঁপাডাঙার হাটে গেছলাম বাবু।'

'কি আনলি?' সীতাংশু একটু অবাক হলো। আজ হাট বসার কথা নয় তবে সেখানে দুটো একটা দোকান আছে। হাটের দিন ছাড়া এটা-ওটা কিনতে হলে চাঁপাডাঙার সেসব দোকান ছাড়া গতি নেই। এখানে দু-তিন মাইলের মধ্যে ঘরবাড়ি দোকান বলতে কিছু নেই। সবটাই জঙ্গল। মাধবের হাতের কাগজের মোড়কটা লক্ষ্য করে সীতাংশু বলল, 'কি ওটা?'

'মোমবাতি।' মাধব অল্প হাসল, যেন একটু লজ্জাও পেল।

'কি হবে মোম দিয়ে? তোদের ঘরের কেরোসিন ফুরিয়েছে বুঝি?' সীতাংশু হাসল।

মাধব আস্তে মাথা নাড়ল।

'ঘরের জন্যে আনি নি।'

'তবে কার জন্য?' সীতাংশু একটা ঢোক গিলল।

'সন্ধ্যেবেলা ওখানে পিরদিম দিতে হবে।' আঙুল দিয়ে মাধব ঘরের পিছনের ঝাউগাছটা দেখাল।

সীতাংশু বুঝল। এক সেকেণ্ড স্তব্ধ হয়ে রইল। বাচ্চা খরগোসটার কবরের ওপর সন্ধ্যেবেলা মোমবাতি দেওয়া হবে। এই

দুপুরে স্নান নেই খাওয়া নেই চাঁপাডাঙায় ছুটে গিয়েছিল ছেলেটা মোম কিনে আনতে।

'ঠিক আছে।' ঝাউগাছটার দিকে চোখ রেখে সীতাংশু একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল। 'ফিরে এসে তোর মোমের পয়সা দেব। আমি সকাল সকাল ফিরব।'

সীতাংশু আর দাঁড়ল না। তাই তো। তার খরগোস। কবরে সন্ধ্যাবাতি জ্বালাবার কথা তারই আগে মনে হওয়া উচিত ছিল যে। জঙ্গলের রাস্তা ধরে হাঁটার সময় তার মনে হলো মাধব ঠিক অপেক্ষা করবে, সন্ধ্যা লাগার সঙ্গে সঙ্গে বাবু যাতে রাণীরবাগ থেকে ফিরে আসে। তাই ফিরতে হবে তাকে।

দু'পাশে দুটো দেবদারু গাছ, মাঝখানে ডাক্তারের কুঠি। হোক না টালির চাল। দেওয়ালগুলি সাদা কাগজের মতন ধবধব করছে। এখন পড়ন্ত বেলার লাল রোদ লেগে চমৎকার একটা গোলাপী আভা ফুটে বেরোচ্ছে বলে মনে হবে বাড়িটা থেকে।

দূর থেকে দৃশ্যটা সুন্দর লাগছিল। যেন দু'পাশের দেবদারু পাতার সঙ্গে মিল রেখে দরজা জানালার রং হালকা সবুজ করা হয়েছে।

কাঁকর বিছানো লাল সরু একটা রাস্তা ফিতের মতন এঁকেবেঁকে সবুজ মাঠের ওপর দিয়ে গোলাপী কুঠির দেউড়ি পর্যন্ত গিয়ে ঠেকেছে।

দু'দিকে কাঁটা জঙ্গল রেখে অনেক চড়াই উৎরাইয়ের পথ পার হয়ে সমতল মাঠের বুকে নেমে সীতাংশু এবার লাল ফিতের মতো রাস্তা ধরে এগোতে লাগল। এতক্ষণ সে এদিক ওদিক তাকিয়েছে, আকাশের রং দেখেছে, বনের পাখি দেখেছে, গাছ গুল্মের বিচিত্র সব পাতা ফুল লক্ষ্য করেছে। শীত এসে যাচ্ছে। তবু কত গাছে নূতন কুঁড়ি পাতা ফুল তার চোখে পড়ছিল। আবার শুকিয়ে হলুদ রং ধরে ঝরঝর করে পাতা ঝরছে এমন গাছ গুল্ম লতাও কম দেখল না সে।

এখন আর কোনো গাছ নেই, কাঁটাঝোপ নেই। পরিষ্কার ঝকঝক করছে সবুজ মাঠ। একবার ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনের দিকে তাকাল সে। টিয়াটুলির জঙ্গলটা কেমন থমথম করছে, এখনই কেমন একটা কালচে রং ধরে রহস্যের চেহারা ধরেছে। যেন সেখানে বিষণ্ণতা গাম্ভীর্য ও মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই নেই।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। কেমন একটা বিষাদে মনটা ছেয়ে গেল। অথচ সামনে তাকাও, রং নিয়ে উজ্জ্বলতা নিয়ে জীবন যেন ঝলমল করছে সেখানে। যত সে এগোচ্ছে চমৎকার একটা তাপ একটা আলো তার মুখে শরীরে তো বটেই, যেন চামড়া ভেদ করে হৃৎপিণ্ডের ওপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। যেন দেবদারুর সবুজ ঝলমলে পাতা, রণধীরের বাংলোর লাল ঝকঝকে টালি, পরিচ্ছন্ন দরজা জানালা, দেওয়ালের গোলাপী আভা দেউড়ির মাথায় লতানো তারস্বরে চিৎকাব কবে বলছে, জীবন মধুর, জীবন বড় সুন্দর—বলছে, সকাল থেকে সূর্যাস্ত তোমার চারপাশের আকাশে বাতাসে কেবল প্রচুর আনন্দ ছড়িয়ে আছে, তেমনি সন্ধ্যা থেকে সকাল আকাশের শত কোটি জ্বলন্ত নক্ষত্রে, গাছের অন্ধকার পাতায় পাতায়, জোনাকির সবুজ আলোয় জীবনের গান প্রাণের স্পন্দন ধ্বনিত হচ্ছে, কান পাতলে তুমি শুনতে পাবে।

সীতাংশুর মুখের ভিতরটা হঠাৎ কেমন তেতো ঠেকলো।

একটা কালভার্টের কাছে পৌঁছে সে স্থির হয়ে দাঁড়াল। একটা দ্বিধা নিয়ে সে দুলতে লাগল। ওখানে যাবে কি যাবে না। এতটা পথ এসে ফিরে যাবার যে কোনো মানে হয় না এটাও সে বুঝতে পারছিল। কিন্তু তার ভয় করছিল, ওই রং ওই উজ্জ্বলতার মধ্যে গিয়ে পড়লে আবার সে নিজেকে ভুলে যাবে। তার চোখে মুখে এখনও শোকের চিহ্ন লেগে আছে, কিন্তু ওখানে ওই ঝকঝকে কুঠির বাতাস গায়ে লাগার সঙ্গে সঙ্গে তার চেহারা বদলে যাবে। অনেক হাসবে সে, অনেক কথা বলবে, দামী সিগারেটের প্যাকেট থেকে বার বার

সিগারেট তুলে নিয়ে সেগুলি ধ্বংস করবে, সোনালি লতাপাতা আঁকা শৌখীন পেয়ালা ঠোঁটের কাছে তুলে বার বার চুমুক দেবে, আর চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চুরি করে—

সীতাংশু শিউরে উঠল।

কালভার্টের নিচে নালার অল্প জলে প্রচুর নধর কচি ঘাস গজিয়েছে। ঘাসের মাথায় চুপ করে একটা ফড়িং বসে আছে। উল্টোদিকে একটা ছোট্ট বুনো লতাঝোপের কাছে দুটো প্রজাপতি খেলা করছে। ফড়িংটা করুণ চোখে সেদিকে চেয়ে আছে। যেন নিজের নিঃসঙ্গতার কথা চিন্তা করে ফড়িংটার কেবলই মন খারাপ হচ্ছে। অথচ করবার কিছু নেই।

সীতাংশু নিজের মধ্যেও এমন একটা গ্লানি, একটা অসহায়তা অনুভব করছিল কি? নিঃসঙ্গতার গ্লানি? রংহীন জীবনের ম্লানতা মূঢ়তা দৈন্য?

এর কারণ কি?

কোনোদিন তো নিজের দিকে তাকিয়ে সে এমন হতাশ হয় নি। এই জিনিস কবে থেকে শুরু হলো? কে তার মধ্যে এই রিক্ততাবোধ সৃষ্টি করল!

কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঈর্ষায় উত্তেজনায় তার কপালের রগ দুটো মোটা হয়ে ফুলে উঠল।

আর সে দাঁড়াল না। টিয়াটুলি ফিরে যাবার ক্ষীণতম ইচ্ছা নিয়েও হঠাৎ রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ছিল বলে তার নিজের ওপর রাগ হতে লাগল। খামকা খানিকটা সময় নষ্ট হলো। লম্বা লম্বা পা ফেলে ছবির মতো সুন্দর বাড়িটার দিকে সে এগোতে লাগল। কুড়ি পঁচিশ গজ এগোবার পর মানুষ দেখতে পেল সে। বারান্দার সামনে গোলাপ ঝোপের কাছে দাঁড়িয়ে আছে একজন। সবুজ শাড়ি, চূড়া করে বাঁধা খোঁপা। দীর্ঘ শরীর বিকেলের লাল আলো লেগে ঝলমল করছে। কে, কর্তাটিকে তো দেখা যাচ্ছে না।

তবে কি ডাক্তার বাড়ি নেই! সীতাংশুর হৃৎপিণ্ড ঢুবঢুব করতে লাগল। আজ শনিবার, বাগান থেকে সকাল সকাল রণধীরের ফেরার কথা। এই জেনেই তো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। নিশ্চয় ভিতরে আছে রণধীর। সীতাংশু অনুমান করল। গিন্নী গোলাপ ঝোপের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে গোলাপের গন্ধ শুঁকছে, কর্তা ঘরের ভিতর আরাম কেদারায় গা ঢেলে দিয়ে ক্রাইম নভেল পড়ছে। রণধীর যে ফাঁক পেলেই একটা ঐ জাতীয় গল্প উপন্যাস টেনে নিয়ে বসে, সীতাংশুর তা জানা আছে। বিয়ের আগেও রণধীরের এই অভ্যাস ছিল। এখন জিনিসটা বেড়েছে কি কমেছে তা অবশ্য সীতাংশু জানে না, তবে অভ্যাসটা যে সে ছাড়তে পারে নি সীতাংশু সেটা লক্ষ্য করেছে। রণধীরের টেবিলে বিছানায় এখনও একটা দুটো এই জাতের ইংরেজী বই পড়ে থাকতে দেখা যায়। যাই হোক, আবার একটা দ্বিধা নিয়ে সীতাংশু দুলতে লাগল।

দেউড়ির কাছে প্রায় এসে গেছে সে। রেলিঙের ফাঁক দিয়ে বাগানের ভিতবের সব কিছু সে দেখতে পাচ্ছিল। ব্রততীর পায়ের লাল টুকটুকে চটিটা পর্যন্ত তার চোখে পড়ল। কিন্তু একটা সদ্য ফোটা গোলাপ ফুলের কাছে উঁচু ফরসা নাকটা ধরে রেখে এমন তন্ময় হয়ে আছে ডাক্তারগিন্নী, সামনের দিকে চোখ তো ছিলই না, যেন একবার দু'বার চোখ বুজেও ফুলের ঘ্রাণ বুকের ভিতর টেনে নিতে চেষ্টা করছিল। সীতাংশুর কেমন হাসি পেল। অন্য সময় হলে—অন্যদিন হয়তো এই নিয়ে বন্ধুপত্নীকে একটা বেশ ভালরকম খোঁচা দিতে ছাড়ত না সে। 'মনে হয়, অন্তরে বাইরে গোলাপময় হয়ে যাচ্ছেন আপনি।' বলে বসত সে। এ ধরনের একটা দুটো কাব্যিক ঠাট্টা ব্রততীকে ক'দিনই সে করেছে। শুনে রণধীর হেসেছে। ব্রততীও কথাটা উপভোগ করেছে। কিন্তু পাল্টা খোঁচা দিতে ছাড়ে নি। যেমন, 'এই জন্যই তো বলি, কাঠের বিজনেস করুন আর যা-ই করুন, আসলে আপনি মনে প্রাণে কবি। তা না হলে এমন একটা

জঙ্গলের ভেতর রাতদিন কেউ একা একা পড়ে থাকতে পারে?' এবারও রণধীর আগে হেসে উঠেছে, অবশ্য সীতাংশুর ঠাট্টার চেয়ে ব্রততীর ঠাট্টাটা যে তাকে আনন্দ দিয়েছে বেশি, রণধীরের উজ্জ্বল চোখ মুখ ও প্রচণ্ড হাসির শব্দই তা প্রমাণ করেছে। তা হবে, সীতাংশু তখন চিন্তা করেছে, শত হোক ব্রততী তার অর্ধাঙ্গিনী, ব্রততীর একটা হাসির কথা শুনে রণধীর যত হাসবে অন্যের হাসির কথা শুনে তত সে হাসতে যাবে কেন। অর্ধেক কি সিকি ভাগ হাস্যই তো তার পক্ষে স্বাভাবিক।

এদিকে ব্রততীর খোঁচাটাও যে সীতাংশু মুখ বুজে সহ্য করেছে তা নয়। সঙ্গে সঙ্গে সে উত্তর করেছে, 'আমি সেখানে একলা মোটেই নই, করাতীরা আছে কাঠুরিয়ারা আছে কুলিরা আছে, আর কাব্যচিন্তা করার সময়ই বা আমার কোথায়—সারাক্ষণই জঙ্গলে ঘুরে ওদের কাজকর্ম দেখতে হয়।'

'কুলি-করাতীরা তো থাকবেই এবং ওদের কাজকর্মও যে আপনাকে দেখাশোনা করতে হয় তা অস্বীকার করছি না—কিন্তু ওদের সঙ্গে আপনার মনের যোগাযোগ কতখানি? একটি কুলি কি একজন কাঠুরিয়া আপনার মনের কতটা খবর রাখে শুনি। শুনেছি দিনের বেলায় কাজ হয়, সন্ধ্যে হতে ওরা যে যার গাঁয়ে ফিরে যায়। তখন আপনি একলা। তখন বন, বনের অন্ধকার আর ঝিঁঝির শব্দ ছাড়া আপনার সাথী কেউ থাকে না। তা ছাড়া মানুষের তো একটা মন থাকে না, দিনের বেলা যদি টিম্বারের দিকে আপনার মন পড়ে থাকে, রাত্রে আর একটা মন উঠে আপনার মধ্যে কাজ শুরু করে দেয়—অস্বীকার করবেন?'

'হিয়ার হিয়ার!' রণধীর টেবিল চাপড়ে হর্ষ প্রকাশ করেছে এবং সেই সঙ্গে ব্রততীর হাতে হাত ঠেকিয়ে তাকে অভিনন্দন জানিয়েছে। তারপর টিয়াটুলির টিম্বার মার্চেন্টের দিকে একটা চমৎকার অনুকম্পার দৃষ্টি হেনে সরস গলায় মন্তব্য করেছে: 'কেমন,

হলো তো ব্রাদার—এবার আচ্ছা ঘায়েল করল তোমাকে।'

বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে সীতাংশু একটু বোকার মতন হেসেছে বৈকি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় তুলে ব্রততীর দিকে যখন সে তাকিয়েছে তখন তার দুই চোখে বিদ্যুতের মতো একটা বুদ্ধির দীপ্তি ঝলসে উঠতে দেখা গেছে।

'তা হলে আপনার মধ্যেও দুটো মন কাজ করছে—কেমন?' প্রশ্ন করে সীতাংশু হেসেছে।

ব্রততী চমকে উঠেছে, যেন একটু বিব্রত হয়ে পড়েছে কথাটা শুনে, টুকটুকে সুন্দর মুখটা সামান্য ফ্যাকাশে হয়ে উঠতেও দেখা গেছে তখন। বুঝি হঠাৎ লাগসই কোনো উত্তর খুঁজে পাচ্ছিল না সে। রক্তাভ ঠোঁট একটু নড়ে উঠে থেমে গেছে।

উত্তর দিয়েছে রণধীর।

'নিশ্চয়ই, আমারও তো দুটো মন রয়েছে। দুটোই কাজ করছে। যখন বাগানে যাই কুলি ব্যারাকে ঢুকি তখন আমার একটা মন কাজ করে। আবার ঘরে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে আমার একটা মন মাথা নাড়া দিয়ে ওঠে।' বলে সে কোমল চোখে ব্রততীকে দেখল।

সীতাংশু বুঝল। যতক্ষণ রণধীর বাগানে রয়েছে, কুলি ব্যারাকে ঘুরে রুগ্ন অসুস্থ কুলি কি তাদের পরিবারের লোকদের দেখছে, ততক্ষণ সে ডাক্তার। ঘরে ফিরে এসে সে অন্যরকম হয়ে যায়। তার আর একটা মন—হয়তো এই মনটাই বেশি সক্রিয় ও সতেজ—ঘরের এই সুন্দর মানুষটিকে নিয়ে মেতে ওঠে। অবাক হবার কিছুই নেই। সীতাংশু চিন্তা করল। রণধীরের মতন একটি অনুগত স্বামী পৃথিবীতে দুর্লভ।

কিন্তু রণধীরের উৎসাহ পেয়ে নয়, যেন এই সময়টুকুর মধ্যে ব্রততী নিজেই নিজেরটা চিন্তা করে সীতাংশুর প্রশ্নের উত্তরটা মনে মনে তৈরি করে ফেলেছে। ফ্যাকাশে ভাবটা কেটে গিয়ে তার চোখ মুখ ধারালো হয়ে উঠেছে। সীতাংশুর চোখে চোখ রেখে ভুরু টান করে

হাসতে হাসতে বলেছে, 'আমার কিন্তু আপনাদের মতন দুটো নয়— পাঁচটা মন, এবং সব ক'টা মনই কাজ করে চলেছে।'

'কি রকম!' সীতাংশু বিড়বিড় করে উঠল। যেন হঠাৎ কৌতূহলী হয়ে উঠে রণধীর ও ব্রততীর মুখের দিকে তাকিয়েছে।

'পাঁচটা মন থাকা তো মুখের কথা নয়।'

'হিসেব দিতে হবে?' ব্রততী এবার শব্দ করে হাসছিল।

'তা শুনতে আমাদের ইচ্ছে হচ্ছে বৈকি—তোমার তো বাইরে গিয়েও আমাদের মতন চাকবি করতে হয় না, ব্যবসা-বাণিজ্য দেখতে হয় না, ঘরে থেকে এতগুলো মন নিয়ে কাজ-কারবার করা তো মুখের কথা নয়।' চোখ আড় করে সীতাংশুর দিকে তাকিয়ে রণধীর মিটিমিটি হাসছিল।

এই ব্যাপারে সরাসরি রণধীর তাকে চ্যালেঞ্জ করে বসবে—ব্রততী বুঝি প্রস্তুত ছিল না; একটু থতিয়ে গেল সে, চোখের ধারটাও বুঝি একটু কমে গেল। দৃষ্টিটা নরম করে স্বামীর দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, 'বা-বে, ঘরে বুঝি আমার কাজ কম! আমাকে যখন ঘর গুছোতে হয়, ঘর সাজাতে হয়, বিছানা করতে হয়, তখন আমার একটা মন কাজ করে; যখন নিজের সাজগোজ করি তখন আর একটা মন কাজ কবে; আবার তুমি যখন ঘরে ফের তোমার সেবাযত্ন করা, খেতে দেওয়া, তোমার সঙ্গে বসে গল্প করা—এসব কাজ সম্পূর্ণ অন্য মন নিয়ে আমাকে করতে হয়; তারপর আমি যখন একলা থাকি তুমি বাগানে চলে যাও, তখন আমার আর একটা মন নিয়ে আমি চুপ করে বসে থাকি, ভাবি বাগানে বেড়াই বই পড়ি গুনগুনিয়ে গান গাই—'

'চমৎকার চমৎকার!' রণধীর আর একবার টেবিল চাপড়ে হর্ষধ্বনি করল। 'তুমি যে এতগুলো মন এক হাতে সামাল দিয়ে চলেছ—সত্যি, বাহাদুরী আছে। কি বলো সীতাংশু?'

সীতাংশু লম্বা করে ঘাড় কাত করল।

'তাই তো দেখছি,' ব্রততীর দিকে চোখ ফিরিয়ে সে শব্দ না করে

হাসল। 'আপনি যে একটি মনের জাহাজ হয়ে বসে আছেন বাইরে থেকে দেখলে বোঝা যায় না।'

এটাও একটা খোঁচা। ব্রততী তাই ধরে নিল। কাজেই পাল্টা আক্রমণ করতে সে ছাড়ল না।

'তা তো যাবেই না বোঝা, আমার সব ক'টা মন যে এক মাপের, এক রঙের, একটার সঙ্গে আর একটার হুবহু মিল আছে, একটা বোঁটায় পাঁচটা ফুল যেমন। আপনার কিন্তু তা নয়। আপনার দুটো মনই বাইরে থেকে বোঝা যায়—চোখে লাগে।'

'কি রকম?' সীতাংশু একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল। 'কথাটা ঠিক বুঝলাম না।'

'বুঝিয়ে দিচ্ছি', ব্রততীর চোখে মুখে একটা দুষ্টুমির হাসি হঠাৎ খেলা করে উঠল। 'মনে করুন একটা বোঁটায় দু'রকমের ফুল ফুটে আছে, একটা টকটকে লাল আর একটা মিশমিশে কালো—অবস্থাটা তখন কেমন হবে?'

'লোকের চোখে চট করে লাগবে।' রণধীর গম্ভীর হয়ে বলল, 'শুধু লাগবে না, চোখ রীতিমত কটকট করবে এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে।'

'সীতাংশুবাবুরও তাই।' ব্রততী রণধীরের দিকে চোখ ঘোরাল। 'কাঠের ব্যবসা করেন তিনি এক মন নিয়ে, তখন কুলি করাতীদের খাটান, ওয়াগনে মাল পাঠাবার ব্যবস্থা করেন, টাকা পয়সার হিসাব রাখেন, আবার তিনিই আর এক মন নিয়ে জঙ্গলের অন্ধকারে থেকে ঝিঁঝির গান শুনতে ভালবাসেন, আকাশের তারা গোনেন, গাছের পাতার সরসর শব্দ শুনে রোমাঞ্চ অনুভব করেন, অর্থাৎ তখন ভদ্রলোক মনে প্রাণে কবি হয়ে যান—'

স্ত্রীর কথা বলার ভঙ্গি দেখে রণধীর কাঁধ নাচিয়ে হাসতে লাগল। সীতাংশুও রূপসী যুবতীর হাত নাড়া, ঠোঁট নাড়া ও সুছাঁদ ভুরুর কাঁপন পুরোমাত্রায় উপভোগ করল।

হাসির বেগটা কমে আসার পর রণধীর বলল, 'চমৎকার উপমা।

দিনের বেলা কাঠ নিয়ে কারবার, রাত্রে ঝিঁঝির ডাক আর পাতার শব্দ নিয়ে কাব্য, একই বোঁটায় লাল ফুল কালো ফুল ফোটার মতন।'

'কেমন, এবার জব্দ সীতাংশুবাবু!'

'আমি হার মানছি', হাত জোড় করার ভঙ্গি করে সীতাংশু বন্ধুপত্নীর সুন্দর চোখ দুটো দেখল। 'আমি স্বীকার করছি, বনের অন্ধকার বনের গন্ধ রাত-জাগা পাখির কুহুকুহু ডাক আকাশের অগুনতি তারার ঝাঁক আমাকে কবি করে তোলে, আমি আকাশ বন বনের অন্ধকার ভালবাসি, কিন্তু আপনি নিজে যে আজ একটি খাঁটি কবিতা হয়ে আছেন তা-ও কিন্তু অস্বীকার করার উপায় নেই, কি বলো রণধীর?'

ব্রততী আবার যেন একটু ভড়কে গিয়ে রণধীরের দিকে তাকাল। রণধীর মাথা নাড়ল।

'ঠিকই বলেছে সীতাংশু, এমন চমৎকার একখানা বাসন্তী রঙের শাড়ি পরেছ, চুলে দোপাটি ফুল গুঁজেছ—দেখে এমন একটা উপমাই তো তার মনে আসা স্বাভাবিক।'

'এই ছাখ, চোরের সাক্ষী মাতাল।' ব্রততী ঈষৎ লাল হয়ে উঠল। পরনের শাড়িটার দিকে একবার চোখ বুলোল। যেন সামনে আরসি থাকলে খোঁপার ফুলটাও একবার দেখে নিত। যা-ই হোক, আরসি ছাড়াই ওপর ওপর নিজেকে দেখে নিয়ে সীতাংশুর দিকে সে চোখ ফেরালো। 'তা হলে দেখা যাচ্ছে শুধু জঙ্গলেই আপনার কবিত্ব জাগে না, লোকালয়ে এসে লোক দেখেও আপনার কবিমনটা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।'

সীতাংশু অল্প হেসে ঘাড় কাত করল।

'তা সময় সময় হয় বৈকি, অবশ্য সব মানুষকে দেখে এটা হয় না, বিশেষ কাউকে দেখলে কেমন যেন কবি হয়ে যেতে ইচ্ছে করে!'

রণধীর এবার দু' হাতে টেবিল চাপড়ে হৈ-হৈ করে উঠল। সীতাংশুর দিক থেকে চোখ না ফিরিয়ে ব্রততী ভুরু কোঁচকাল। 'উঃ'

আপনার সঙ্গে পারা যাবে না, এবার আমি হার মানছি।' ঘর থেকে সে ছুটে পালাচ্ছিল।

'শুনুন, শুনুন!' সীতাংশু ডাকছিল।

'বসুন, আমি চা নিয়ে আসছি।' পর্দার ওপারে বন্ধুপত্নী ততক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

তাই সীতাংশু এখন চিন্তা করছিল, এভাবে এখানে এসে হাস্যপরিহাসের মধ্যে এক একটা দিন কেটেছে, কিন্তু আজ সে-সব কিছুই চলবে না। মনে মনে সে এটা ঠিক করে এসেছে। ডাক্তার-গিন্নী প্রাণ ভরে গোলাপের গন্ধ শুঁকুক কি খোঁপায় গোলাপ গুঁজুক বা ঐ যে সুঠাম লম্বা শরীরে সবুজ শাড়িটা জড়িয়ে বসন্তের নবপল্লবিত তরুণ দেবদারু বৃক্ষের চেহারা ধরেছে, এই নিয়ে সে কোনোরকম মন্তব্য করবে না। তার মনের অবস্থা আজ অন্যরকম। সে যাকে ভালবাসত বুকে তুলে চুমু খেত তাকে কাল কবরের নিচে রেখে এসেছে। কাজেই কোনোরকম ঠাট্টাকৌতুক হাস্যরসিকতা তাকে মানাবে না। শোকার্ত সে।

কিন্তু তার রাগ হচ্ছিল, ভদ্রমহিলা ফুল নিয়ে এত মেতে আছেন, ধারে কাছে এখন আগুন লাগলে কি ভূমিকম্প হলেও যেন তিনি টের পেতেন না।'

ধাক্কা দিয়ে লোহার গেটটা খুলল সে। ইচ্ছা করে একটা শব্দ করল।

চমকে উঠে চোখ ফেরাল ব্রততী।

'এ কি, স্বপ্ন দেখছি মনে হয়!'

'বরং বলুন স্বপ্নভঙ্গ হলো।' সীতাংশু গোলাপ ঝোপের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। 'যেমন তন্ময় হয়ে ফুলের ঘ্রাণ নিচ্ছিলেন।'

ইচ্ছা ছিল না এ ধরনের কিছু বলা, তা হলেও একটা কিছু বলে সামনে দাঁড়াতে হয় তাই সীতাংশুকে বলতে হলো।

তার ফলে যা হবার হলো। বাগানময় জলতরঙ্গের বাজনা ছড়িয়ে

পড়ল। ব্রততী যখন খুশি হয়, যখন গলা খুলে হাসে তখন এমনি করেই হাসে। এই সতেরো দিনে হাসিটা ভুলে গিয়েছিল সীতাংশু। এখন নূতন করে তাব কানে লাগল।

কাজেই সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে গেল সে। পাছে আবার না এ ধরনের কিছু তার মুখ থেকে বেরোয়। চট করে গম্ভীর হয়ে বলল, 'কর্তা কোথায় ?'

'ঘরে, আসুন।'

'কখন ফিরল ?'

'আজ বাড়ি থেকেই বেরোয় নি।'

'সে কি ? ছুটি ?' ব্রততীকে সামনে রেখে সে পিছনে হাঁটছিল। ব্রততী মাথা নাড়ল।

'সর্দিজ্বরের মতন হয়েছে তাই বেরোয় নি।'

'অসুস্থ !' সীতাংশু যেন খুব অবাক হলো। 'শেষটায় ডাক্তার নিজেই অসুখে পড়ল।'

বারান্দায় উঠে ব্রততী ঘাড় ঘুরিয়ে হাসল। এবার আর বাজনা বাজল না যদিও। 'ডাক্তারদের বুঝি অসুখ করতে নেই ?'

'না, তা নয়।' সীতাংশু অন্যদিকে তাকাল। 'কবে থেকে শরীর খারাপ ?'

'কবে থেকে কী, আজ সকালে গায়ে হাত দিয়ে দেখলুম গা-টা যেন একটু গরম হয়েছে ; কাল রাত করে বেরোতে হয়েছিল, ঠাণ্ডা লেগেছে।'

'রাত্রে কল্ এসেছিল বুঝি ?'

ব্রততী মাথা নাড়ল।

'ম্যানেজারের ছোট ছেলের অসুখ। রাত একটার সময় আর্দালি পাঠিয়ে ডাক্তারবাবুকে ডেকে নিয়ে গেল।'

সীতাংশু হঠাৎ কথা বলল না।

'আসুন।' পর্দাটা এক পাশে ঠেলে দিয়ে ব্রততী চৌকাঠের এক

পাশে সরে দাঁড়াল। সীতাংশু ভিতরে ঢুকল। রণধীরের বসবার ঘর। 'আপনি বসুন, সম্ভবত ঘুমোচ্ছে ও, খুব অবাক হয়ে যাবে কিন্তু আপনাকে আজ দেখে, দাঁড়ান আগে কিচ্ছু বলব না ; বলব, কে একজন ডাকছে তোমাকে দেখবে এসো।' হি-হি করে হাসল ব্রততী এবং পাশের কামরায় ঢুকবার আগে এ ঘরের রাস্তার দিকের দুটো জানালাই খুলে দিয়ে গেল।

সীতাংশু অস্বস্তিবোধ করছিল।

যেন এই মুহূর্তে তার সমস্ত সঙ্কল্প ভেস্তে যাচ্ছিল। ব্রততী যখন জানালা খুলছিল তখন এমনভাবে তাকাচ্ছিল সে তার দিকে, যেন চুরি করে ঐ শরীরের পিছনটা না দেখলে দমবন্ধ হয়ে মরত সে।

সেই লোভ, সেই কদর্য লালসা।

অথচ এই যে মুখোমুখি হয়ে কথা বলল, চোখে চোখ রেখে মানুষটিকে দেখল সে তা যেন যথেষ্ট হয় নি, যেই মাত্র ঘুরে দাঁড়িয়ে ব্রততী জানালা খুলতে গেছে অমনি চোরের মতন আবার তার পিঠ কোমর কাঁধ গলা দেখার নির্লজ্জ বাসনা তাকে পেয়ে বসল।

একটা গদি-আঁটা চেয়াবে বসেছিল সে। তৎক্ষণাৎ আবার উঠে দাঁড়াচ্ছিল। দরকার নেই রণধীরের সঙ্গে দেখা করে। এখনি আবার বেবিয়ে পড়ে টিয়াটুলির রাস্তা ধরবে সে।

অস্থির মন নিয়ে কথাটা চিন্তা করছিল সে, হঠাৎ পাশের কামরায় বন্ধুর গলার স্বর শুনে কাঠের মতন শক্ত হয়ে গেল। চেয়ার ছেড়ে ওঠা হলো না।

'কই, জংলীটা এল তা হলে শেষ পর্যন্ত। কোথায়—' কেমন যেন পড়িমরি করে রণধীর পর্দা সরিয়ে এ ঘরে এসে ঢুকল। পিছনে ব্রততী।

সীতাংশু ভাল করে চোখ তুলে তাকাবার আগে রণধীর ছুটে এসে তার কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিল। 'এলি তা হলে শেষ পর্যন্ত।'

রণধীরের গায়ে একটা কমলা রঙের র‍্যাপার জড়ান। পরনে

ডোরাকাটা পায়জামা। বাড়িতে যা সে পরে থাকে। পায়ে সেই পুরোনো হরিণচামড়ার চটি জোড়া। হয়তো একটু গা গরম হয়েছে, সর্দি লেগেছে, কিন্তু ক'দিন আগে যা দেখেছিল সীতাংশু, আজ যেন তার চেয়েও বেশি শক্ত মজবুত তাজা ও প্রফুল্ল দেখছিল ডাক্তারকে।

'তোর নাকি শরীর খারাপ ?' মৃদু হেসে সীতাংশু প্রশ্ন করল।

'এই শরীর কখনো খারাপ হয় তুই বিশ্বাস করিস !' রণধীর সামনের সোফাটায় বসে পড়ল। ব্রততী তার পিছনে সোফার পিঠে কনুইয়ের ভর রেখে সামনের দিকে ঝুঁকে দাঁড়াল। 'আসলে এটা শ্রীমতীর আবিষ্কার।' চোখ দুটো একটু ওপরের দিকে তুলে স্ত্রীকে একবার দেখে নিয়ে রণধীর সীতাংশুর দিকে তাকিয়ে হাসল। 'সর্দি করেছে আমি অস্বীকার করব না, কিন্তু গা গরম হয়েছে আমি বিশ্বাস করি না। ও ভোরবেলা বিছানায় থাকতে আমার গায়ে হাত রেখে বলে কি না, তোমার জ্বর, আজ বোরোতে পারবে না।'

'তারপর ?'

'আমি তখনি টেম্পারেচার নিয়ে দেখলাম—কিছু না, ভাল করে নিরান্নব্বুইও ওঠে নি।'

'শুনুন !' ব্রততী রীতিমত চেঁচিয়ে উঠল।

'তার মানে নিরান্নব্বুই উঠেছিল টেম্পারেচার, যদি ওটাকেও গা গরম না হওয়া বলে তো ও নিজে ডাক্তার, কে ওকে বোঝায় বলুন।' সীতাংশুর দিকে তাকাল সে।

সীতাংশু শব্দ না করে হাসছিল।

'আর ঐ শরীর নিয়ে বাবু আজও বেরোচ্ছিলেন, পরে আমি এমন বকুনি লাগালাম—'

'সত্যিই তো', তার সাধ্বী স্ত্রীর দিকে না, যতটা সম্ভব রণধীরের মুখের দিকে সীতাংশু চোখ দুটো ধরে রেখে কথা বলতে চেষ্টা করল। 'এমন অবুঝ হলে তো চলে না, তুই একটা ডাক্তার, সামান্য অসুখ-

বিসুখও অবহেলা করতে নেই জানিস, চট করে অসুখটা বেড়ে যেতে কতক্ষণ।'

'আপনি আপনার বন্ধুটিকে বুঝিয়ে বলুন তো, এক একটা ব্যাপার নিয়ে সময় সময় এমন ছেলেমানুষি করে, সামাল দেওয়া আমার পক্ষে শক্ত হয়ে পড়ে।' অভিমান থমথম করছিল ব্রততীর গলায়।

'না, এতটা ছেলেমানুষি করা ঠিক না।' সীতাংশু এবার রণধীরের দিকে তাকাল না, ব্রততীর দিকেও না, দেওয়ালের গায়ে চোখটা ধরে রেখে দেওয়ালটাকে উদ্দেশ করেই যেন বলল, 'সব সময় নিজের বুদ্ধি নিয়ে চলব, মনে যা আসে তাই করব—এটা ঠিক না, আর-একজনের মনের দিকেও তাকাতে হয়, তার কথাও শুনতে হয়।'

'শুনি বৈকি।' রণধীর সোফার গায়ে হেলান দিয়ে বসেছিল, হঠাৎ সোজা হয়ে বসল। 'ওকে তুই একবার জিজ্ঞেস কর, ওর কোন্ কথাটা আমি না শুনি। আজ একটা জরুরী কেস ছিল, তাই ভাবলাম একবার রুগীটাকে দেখে আসি।'

'আহা রুগী তো রোজই থাকবে, তা বলে তুমি নিজের অসুখটা অবহেলা করবে!' ব্রততী চোখ নামিয়ে স্বামীকে দেখছিল। পরে সীতাংশুর দিকে তাকাল। 'এই নিয়ে সকালে আমার সঙ্গে রীতিমত ঝগড়া, আপনি জানেন না সীতাংশুবাবু, ভীষণ একগুঁয়ে মানুষ ও, আমার যে কত কষ্ট হয় ওকে নিয়ে চলতে।'

আর যেন দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকা সীতাংশুর পক্ষে সম্ভব ছিল না। আড়চোখে বন্ধুপত্নীকে দেখল। যা সে অনুমান করেছিল, ভ্রমরের মতো কালো চোখ দুটো ছলছল করছে। নাকের ডগা ফুলে উঠেছে।

'ছি, এমন একগুঁয়ে হয়ে চলা তোর পক্ষে অত্যন্ত অন্যায়। ব্রততী যখন যেভাবে বলবে সেভাবে তোর চলা উচিত, সব সময় সে তোর ভালটাই চাইছে, কাজেই—'

রণধীর হাতের নখ খুঁটছিল। কথা বলছিল না। ব্রততী কেঁদে

ফেলবে, সে যেন প্রস্তুত ছিল না। যেন লজ্জা পেয়ে সীতাংশুর দিকে তাকাতে পারছিল না।

'বসুন সীতাংশুবাবু, আমি আসছি।' আঁচল দিয়ে চোখ মুছে ব্রততী পাশের একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। সম্ভবত চোখে মুখে জল দিতে বাথরুমে গেল, সীতাংশু অনুমান করল।

রণধীর তখনও নীরব। চেয়ারের পিঠে মাথাটা এলিয়ে দিয়ে সীতাংশু এক মিনিট চোখ বুজে থেকে ভাবল। ভালবাসার ঝগড়া? প্রেমের মান-অভিমান? তা হবে, যত দিন যাচ্ছে ভালবাসা গাঢ় হচ্ছে, গভীর হচ্ছে। আগেও সে দু'জনকে দেখেছে। তখনও ভালবাসার কমতি ছিল না। তবে তখন যেন ভালবাসাটা সরবতের মতো টলটল করত, আগুনের জ্বাল খেয়ে খেয়ে এখন গাঢ় হয়েছে, ঘন হয়েছে। আরও ঘন হবে। তারপর একদিন মিশ্রীর দানার মতন নিরেট শক্ত হয়ে যাবে। তখন হাতুড়ির ঘা ছাড়া এ জিনিস কিছুতেই ভাঙবে না। পায়ের শব্দ শুনে সীতাংশু চোখ খুলল। চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে ব্রততী ঘরে ঢুকল।

'যা-ই বলিস সীতাংশু।' চা খেতে খেতে রণধীর একসময় বলল, 'একগুঁয়েমি করি, করতে চাই, যেন করলে ভাল লাগবে মনে হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটা থাকে না।'

'থাকা উচিত নয়।' হাতঘড়ির ওপর একবার চোখ বুলিয়ে সীতাংশু বলল, 'দু'জনে মিলেমিশে থাকার মধ্যে যতটা আনন্দ যতটা শান্তি, একলা নিজের মর্জিমতন থাকতে গেলে চলতে গেলে সেই শান্তি, সেই মনের আনন্দ তুই পাবি কোথায়।'

এবার ব্রততী কথা বলল। তার মন বেশ কিছুক্ষণ থেকে হাল্কা হতে আরম্ভ করেছিল। সীতাংশু এমন সুন্দর করে বোঝাচ্ছিল রণধীরকে। ব্রততীর বুদ্ধিবিবেচনা চিন্তাশক্তি দূরদর্শিতা রণধীরের চেয়ে অনেক বেশি। সেই তুলনায় রণধীর, বই মুখস্থ করে ডাক্তারী

পাশ করতে পারে, মোটেই তেমন প্র্যাক্টিকেল নয়, গোছালো নয়। পয়সা উপায় করতে পারে সে, কিন্তু এই যে আজ তার ঘরের দিকে তাকালে চোখ জুড়িয়ে যায়, সর্বত্র একটা শৃঙ্খলা সুরুচি সুবিন্যাসের ছাপ, এর সবটুকু কৃতিত্ব ব্রততীর। যে কেউ রণধীরের ঘরের দিকে চোখ ফেরানো মাত্র বলে দেবে, তার ঘরের মানুষটি, কেবল দেহের দিক থেকে নয়, মনের দিক থেকেও অতুল সৌন্দর্যের অধিকারিণী। তাই এই সংসারের চেহারা এমন উজ্জ্বল সুন্দর। এতটা প্রশংসা ব্রততী আশা করে নি। তা হলেও প্রশংসা শুনলে কে না খুশি হয়। কিন্তু কেবল তাই নয়, রণধীর এককেবার জল হয়ে যাচ্ছিল—লজ্জা পেয়ে বন্ধুর সঙ্গে তেমন গলা খুলে কথা বলতে পারছিল না এক এক সময়—এই জিনিসটাই ব্রততীকে আনন্দ দিচ্ছিল বেশি।

রণধীর যত নরম হচ্ছিল তত তার চোখের উজ্জ্বলতা মুখের দীপ্তি ফিরে আসছিল।

সীতাংশুর চোখে চোখ রেখে রণধীর বলল, 'এবং এ-ও সত্য, এটা ওটা নিয়ে আমি জেদ করি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জেদ আঁকড়ে থাকা সম্ভব হয় না, ওর কাছে আমাকে আত্মসমর্পণ করতেই হয়।'

'করা উচিত, এমন মানুষের কাছে আত্মসমর্পণ না করলে কার কাছে করবি।' আজ যেন সীতাংশু কেবল সর্দারী করতে এসেছে, বন্ধুকে কেবল উপদেশ দেওয়া সুপরামর্শ দেওয়া। এক দিক থেকে জিনিসটা তার ভালই লাগছিল। গাম্ভীর্য বজায় রেখে চলতে সুবিধা হচ্ছিল তার। কোনোরকম চাঞ্চল্য বা অস্থিরতা তার মনে উঁকি দেবার সুযোগ পাচ্ছিল না। এমন একটা পরিবেশ সে চেয়েছিল। আসতে না আসতে ব্রততী যদি চোখের জল না ফেলত, তো একটা গুরুগম্ভীর আবহাওয়া তাকেই সৃষ্টি করতে হতো, খরগোসের বাচ্চাটার কথা বলতে হতো তাকে, কত সুন্দর ছিল বাচ্চাটা, ঘাসের ওপর কেমন চমৎকার ছুটোছুটি করত, কত আদর যত্ন করত সে ওটাকে, বুকে নিয়ে কতদিন চুমু খেয়েছে, তারপর হঠাৎ কাল কাঠুরিয়ারা যখন কাঠ

কাটছিল একটা কাঠের টুকরো এসে ছিটকে পড়ে কেমন করে বাচ্চাটা মরল। তারপর ওটাকে কবর দেওয়া, কবরের ওপর ফুলগাছ লাগান। আজ সন্ধ্যাবেলা কবরে বাতি দিতে হবে। মোম জ্বেলে দেবে। হাটের দোকান থেকে সেই কখন মোমবাতি আনা হয়ে গেছে। খুঁটিয়ে সব কিছু বলত সীতাংশু। কিছুই গোপন করত না। দরকার হলে রণধীরের সামনে ব্রততীর সামনে সে চোখের জল ফেলত।

একটা খরগোসের বাচ্চার জন্য এত মায়া। শুনে দু'জন হাসত কিনা ঈশ্বর জানে, কিন্তু সীতাংশু এভাবে একটা দুঃখের পরিমণ্ডল তৈরি করত এবং শোকের চেহারা নিয়ে বন্ধু ও বন্ধুপত্নীর সঙ্গে কথা বলত, চা খেত, তারপর উঠে বিদায় নিয়ে এক সময় চলে যেত।

সেসব অবশ্য তাকে কিছুই করতে হলো না। খরগোসের গল্পটা একেবারে চেপে যেতে পারল সে। এই জন্য মনে মনে সে খুশি হলো।

কিন্তু ব্রততী যে অনেক বেশি খুশি হয়েছিল। 'এমন মানুষের কাছে আত্মসমর্পণ না করলে কার কাছে করবি'—স্বামীকে কেউ এই সুপরামর্শ দিচ্ছে শুনতে পেলে জগতের কোন্ স্ত্রী খুশি না হয়!

চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রেখে সীতাংশু সিগারেট ধরাচ্ছিল। এবার বিদায় নেবার পালা। 'আচ্ছা, আজ উঠি রণধীর', কথাটা মুখ থেকে সে প্রায় বের করে ফেলেছিল।

ব্রততী বলল, 'আজ আমার একটা কথা রাখতে হবে সীতাংশুবাবু।'

সীতাংশু চমকে উঠল। যেন রণধীরও ঈষৎ অবাক হলো। ঠিক এই মুহূর্তে হঠাৎ 'আমার কথা' বলতে ব্রততী এমন কি বিশেষ আর্জি সীতাংশুর কাছে পেশ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে বুঝতে না পেরে কেমন ফ্যালফ্যাল করে স্ত্রীর মুখের দিকে সে তাকিয়ে রইল। রণধীরের অসহায় মূর্তিটা সীতাংশুও লক্ষ্য করল।

'কি বলুন।' গম্ভীর হয়ে সীতাংশু দেওয়ালের দিকে চোখ রাখল। 'আমাকে একটু সকাল সকাল ফিরতে হবে।'

'ঐ তো, কথাটা বলার আগেই ফ্যাঁকড়া তুলছেন,' ব্রততী কেমন হতাশ হলো। রণধীর তখনও চোখ বড় করে স্ত্রীর মুখ দেখছিল। ব্যাপারটা অনুমান করে বুঝে নিতে তার কষ্ট হচ্ছিল।

সীতাংশু সামান্য হাসল। ব্রততীর দিকে চোখ ফেরাল।

'যদি আমার ক্ষমতা থাকে আপনার কথা রাখব, নিশ্চয় রাখব।'

সঙ্গে সঙ্গে রণধীরও মুখ খুলল।

'আহা, আগে তো তুমি কথাটা বলবে, না বললে বেচারা বুঝবে কি করে তোমার অনুরোধ সে রাখতে পারবে কি পারবে না—' এক সঙ্গে ব্রততী ও সীতাংশুর চোখ দেখল সে।

ব্রততী ভুরু কোঁচকাল। রণধীরের দিকে তাকাল না। এক সেকেণ্ড গম্ভীর থেকে পরে সীতাংশুর চোখে চোখ রেখে সুন্দর করে হাসল।

'নিশ্চয় এমন কোনো আব্দার আমি করব না যে সেটা রাখতে গেলে আপনাকে ভীষণ অসুবিধায় পড়তে হবে, খুবই সামান্য জিনিস, সাধারণ কথা, আপনি নিঃসন্দেহে ধরে নিতে পারেন।'

এবার রণধীরের মুখে ঈষৎ হাসি দেখা দিল। যেন এতক্ষণ পর ব্যাপারটা কতকটা অনুমান করতে পেরে নিশ্চিন্ত হলো সে।

'সতেরো দিন পরে তো এলি, এসেই সকাল সকাল তোর সেই জঙ্গলের ডেরায় ফিরে যাবার কি হলো আমায় বলতে পারিস?'

'একটা জরুরী কাজ আছে।' বিড়বিড় করল সীতাংশু। বন্ধু বা বন্ধুপত্নীর মুখের দিকে সে আর তাকাচ্ছিল না।

'খাওয়া-দাওয়া করে তারপর যাবেন—তেমন কিছু ভয়ংকর অনুরোধ রক্ষা করতে আপনাকে বলব না।' টেবিলের ওপর ঝুঁকে ছিল ব্রততী, পিঠ টান করে সোজা হয়ে বসল। 'চট করে ওদিককার সব ব্যবস্থা আমি করে ফেলছি, একটুও দেরি হবে না।'

'না, অত তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই—'

রণধীর যেন অতর্কিতে সতেজ ও প্রফুল্ল হয়ে উঠল। তার চোখের স্বাভাবিক রং ফিরে এসেছে। 'সেই তো ঘরে গিয়ে রাত বারোটায় উনুন জ্বালবে, তারপর আধসেদ্ধ খিচুড়ি পাকিয়ে খাবে—না হয় একটা দিন তার ব্যতিক্রম ঘটবে—' ব্রততীর দিকে ঘাড় ফিরিয়ে কথা বলতে বলতে রণধীর পরে বন্ধুর দিকে চোখ রাখল। 'এমন নেমন্তন্নটা প্রত্যাখ্যান করলে ভীষণ ঠকতে হবে কিন্তু সীতাংশু।' রণধীর মিটিমিটি হাসতে লাগল।

'কি রকম ?' সীতাংশুও অল্প অল্প হাসছিল। কিন্তু তার চোখে মুখে একটা অস্বস্তি ফুটে উঠল। হাতের ঘড়ি দেখল সে। ওদিকের খোলা জানালাটায় একবার চোখ রাখল। সূর্যাস্তের শেষ রক্ত রং মুছে গিয়ে আকাশটা কালো হয়ে উঠেছে।

তার চেহারা দেখে ব্রততী বুঝতে পারছিল সীতাংশু এখনি 'না' বলে বসবে, জরুরী কাজ আছে বলে উঠতে চাইবে। 'শুনুন', ব্রততী তৎক্ষণাৎ আবার টেবিলের ওপর ঝুঁকল। 'ওর এক পেসেন্ট আজ খাসা একটা মুর্গি পাঠিয়ে দিয়েছে—তা আমরা দু'জন তো মানুষ, এতবড় একটা মুর্গি খাব কি করে, তা ছাড়া ওবেলা ওর শরীর খারাপ ছিল তেমন কিছু খায়ও নি, আপনি যখন দয়া করে এসে গেছেন, ভাবছি এবেলা ওটা রান্না করে খাওয়া হবে।'

কিন্তু এতৎসত্ত্বেও সীতাংশু মাথা নাড়ল।

'আজ হয় না, সন্ধ্যাসন্ধ্যি আমাকে ফিরতেই হবে।'

'এই স্কাউণ্ড্রেল!' চোখ পাকিয়ে সীতাংশুর মুখের দিকে তাকিয়ে রণধীর ধমক দিয়ে উঠল। আমি তোমার অনেক বেয়াদপি সহ্য করেছি, সেদিনও তোমাকে আনতে গিয়ে ফিরে এসেছি—আজ ও নিজের মুখে তোকে খেতে বলছে; আমার কথা ফেলতে পারিস, কিন্তু আশা করি তুই অন্তত ওই মানুষটার সঙ্গে অভদ্রতা করবি না।'

'আরে সেদিনও তো ওঁর হাতের রান্না মাংস ভাত খেয়ে গেছি,

আজ একটু তাড়াতাড়ি ফেরার দরকার আছে বলে—'

সীতাংশুর কথা শেষ হলো না। সদরের কড়া নাড়ার শব্দ হলো। রণধীর চমকে উঠল।

'কে—' ব্রততী দরজার কাছে ছুটে গেল।

'যেন এইমাত্র একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল বলে মনে হলো না!' রণধীর সীতাংশুর মুখের দিকে তাকাল।

'তাই তো মনে হলো, তারপর তো যেন কেউ কড়া নাড়ছে।' সীতাংশু ঘাড় সোজা করে দরজাটা দেখল। ব্রততী বারান্দায় চলে গেছে। 'মনে হয় তোর কোনো রুগীটুগী।' বন্ধুর দিকে ঘাড় ফেরাল সীতাংশু।

সেই মুহূর্তে ব্রততী ঘরে ঢুকল।

'কি ব্যাপার?' রণধীর ব্যস্ত হয়ে তার মুখ দেখল।

'তোমার ম্যানেজার সাহেব গাড়ি পাঠিয়েছে। ছেলের অসুখ বেড়েছে। আর্দালি এসেছে তোমাকে নিয়ে যেতে।'

এক সেকেণ্ড চুপ থেকে রণধীর ভাবল।

'আমি বললাম, ডাক্তারবাবুর শরীর খারাপ, বেরুতে পারবে না।' ব্রততীর চোখেমুখে অস্থিরতা প্রকট হয়ে উঠল। 'তুমি একটু বেরিয়ে এসো, এসে ওকে বলে দাও যেতে পারবে না।'

'না, তা হয় না।' রণধীর মাথা নাড়ল। ছেলেটার খুব সম্ভব টাইফয়েড হয়েছে। কাল রাত্রেই সিম্‌পটম্ দেখে অনেকটা বুঝতে পেরেছিলাম। তা হলেও একটা মিক্‌শ্চার লিখে দিয়ে এসেছিলাম। বলে এসেছিলাম আজ সারাদিন জ্বর না কমলে বিকালের দিকে খবর দিতে।'

'তা হলে শরীর খারাপ নিয়ে তুমি যাচ্ছ?'

'উপায় কি', কেমন যেন অসহায় চোখে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাল রণধীর। 'বাগানের ম্যানেজার, তাঁর ছেলের অসুখ, আমিও এই বাগানের ডাক্তার—এক আধটু শরীর খারাপ হলেও আমার যাওয়া

উচিত, বিশেষ করে টাইফয়েড কেস্ বলে মনে হচ্ছে যখন এটা। তুই কি বলিস সীতাংশু।'

একটা ঢোক গিলল সীতাংশু। আড়চোখে ব্রততীকে দেখল। তারপর রণধীরের দিকে চোখ ফেরাল।

'ম্যানেজারের বাংলো কদ্দূর?'

'এই তো, এক মাইলের রাস্তা, কি একটু বেশি হতে পারে। তা ছাড়া গাড়ি পাঠিয়েছে। এই গাড়ি করেই আমি ফিরে আসছি, আধ ঘণ্টার মামলা।'

'টাইফয়েড কেস্ বলছ যখন—তা ছাড়া গাড়ি করে যাচ্ছ—' সীতাংশু বিড়বিড় করতে লাগল।

'আধ ঘণ্টার বেশি লাগবে না। হয়তো তার আগেই আমি ফিরতে পারি।' রণধীর স্ত্রীর দিকে তাকাল। 'বরং তুমি আমার গরম সার্টটা সুটকেস থেকে বার করে দাও। রাস্তায় আর ঠাণ্ডা লাগবে না।'

সীতাংশু মাথা নাড়ল।

'হুঁ, গরম কিছু একটা গায়ে পরে যাও। ঠাণ্ডা একটু পড়েছে বৈকি।'

যেন আর আপত্তি করার কিছু মানে হয় না। তা হলেও ব্রততীর গলায় একটা ক্রোধ ঝঙ্কার দিয়ে উঠল।

'বাগানের ম্যানেজারের ছেলের অসুখ না হয়ে আর কারো অসুখ করত, দেখতাম কি করে তুমি বাড়ি থেকে বেরোও।' বলে আর সে দাঁড়াল না। পর্দা সরিয়ে পাশের কামরায় ঢুকে পড়ল।

সম্ভবত রণধীরের গরম জামাকাপড় খুলতে চলে গেল সে।

'তা হলে সীতাংশু, ঐ কথা রইল। খাওয়া-দাওয়া না করে এখান থেকে পালাবি না। ও খুব কষ্ট পাবে কিন্তু মনে।'

যেন এক্ষেত্রেও আর আপত্তি করার কোনো অর্থ হয় না। অসহায়ের মতন সীতাংশু একভাবে বসে রইল। রণধীর পোষাক

পরতে পাশের ঘরে চলে গেল, ইতিমধ্যে চাকর এসে ঘরে আলো রেখে গেল। সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

একটু পরে রণধীর ও ব্রততী এক সঙ্গে পর্দা সরিয়ে এ ঘরে এসে দাঁড়াল। কালো ট্রাউজার ও ছাই রঙের ফ্লানেলের সার্টে রণধীরকে আরও বেশি গাট্টাগোট্টা মজবুত দেখাচ্ছিল। ব্রততীও ইতিমধ্যে পোষাকটা পাল্টে এসেছে। সবুজ রং ছেড়ে পেঁয়াজ রঙের শাড়ি পরেছে। রণধীরের পাশে তার পাতলা ছিপছিপে শরীরটাকে ঠুনকো অসার মনে হচ্ছিল।

কিন্তু তা হলে হবে কি। সীতাংশু চিন্তা করল, এই সংসারে প্রভাব-প্রতিপত্তি তেজ-বিক্রম যদি কারো থাকে তো এই নারীরই আছে, পুরুষটির কিছু না, বার বার তাকে হাল্কা ঠুনকো শরীরের মানুষটির কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়। ভিতরে ভিতরে রণধীর নানারকম জেদের আগুন জ্বালিয়ে রাখতে চায়, কিন্তু ব্রততী এক ফুঁয়ে সব নিভিয়ে দেয়।

তাদের সঙ্গে সীতাংশুও বারান্দায় এসে দাঁড়াল। আর্দালি দরজা খুলে দিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ডাক্তারবাবুকে দেখে সে সেলাম ঠুকল। রণধীর ঘাড় ফিরিয়ে সীতাংশু ও ব্রততীকে একবার দেখে নিয়ে গাড়িতে উঠে বসল।

'সকাল সকাল ফিরবে, আমরা তোমার জন্য অপেক্ষা করব।' সিঁড়িতে নেমে গাড়ির দিকে মুখ করে ব্রততী চেঁচিয়ে উঠল।

রণধীর জানালার বাইরে মুখ বাড়িয়ে দিয়ে হেসে ঘাড় কাত করল।

ইতিমধ্যে ব্রততী ও সীতাংশুর উদ্দেশে বড় করে একটা সেলাম ঠুকে আর্দালি ড্রাইভারের পাশে উঠে বসেছে। গাড়ি শব্দ করে উঠল, আলো জ্বলে উঠল, তারপর কাঁকর বিছানো আঁকাবাঁকা পথ ধরে গাড়িটা পশ্চিম দিকে ছুটে চলে গেল।

'ও বলছে বটে পিয়ালীছড়া এখান থেকে এক মাইল কি তার

একটু বেশি, কিন্তু আমি জানি, আমি তো ওর সঙ্গে একদিন ওদিকটায় বেড়িয়ে এসেছি, পাক্কা দু'মাইল রাস্তা।' সীতাংশু শব্দ করল না। ব্রততীর সঙ্গে বারান্দায় উঠে এল।

সীতাংশু শুনেছে পিয়ালীছড়ায় রণধীরদের বাগানের ম্যানেজার থাকে। ঠিক পিয়ালীছড়া না হলেও ওদিকে কাছাকাছি একটা জায়গায় তাকে ক'দিন আগে একটা কাজে যেতে হয়েছিল। এখনও সবদিক ঘুরে তার দেখা হয় নি।

'তা হলেও রণধীর খুব একটা দেরি করবে না বলে আমার মনে হয়।' ঘরে ঢুকে অনেকটা যেন ব্রততীকে সান্ত্বনা দেবার জন্য সে বলল, 'আধঘণ্টা তিনপো ঘণ্টার মধ্যে ঠিক ও ফিরে আসবে।'

'ওর হলো রাক্ষসীর যাওয়া আর তার ফিরে আসা। এই ফিরছি বলে গেল তো ফিরল সেই রাত কাবার করে। সত্যি এমন দুশ্চিন্তার মধ্যে এক-একদিন ফেলে যায় আমাকে।'

'দুশ্চিন্তা করবেন না।' সীতাংশু আবার যেন বন্ধুপত্নীকে সান্ত্বনা দিল। 'আমি এখানে আছি, একটু সকাল সকাল আমাকে ফিরতে হবে এ-ও জেনে গেছে যখন—আমার তো মনে হয় না দেরি করবে। তা ছাড়া শরীরটাও যখন তেমন ভাল নেই।'

'কিছু বিশ্বাস নেই, বলছেন শরীর ভাল না, হয়তো ওখানে বসেই খবর পেল কুলি ব্যারাকে কারো অসুখ করেছে, অমনি ছুটে গেল সেখানে। নিজের স্বাস্থ্যের দিকে, শরীরের দিকে ওর নজর আছে নাকি!' একটু চুপ থেকে হ্যারিকেনের সলতেটা সামান্য উস্কে দিল ব্রততী।

সীতাংশু বন্ধুপত্নীর ফরসা হাতটাই শুধু দেখছিল, মুখের দিকে চোখ তুলছিল না। হাতের নিটোল ঝকঝকে আঙুলগুলি দেখতে দেখতে ভাবছিল, হয়তো তার স্বাস্থ্য নিয়ে শরীর নিয়ে আর একজন সর্বদা চিন্তা করছে সতর্ক থাকছে, তাই রণধীর নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে মোটেই সাবধান হবার মনোযোগ দেবার প্রয়োজন বোধ করছে না।

তার সমস্ত মনোযোগ সব চিন্তা টিয়াটুলির কারখানার কুলি কর্মচারী ম্যানেজার এবং তাদের পরিবারের মানুষদের স্বাস্থ্য নিয়ে। দিনরাত ওই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে এবং কারো অসুখ-বিসুখ হয়েছে খবর পাওয়ামাত্র সেখানে ছুটে যাচ্ছে।

'আপনি জানেন না, একটি শিশুর বাড়া আপনার এই বন্ধুটি। আমি কি আর ডাক্তার দেখি নি, না পৃথিবীতে ও-ই একমাত্র ডাক্তার, কিন্তু এমন ব্যোমভোলা হয়ে ডাক্তারী করতে আর কাউকে দেখি নি। নিজের দিকে একেবারে তাকাবে না, এমন পাগল সংসারে আছে! এই নিয়েই তো সকালে ঝগড়া হচ্ছিল।'

সীতাংশু টের পাচ্ছিল, আলোটা উজ্জ্বল করে দিয়ে ব্রততী তার মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলছে এবং কালো চোখ দুটো আবার অভিমানে, যেমন একটু আগে দেখা গিয়েছিল, শ্রাবণের মেঘের মতো থমথম করছে। হয়তো এখনি আবার বর্ষণ আরম্ভ হবে।

'আসল কথা কি জানেন,' সীতাংশু চুপ থাকতে ভয় পাচ্ছিল। কি জানি, যদি এখন আবার মহিলা কাঁদাকাটি শুরু করে তো তাঁকে প্রবোধ দিতে, সান্ত্বনা দিতে ঠিক কোন্ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে ভেবে ঠিক করতে পারছিল না সে। তখন রণধীর সামনে বসা ছিল। বন্ধুপত্নীর পক্ষ নিয়ে সীতাংশু যা কিছু বলার রণধীরকে বলেছিল, তাকে এটা ওটা করতে সে উপদেশ দিয়েছে, একটু আধটু ভর্ৎসনাও করেছে। এখন রণধীর নেই, যাকে কেন্দ্র করে সে অনর্গল কথা বলে আর একজনের মনের সান্ত্বনা ফিরিয়ে আনতে পারে। তা হলেও সীতাংশু চেষ্টার ত্রুটি করল না। 'আসল কথা হলো কি, রণধীরের মনটা চিরকালই বড় নরম, ঐ যে বললেন, শিশুর মতন, মানুষটা তাই। কারো দুঃখ কষ্ট দেখলে কখনই স্থির থাকতে পারে না। একজনকে সাহায্য করতে তার উপকার করতে—'

'থাক, বন্ধুর গুণগান আমার কাছে আর করতে হবে না। আমার চেয়ে আপনি তাকে বেশি চিনেছেন কি না জানি না,

কিন্তু আমার দিক থেকে আমি যতটা তাকে চিনেছি, জেনেছি, ইচ্ছা করে সে এরকম করছে, নিজের শরীর স্বাস্থ্য তার কাছে যেন তুচ্ছ, তেমনি আমার অনুরোধ উপরোধ এমন কি চোখের জলও তার কাছে কিছু না—এ সবের কানাকড়িও দাম নেই তার কাছে।'

'এটা আপনার অভিমানের কথা।' সীতাংশু প্রদীপের শিখাটার দিকে চোখ রেখে হাসবার ভঙ্গি করল। 'রুগী দেখতে গিয়ে পরের উপকার করতে নেমে নিজের সুখের দিকে স্বাস্থ্যের দিকে তার নজর থাকে না ঠিকই, কিন্তু আপনার মন রাখতে, আপনি যাতে ব্যথা না পান—'

ব্রততী তাকে কথা শেষ করতে দিল না।

'ঐ তো, এসব হলো আপনাদের পোষাকী কথা—আপনার বন্ধুও মুখে তাই বলে। আসলে ওর ভেতরটা ভয়ানক শক্ত, আমি তো বলি একদিক থেকে সে ভীষণ স্বার্থপর। ডাক্তারবাবুর মতন ভালমানুষ হয় না, ডাক্তারবাবুর মতন মহৎ প্রাণ এ যুগে বিরল, একটা সাধারণ কুলি থেকে আরম্ভ করে বাগানের বড় ম্যানেজার সকলের মুখে এই প্রশংসা। তাই সে তাদের চোখে আরো ভাল হতে চাইছে—হুঁ, প্রশংসার নেশা সুনামের নেশায় বুঁদ হয়ে আছে আপনার বন্ধু। বলছেন, আমার মন রাখছে সে। ক'দিন রাখছে? কতটুকুন রাখছে? একশবার বললে একবার কথা শুনছে, সাতদিন কান্নাকাটি করে তবে যদি একদিন আমার মতন করে চালাতে পারছি, যেমন আজ সকালে বাড়ি থেকে বেরোল না, তাই হয়তো গলা বড় করে আত্মসমর্পণের কথা আপনাকে শুনিয়ে দিল।'

উত্তেজিত উত্তপ্ত শোনাচ্ছিল বন্ধুপত্নীর গলার স্বর। সীতাংশু বিব্রতবোধ করছিল।

স্থির চোখে টেবিলের আলোটাই শুধু দেখছিল সে। একটা সাদা মতন পোকা বাইরে থেকে উড়ে এসে চিমনির চারদিকে নেচে নেচে ঘুরছিল।

'বলুন, আপনি একটা কথা বলুন, আমি যে ওকে নিয়ে কী বিপদে পড়েছি আপনাকে বোঝাতে পারব না।' ব্রততী টেবিলের ওপর ঝুঁকে দাঁড়াল।

'আচ্ছা, আমি আরো ভাল করে তাকে বুঝিয়ে বলব, আরো কড়া করে তাকে বলতে হবে—না, কেবল নিজের সুনাম কুড়োবার দিকে খেয়াল থাকলে তো চলবে না—তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে আর একটি মানুষ এখানে বসে থাকে তার কথা, তার ভাল লাগা না-লাগা, তার দুশ্চিন্তা, তার উদ্বেগ—সব ভুলে থেকে তুমি যদি—'

সীতাংশুর কথা শেষ হলো না।

পর্দার ওপার থেকে চাকরের গলা শোনা গেল।

'মা, উনুন ধরে গেছে।'

ব্রততী রীতিমত চমকে উঠল। টেবিল থেকে মুখটা তুলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

'দেখুন, কথায় কথায় আমি এদিকটা কেমন ভুলে গেছি। থাক গে, আপনাকে আর ওকে কিছু বোঝাতে হবে না, ও কোনোদিন কারো কথা শুনবে না। যেমন খুশি চলুক, আমিও ঠিক করেছি আর কিছু বলব না—' বলে পর্দার দিকে ব্রততী ঘুরে দাঁড়াল।

'মোহন।'

চাকর এবার ভিতরে এসে দাঁড়াল।

'মুর্গি কাটাছোলা হয়ে গেছে?' ব্রততী প্রশ্ন করল।

মোহন ঘাড় কাত করল।

'মশলা রেডি করে রেখেছিস?'

'সব তৈরি করে রেখেছি। উনুন ধরে গেছে।'

'আমি যাচ্ছি, তুই সসপেনটা চাপিয়ে দে।' সীতাংশুর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ব্রততী সুন্দর করে হাসল। যেন একটু লজ্জা পেল। 'ছি, কথায় কথায় এমন দেরি করে ফেললাম, অথচ আপনাকে যে সকাল সকাল ফিরে যেতে হবে—'

সীতাংশুও ঘাড় নাড়ল।

'না, তাতে কি, তা ছাড়া রণধীরের জন্য এমনিও তো আমাকে অপেক্ষা করতে হবে।'

'অবিশ্যি আমারও খুব একটা দেরি হবে না। ভেবেছি, উনুনে মাংসটা চাপিয়ে দিয়ে কেরোসিন স্টোভটা জ্বেলে পরটা ক'খানা ভেজে নেব।'

'দু'দিক সামলাতে পারবেন?' সীতাংশু এতক্ষণ পর অল্প হেসে বন্ধুপত্নীর মুখের দিকে তাকাল।

'আপনার যেমন কথা, কী এমন রান্নার ঘটা; কেন, আমার অ্যাসিস্টেণ্ট আছে না? মোহন খুব চালাক ছেলে।'

সীতাংশু আড়চোখে আলোর কাছের সাদা পোকাটা দেখছিল। এবার আর ওটা নেচে নেচে ঘুরছে না। বার বার ছুটে এসে চিমনির গায়ে মাথা ঠুকছে। যেন নতুন একটা খেলা পেয়েছে, খেলা নিয়ে মেতে আছে।

'কিন্তু আপনি কি এখানে একলা বসে থাকবেন?'

'তা না হয় বসে থাকলাম,' সীতাংশু চোখ তুলল। 'আমার জন্য ব্যস্ত হবেন না। আমি চুপচাপ এখানে বসে থাকতে পারব। এখনি তো রণধীর আসবে।'

দেওয়ালে চোখ রেখে ব্রততী এক সেকেণ্ড কি ভাবল, তারপর সীতাংশুর দিকে তাকাল।

'তার চেয়ে আসুন না ওঘরে, আমি রান্না করব, আপনি গল্প করবেন।'

বড় বেশি চমকে উঠতে চেয়েছিল সীতাংশু, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিল। শব্দ না করে হাসল। হাসিটা যে খুব স্বাভাবিক হলো না তা-ও সে বুঝল, তা হলেও নিজের ওপর প্রবল বিশ্বাস রেখে সে আজ এখানে এসেছে, কিছুতেই সেটা নষ্ট হতে দিল না। সহজ গলায় বলল, 'তা একরকম মন্দ বলছেন না, সেই সঙ্গে

আপনার রান্নাঘরটাও দেখা হয়ে যাবে।'

'তাই তো'—ব্রততী ঝলক দিয়ে হাসল। 'আমরা আপনাদের অফিস দেখতে যাই, কারখানা দেখতে যাই, আজ আমার কারখানাটা একবার এসে দেখুন।'

'আপনি কিন্তু একদিনও আমার জঙ্গলের ডেরায় গেলেন না, ছোটখাট একটা কারখানা আমিও তো খুলে বসেছি সেখানে।'

'নিশ্চয় যাব। আমি অনেকদিন ভেবেছি। ওকে বলেও রেখেছি।'

হঠাৎ কেন জানি সীতাংশুর মনে হলো রণধীরকে সঙ্গে নিয়ে না, ব্রততী একলা তার টিয়াটুলির আস্তানায় গেলে যেন ভাল হয়, যেন ওর সেভাবে যাওয়ার মধ্যে একটা নতুনত্ব থাকবে রোমাঞ্চ থাকবে। কিন্তু চিন্তাটা বেশি দূর অগ্রসর হতে দিল না সে। 'চলুন, আপনার রান্না দেখে সময়টা কাটানো যাবে।' সীতাংশু আর একবার হাতঘড়িটা দেখল।

ব্রততী আগে আগে চলল। সীতাংশু পিছনে।

শোবার ঘর বসবার ঘর যেমন, রান্না-ঘরের ভিতরটাও তাকিয়ে দেখবার মতন। একফোঁটা ধুলো-ময়লা কালিঝুল কোথাও লেগে নেই।

অবশ্য চিমনি-লাগান উনুন বলেই ধোঁয়াটা ওপরে উঠে বেরিয়ে যায়, ভিতরে ময়লা জমে না।

'আমি নিজে এই জিনিসটা করিয়ে নিয়েছি—খরচও তেমন কিছু পড়ে নি, অথচ দেখুন কত পরিচ্ছন্ন থাকা যায়—কত শান্তি পাওয়া যায় রাঁধতে বসে।'

'তা তো বটেই।' সীতাংশু ঘাড় ঘুরিয়ে চারদিক দেখছিল। দেওয়াল-মেঝে-জানালা-দরজা-সিলিং যেদিকে তাকানো যায় কেমন তকতকে ঝকঝকে দেখায়। তেমনি হাতা খুন্তি কড়াই ডেকচি

কাঁটা চামচ, যেন দোকান থেকে নতুন কিনে আনা হয়েছে সব, একটু দাগ নেই পোড়ার চিহ্ন নেই, মেজেঘষে আয়নার মতন করে রাখা হয়েছে। জলের বালতি গামলা কলসি—একটার পাশে আর একটা এমন সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে—শিলনোড়াটি পর্যন্ত, যেন একটু এলোমেলো হয়ে থাকবার জো নেই, এখানকারটা ওখানে যাবে কি ওখানের জিনিসটি এখানে চলে আসবে, এই রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে কেউ বুঝি কল্পনাও করতে পারে না। কোনো নিপুণ কারিগর যেন এমন আশ্চর্য শৃঙ্খলার সঙ্গে তার কাজের যন্ত্রপাতি সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছে। যখন যেটির দরকার হবে সেটি টেনে নেবে।

'আপনার মার্জিত রুচি পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গি এই সংসারের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে।' সব দেখা শেষ করে সীতাংশু ছোট একটা নিশ্বাস

'আপনি বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন।' একটা বেতের মোড়া এগিয়ে দিল ব্রততী। সীতাংশু বসল।

'আপনি প্রশংসা করছেন সত্যি, কিন্তু আমি মনে করি আরো সুন্দর করে কেন আমি আমার ঘর সাজাতে পারি না, আরো শৃঙ্খলার সঙ্গে কেন সব গুছিয়ে রাখা হয় না।' ব্রততী বড় করে একটা নিশ্বাস ফেলল।

শুনে আবার একটু ভয় পেল সীতাংশু। সতর্ক চোখে বন্ধুপত্নীর মুখটা দেখল। আবার না রণধীরের কথা ওঠে, বাইরের দিকে যার কেবল মন, বাইরের মানুষের উপকার করতে, তাদের রোগ সারাতে যে প্রতিমুহূর্তে ঘর ছেড়ে ছুটে ছুটে যাচ্ছে। যদি সেই মানুষ নিয়মমত ঘরে থাকত, ঘরের মানুষের কথা শুনত তো এই ঘরের চেহারা আরো সুন্দর হতো, এর শ্রী শতগুণ বেড়ে যেত, তাই কি?

কিন্তু ব্রততী সেকথা বলল না।

উনুনে কড়া আঁচ উঠেছে। আগুনের আভায় গৌরবর্ণ মুখে গোলাপী আভা ফুটেছে। কড়াই চাপিয়ে হলুদ লঙ্কা মাখান মাংস গরম তেলে ছেড়ে দিতে কুয়াশার মতন একটা ধোঁয়ার আবরণ সৃষ্টি করে গোলাপী মুখখানা একটু সময়ের জন্য অস্পষ্ট অস্বাভাবিক করে তুলল। খানিকটা মশলার ঝাঁজ নাকে ঢুকতে সীতাংশু হেঁচে উঠল। ইচ্ছে থাকলেও রুমাল দিয়ে নাকটা মুছতে পারল না সে। যেন আচমকা তেলের বাষ্পের সঙ্গে লঙ্কা পেঁয়াজের একটা ঝাঁজ উঠে চোখ দুটোও জ্বালা করে উঠল; চোখে জল এল, প্রায় উনুন ঘেঁষে মোড়া পেতে বন্ধুপত্নী তাকে বসতে দিয়েছে। কাজেই রান্নার গন্ধ শব্দ সে বেশ ভাল করে টের পাচ্ছিল।

'আপনার হাতের রান্নাও চমৎকার।' বিড়বিড় করে বলল সে।

ধোঁয়ার কুয়াশা কেটে গিয়ে বন্ধুপত্নীর পরিচ্ছন্ন মুখখানা আবার পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল সীতাংশু। যেন খুন্তি নাড়ার ঝাঁকুনি লেগে খোঁপাটা একটু ঢিলে হয়ে কাঁধের ওপর নেমে এসেছে। কপালে নাকের ডগায় বিন্দু বিন্দু স্বেদ জমেছে। অপলক চোখে তাকিয়ে দেখছিল সীতাংশু।

তার কথা শুনে ব্রততী কড়াই থেকে মুখ তুলল।

'আমার হাতের রান্না আপনি কবে খেলেন?'

'কেন!' সীতাংশু ঝুঁকে বসেছিল। মেরুদাঁড়া টান করে সোজা হয়ে বসল। 'এমন চমৎকার ধরনের মাংস দিয়ে সেদিন ভাত খেয়ে গেলাম। ভুলে গেছেন?'

ঠোঁট না ছড়িয়ে গলার ভিতর ছোট একটা ঢেউ তুলে ব্রততী হাসল।

'ও, আমি ভুলেই গেছি, সে তো একযুগ আগের ঘটনা।'

'তা না হয় একযুগ আগেই ঘটল, সতেরো দিনে যদি আপনার হিসাবে একযুগ হয় তো আপনি আমি শত শত যুগ ধরে পৃথিবীতে বেঁচে থাকব—যাক গে, কথা সেটা না, কথা হলো, রান্নার হাতটি

সতেরো দিন আগে যেমন ছিল আজও তেমনটি আছে—এই গুণ কেউ কেড়ে নিতে পারে না।'

'এই তো আমার কাজ সীতাংশুবাবু।' কড়াইয়ের ঢাকনা চড়িয়ে দিয়ে ব্রততী ঘুরে বসল। 'রান্নাবান্না ঘর গুছোনো ঘর সাজানো আমি খুব ভালবাসি। ছেলেবেলায় এই স্বভাবটা ছিল না, তখন যেন এসব কাজকে যমের মতন ভয় করত ভালও লাগত না, সারাক্ষণ এড়িয়ে চলতে চেয়েছি, আর এই নিয়ে মা-মাসির কাছে কত বকুনি না খেতে হয়েছে। কিন্তু আজ ভাল লাগছে, বিয়ের পর থেকে, বিশেষ করে এই রাণীরবাগ আসার পর থেকে আমার যেন কী হয়েছে, কোথাও বেড়াতে-টেড়াতে যেতে ইচ্ছে করে না, সারাক্ষণই ঘরে থেকে টুকটাক এটা-ওটা করতে ভাল লাগে। বড় জোর বাগানে গিয়ে একটু দাঁড়াই। ওই গোলাপগাছও আমার হাতের। ঘর সাজানো ঘর গুছোনো একটা নেশার মতন হয়ে গেছে। তেমনি রান্নার কাজ। চাকর আছে, একটা ঝি আছে। সব কাজে আমি লাগছি দেখে সময় সময় ও আমায় কথা শোনায়। তা শোনালে হবে কি, ঝি-চাকরের ওপর সব ফেলে রেখে আমি শান্তি পাই না—'

কথা শেষ করে ব্রততী একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল।

'এই সংসারটাকে আপনি অতিরিক্ত ভালবেসে ফেলেছেন আর কি।' সীতাংশু আগুনের দিকে চোখ রাখল।

'তাই তো মনে হয়।' স্বপ্নাবিষ্টের মতন ব্রততী একদিকে তাকিয়ে রইল। একটু থেমে থেকে পরে বলল, 'এখন মনে হয় ভালবেসে অপরাধ করে ফেলেছি।'

সীতাংশুর হৃৎপিণ্ড মোচড় দিয়ে উঠল। কথাটা আবার কোন্-দিকে মোড় ঘুরছে টের পেয়ে সে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। আবার বুঝি রণধীরের কথায় ফিরে এল তারা। কেন না, এই সংসার বলতে কি বন্ধুপত্নী শুধু তার দু'খানা ঘর বারান্দা বাগান ও উনুনটাকে

বোঝাতে চাইছে? তা তো নয়, সংসার মানে এর আলো বাতাস দিন রাত্রি খাওয়া ঘুম বিশ্রাম হাসি কান্না শব্দ গন্ধ—সব। তাই তো, ঐ যে রান্নাঘরের জানালার কাছে দেওয়ালের পেরেকে সুতোয় বাঁধা বেতের ঝুড়িটা ঝুলছে এটাও এই সংসারের মধ্যে ধরা হয় না কি!

একটু সময় চিন্তা করে সীতাংশু সতর্ক গলায়, যেন চোরাবালির ওপর পা রেখে সে হাঁটছে, আস্তে আস্তে বলল, 'ভালবাসতে গিয়ে আমরা সময় সময় দুঃখ পাই, ভালবাসার স্বভাব যা, এবং এই দুঃখটাই এক সময় বোঝার মতন হয়ে ওঠে, তখন মনে হয় ভালবাসতে যাওয়া আমার ঠিক হয় নি, ভালবেসে আমি অপরাধ করে ফেলেছি। ভুলও বটে।'

ব্রততী চুপ করে রইল।

রণধীরের মুখটা সীতাংশুর চোখের সামনে ভাসছিল। আড়চোখে বন্ধুপত্নীর চোখ দুটো দেখে নিয়ে সে বলল, 'অথচ ভাল না বেসে আমরা পারি না, খাওয়ার মতো ঘুমের মতো বিশ্রামের মতো ভালবাসাও আমাদের দরকার এবং এর মধ্যে যে যন্ত্রণা আছে দুঃখ আছে সেটুকু না পেলেও আমাদের মনে হবে, বেঁচে থাকার মধ্যে আনন্দ নেই, জীবনের ছন্দ গান সব শেষ হয়ে গিয়ে গাছ-পাথর হয়ে আমরা এক-একজন পৃথিবীতে বেঁচে আছি।'

ব্রততী খিলখিল করে হাসল। আমোদ পেয়ে একটি খুকি বুঝি এমন করে হাসে। সীতাংশু বিস্মিত হলো। সে আশঙ্কা করেছিল এখনই ব্রততী রণধীরের কথা তুলবে। ভালবেসে যন্ত্রণা পাওয়া এক কথা, কিন্তু যাকে ভালবাসব সে যদি সত্যি একটা গাছ-পাথরের সামিল হয়, যদি ভালবাসার মর্ম সে না বোঝে তো সেখানে সান্ত্বনা কোথায়। হুঁ, রণধীর কেবল ওষুধ চেনে অসুখ চেনে রুগী চেনে, একটু আগে সীতাংশু যা শুনছিল, আর কিছু সে চেনে না, চিনতে চায় না। ব্রততী আবার না ঘটা করে এখন সেসব বলতে আরম্ভ করে।

কিন্তু কোথায়, ডাক্তারগিন্নীর চোখেমুখে সেই চিহ্ন এখন নেই, সেই ক্ষোভ থমথমে অভিমানের মেঘ দীঘির মতো কালো চোখে নিবিড় ছায়া ফেলল না তো, বরং হাসির রোদ লেগে দীঘির জল ঝলমল করছিল।

স্তব্ধ হয়ে রইল সীতাংশু। কথা বলার আগে হঠাৎ ঢাকনাটা তুলে চামচ দিয়ে একটুকরো মাংস তুলে নাকের কাছে ধরল রূপসী। চোখ বুজে ঘ্রাণ নিল। সীতাংশু মুগ্ধ হয়ে দীর্ঘ পালক ঘেরা চোখের পাতা দু'টি দেখল। একটু সময় আর কোনো শব্দ ছিল না। কেবল কড়াইয়ের টগবগ শব্দটা দু'জনার কানে লাগছিল।

'আর একটু সেদ্ধ হবে।' কড়াই ঢেকে দিয়ে ব্রততী সীতাংশুর দিকে চোখ তুলল। দুই চোখে তখনও হাসি চিকচিক করছে। 'আপনি ভালবাসার এত সব জানলেন কি করে—ভালবাসার দুঃখ যন্ত্রণা?'

'কেন, আমি কি ভালবাসতে পারি না!' সীতাংশু অবাক হবার ভান করল।

'না, তা পারবেন না কেন, বনজঙ্গল ভালবাসেন, জঙ্গলের গাছপালা ভালবাসেন, ঝিঁঝির ডাক, আকাশের তারা, ঝোপ-ঝাড়ের ভেতরের জমাট অন্ধকার—শুনছি অনেক কিছুই আপনি ভালবাসেন।'

'মনে হয় আপনি আমাকে ঠাট্টা করছেন।' সীতাংশু একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল। 'জানেন, এই সতেরো দিন কেন আমি এখানে আসতে পারি নি?'

ব্রততী থমকে গেল। মুখের হাসি নিবিয়ে দিয়ে চোখ দু'টো বড় করল।

'কেন আসেন নি?'

'ঐ যে, একজনকে ভালবেসেছিলাম, এমন প্রেমে পড়েছিলাম যে পৃথিবীর আর কারো কথা ভাববার সময় ছিল না, আপনাকে রণধীরকে পর্যন্ত ভুলে গিয়েছিলাম।'

'সত্যি ?' মাথাটা সোজা করে ধরল ব্রততী। যেন শ্বাস ফেলতে ভুলে গেল। 'কে সে ?'

'আপনি শুনে হাসবেন।' রূপসীর পাতলা ছিমছাম পায়ের পাতার দিকে চোখ রেখে সীতাংশু নিজেও একটু হাসল।

'না না, হাসব কেন, কী মুস্কিল, আপনার ভালবাসা আপনার কাছে। এ জিনিস আর কেউ নিতেও পারবে না, দিতেও পারবে না। বা বলে-কয়ে কেউ কমাতে পারবে না, বাড়াতেও পারবে না। খামকা সঙ্কোচ করছেন।'

এবার সরাসরি বন্ধুপত্নীর চোখের দিকে তাকাল সে।

'যদি না হাসেন, যদি এই নিয়ে ঠাট্টা না করেন তো বলতে পারি।'

'ওফ্‌ এত ছেলেমানুষ আপনি!' চাঁদের ফালির মতন সরু মসৃণ ললাটে অসন্তোষের রেখা জাগল। 'আমার ঠাট্টাকে তো আপনার ভয় না, মনে হচ্ছে যেন আপনার মানুষটিকে পাছে কেড়ে নিই সেই ভয়ে জিনিসটা চেপে যেতে চাইছেন।'

একার সীতাংশু অল্প শব্দ করে হাসল। মাথাটা পিছনের দিকে বাঁকিয়ে দিয়ে রান্নাঘরের নিচু সিলিংটা একবার দেখল। তারপর সোজা হয়ে তাকাল। 'না না, তা ভাবব কেন, এতটা অবিচার আপনার ওপর করব কোন্‌ সাহসে! ছি—আসল কথা, আমি যাকে ভালবেসেছিলাম আপনার মতন সে যুবতী নারী নয়, কিশোরীও নয়, এমন কোনো যুবতী বা কিশোরীর দেখা পাইও নি, একটা খরগোসছানাকে ভালবেসেছিলাম, আমার হৃদয় কেড়ে নিয়েছিল সে।'

'এখন সে কোথায় ?'

'কাল মারা গেছে, একটা কাঠের টুকরো এসে গায়ে লেগেছিল।'

কতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল ব্রততী।

কড়াইয়ের টগবগ শব্দটা মজে গিয়েছিল।

'মনে হয় মাংস হয়ে গেছে।' বিড়বিড় করে বলল সীতাংশু। কথা না বলে ব্রততী উনুন থেকে কড়াইটা নামিয়ে রাখল।

'এবার পরটা ক'খানা ভেজে ফেলুন।' সীতাংশু আগু বাড়িয়ে কথা বলছিল।

ব্রততী শব্দ না করে হাসল।

'ও আস্থক, এখন ভেজে রাখলে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।' একটু চুপ থেকে সে আবার বলল, 'পরটা কেন, ঠাণ্ডা কোনো জিনিসই ও খেতে পারে না। অনেক সময় এটা-ওটা আমাকে রেঁধে রাখতে হয় সত্যি, ও এলে তখন আবার স্টোভ জ্বেলে সব গরম করে দিই।'

'কিন্তু এখনো রণধীর ফিরল না দেখছি,' ঘড়িটা চোখের সামনে তুলে ধরল সীতাংশু। 'প্রায় এক ঘণ্টা হতে চলল।'

'কি জানি, অসুখটা হয়তো খুবই বেড়ে গেছে ছেলেটার, হয়তো অবস্থা তেমন স্থবিধের নয়, ডাক্তারকে কতক্ষণ সেখানে থেকে যেতে হচ্ছে, হয়তো তেমন একটা জরুরী কেস্ ফেলে চলেই বা আসে কেমন করে।'

সীতাংশু হঠাৎ স্তম্ভিত হয়ে গেল ব্রততীকে দেখে। হু'টো কালো চোখ শঙ্কা সমবেদনা ধৈর্য সহিষ্ণুতা নিয়ে কেমন গাঢ় হয়ে উঠেছে। আর এই মুহূর্তে সীতাংশু ভাবছিল, রণধীরের ফিরতে দেরি হচ্ছে কথাটা তার মুখ থেকে বেরোনো মাত্র বন্ধুপত্নীর ভুরু কুঁচকে উঠবে, বিরক্তি ঔদাসীন্য হতাশা ক্ষোভ—কত কী হুই কোণে খেলা করে উঠবে। 'আমি তো জানি ও এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন—তার হলো রাক্ষসীর যাওয়া আর আসা, একটা কাণাকড়িও দাম নেই আপনার বন্ধুর কথার—' অনেক কিছু শোনবার জন্য সীতাংশু প্রায় তৈরি হয়েছিল।

কিন্তু তা তো নয়। তার পরিবর্তে সে সম্পূর্ণ অন্য চেহারা দেখছিল, অন্য স্থর শুনছিল। বলতে কি, ভিতরে ভিতরে ভয়ানক লজ্জা পেল সীতাংশু, অপ্রস্তুতও হয়ে গেল।

'খুবই সত্য কথা, রুগীর অবস্থা তেমন খারাপ দেখলে কোনো ডাক্তারই ছুট্ করে সেখান থেকে চলে আসতে পারে না।' দেওয়ালের দিকে চোখ ফিরিয়ে সীতাংশু আস্তে আস্তে বলল, 'টাইফয়েড রোগটাও খুব বিচ্ছিরি—'

'অবিশ্যি, আপনার দেরি হয়ে যাচ্ছে, ফিরতে অনেক রাত হয়ে যাবে—' ব্রততী এদিকে ঘাড় ফেরাল।

'আমার জন্য ভাববেন না।' সীতাংশুও ঘাড় সোজা করল। 'একটু কাজ ছিল, তা থেকেই যখন গেলাম রণধীর ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে—করব।'

'খরগোসের বাচ্চাটা শেষ পর্যন্ত মারা গেল!'

সীতাংশু চমকে উঠল। আবার এই প্রসঙ্গে ফিরে আসবে সে কল্পনাও করতে পারে নি। বিমূঢ় হয়ে গেল সে। ব্রততীর চোখ দু'টো ছলছল করছে।

'অনেক চেষ্টা করেছিলাম বাঁচাতে, জলটল দিলাম, বাতাস করলাম—' সীতাংশু বলতে আরম্ভ করেছিল, বাইরে একটা গাড়ির শব্দ হতে থেমে গেল।

'আপনার বন্ধু বোধ করি এবার ফিরল।' ব্রততী তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়াল।

সীতাংশুও মোড়া ছেড়ে উঠল।

'খরগোসবাচ্চার কথা রণধীরকে বলবেন না কিন্তু।'

'না, বলব না।' এক সেকেণ্ডের জন্য ব্রততী ঘুরে দাঁড়াল। 'সব ভালবাসাই ভালবাসা, এই নিয়ে কেউ হাসি ঠাট্টা করুক আমিও চাই না, আমারও খারাপ লাগবে।' বলে বিদ্যুদ্বেগে সে বারান্দার দিকে ছুটল।

সীতাংশু সেদিকে এগোতে লাগল। বন্ধুপত্নীর গলার স্বর তার কানে এল। 'তুমি এসেছ!' যেন ভয়ংকর একটা উচ্ছ্বাস আনন্দ নিয়ে ফেটে পড়ছিল যুবতী। যেন কতকাল পরে স্বামী বিদেশ থেকে

বাড়ি ফিরল, যেন অনেকদিনের হারিয়ে যাওয়া রত্ন আবার মহিলা ফিরে পেয়েছে।

তাই বলো! একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সীতাংশু।

আসলে দু'জনার প্রেমের তুলনা নেই।

অতিরিক্ত ভালবাসা অতিরিক্ত সুখ এই সংসারে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে বলেই রণধীরের স্ত্রী তখন ঘর নিয়ে ঘর সাজান নিয়ে এত কথা বলল। এই ঘর প্রতিনিয়ত সাজিয়ে গুছিয়ে রূপসীর আশ মিটছে না। আরো ভাল করে সাজাতে আরো সুন্দর করে গুছোতে তার প্রাণ ছটফট করছে। প্রতি মুহূর্তে রণধীর তার কাছে আত্মসমর্পণ করছে। তবু অতৃপ্তি থেকে যাচ্ছে, যেন আবো বেশি পেলে ভাল হয়।

তাই হয়। সীতাংশু চিন্তা করল। ভালবাসার শেষ নেই। এইজন্যই হয়তো এর যন্ত্রণা বেশি, দুঃখ বেশি। আর সেই যন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়ে বন্ধুপত্নী ক্ষণে ক্ষণে স্বামীর ওপর অভিমান করছে, চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত করছে।

রান্নাঘবের চৌকাঠ পার হয়ে সীতাংশু ভিতরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল। দু'জন পাশের ঘরে ঢুকেছে। কথাগুলি তার কানে এল। 'জামাকাপড় ছেড়ে হাত-মুখ ধুয়ে নাও।'

'তাই ধুচ্ছি।'

'ঠাণ্ডা লাগে নি তো।'

'না।'

'শরীর খারাপ, অথচ না বেরিয়ে উপায় নেই—এমন মন খারাপ লাগছিল আমার।'

'একটুতেই তুমি এমন মন খারাপ কর—'

'আহা, তুমি বুঝবে কী! এমন শরীর খারাপ নিয়ে যদি আমি বাইরে যেতাম তখন বোঝা যেত ঘরে বসে মশাই কি করতেন।'

'আমি তোমাকে তখন বেরোতেই দিতাম না।' রণধীরের উচ্চ হাসির শব্দ শোনা গেল।

'আর আমি সকালে কথাটা বলেছিলাম বলে তুমি তো ঝগড়াই শুরু করে দিলে।' গৃহিণীর সেই থমথমে অভিমানের গলা।

'না, আর করব না, তোমার গা ছুঁয়ে বলছি, আর কোনোদিন ঝগড়া করব না। কিন্তু কেসটা খারাপ বলে এবেলা না বেরিয়ে পারা গেল না।'

'সেজন্য আমিও তো এবেলা আর বারণ করলাম না।'

'জংলীটাকে তা হলে ধরে রাখতে পেরেছ।'

'কেন পারব না, তোমার বন্ধু, কাজেই ওঁর ওপর আমারও রাইট আছে।'

কথাটা শুনে সীতাংশু পুলকিত হয়ে উঠল।

রণধীরের জামাকাপড় ছাড়া হয়ে গেছে অনুমান করে সে আর বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকল না। ঘরে ঢুকল।

'এই যে জংলী এসে গেছে।' রণধীর চেঁচিয়ে উঠল। 'তা হলে চাঁদ, আজ ভাল মানুষের হাতেই আটকা পড়েছ, সকাল সকাল জঙ্গলে ফিরে যাওয়া হলো না।'

'না, তা হলো না।' সীতাংশু চোখ আড় করে ব্রততীকে দেখল। ঠোঁট টিপে হাসছে।

'কিন্তু তোর বেশ একটু দেরি হয়ে গেল না কি ফিরতে, আমি তোর গিন্নীকে তাই বলছিলাম—ডাক্তার হয়তো ম্যানেজারের ছেলেকে দেখে কুলি ব্যারাকের দিকেই চলে গেছে। আজ রাত্রে আর তার বাড়ি ফেরা হলো না।'

'তাই হয় কোনো কোনো দিন।' রণধীর তোয়ালে দিয়ে মুখ-হাত মুছতে লাগল। 'আজ অবিশ্যি সেদিকে যেতে হয় নি, ম্যানেজারের বাংলো থেকে বেরোতেই দেরি হয়ে গেল।'

'এখন কেমন আছে ছেলেটি?' সীতাংশু প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল।

ব্রততী তার আগেই বলে ফেলল, 'কেস্ খারাপ বোঝা যাচ্ছে, তা হলেও রাত্রে যদি আবার ডাকতে আসে, আমি কিছুতেই তোমাকে বেরোতে দেব না বলে রাখছি।'

'তুমি কোথায় চললে।' রণধীর হেসে ঘাড় ফেরাল। ব্রততী রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছিল।

'চট করে পরটা ক'খানা ভেজে আনছি, আমার সব হয়ে যাবে, তোমরা গল্প কর।' বলে সে পর্দার ওপারে অদৃশ্য হলো।

'এই জন্মে ডাক্তার হয়ে মস্ত ভুল করেছি সীতাংশু', একগাল হাসি নিয়ে রণধীর বন্ধুর দিকে তাকাল। 'পরজন্মে না খেতে পেয়ে মরলেও ডাক্তার হব না।'

সীতাংশুও হাসছিল।

'পরজন্মে আবার এমন একটি বৌ পাবি যে তার বিশ্বাস কি? পেলে অবিশ্যি ডাক্তার হতে তোকে কখনই পরামর্শ দেব না।'

রণধীর ঈষৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে ঘাড়টা একদিকে কাত করল।

'হুঁ, তাও বলেছিস ঠিক—এই জন্মে বেঁচে থেকে খুব একটা পুণ্যিটুন্যি করে না গেলে মরে গিয়ে আর এক জন্মে আবার একটি ব্রততীকে পাওয়া মুস্কিল হবে।'

সীতাংশু কথা বলল না। তার কপালের রগ দু'টো হঠাৎ দপদপ করে উঠল। ওদিক থেকে পরটা ভাজার একটা চমৎকার গন্ধ এদিকে ভেসে আসছিল। চাকর এসে টেবিল বিছিয়ে জলের গ্লাস রেখে গেল। একটু পর ব্রততী খাবার সরঞ্জাম নিয়ে ভিতরে ঢুকল।

সীতাংশু বলল, 'উঁহুঁ, আমরা দু'জন বসে খাব আর আপনি শুধু পরিবেশন করবেন, আজ এ-নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটুক।'

'কি করতে হবে তবে আমাকে?' ব্রততী হাসল।

রণধীর বলল, 'তুমিও একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বস। তিনজন একসঙ্গে খাব।'

ব্রততী আপত্তি করল না।

খেতে বসে একফাঁকে রণধীরের কাছে সে কথাটা তুলল। 'শোন, আমি কিন্তু একদিন টিয়াটুলির জঙ্গল দেখতে যাব। কবে আমায় নিয়ে যাবে বলো।'

'যেদিন খুশি।' রণধীর সীতাংশুর দিকে চোখ তুলল, 'জংলীটা আমাদের সেখানে গেলে কি খেতে দেবে আগেই জিজ্ঞেস করে জেনে নাও।'

'তার জন্য ভাবনা কি।' সীতাংশু ব্রততীর দিকে চোখ ঘুরিয়ে হাসল। 'কচুর ঘণ্ট, কচুর শাক, শুকনো মাছ—বন্ধু ও বন্ধুপত্নীকে যথোচিত আপ্যায়ন করার কোনো ত্রুটি হবে না আমার দিক থেকে, এটুকু জেনে রাখুন।'

তার কথা বলার ভঙ্গি দেখে রণধীর ও ব্রততী একসঙ্গে হেসে উঠল।

খাওয়া-দাওয়ার পর সীতাংশু আর অপেক্ষা করল না। ডাক্তারের কুঠি থেকে বেরিয়ে যখন রাস্তায় নামল তখন তার ঘড়িতে দশটা বেজে আছে।

আকাশের দিকে চোখ তুলতে সে দেখতে পেল মাথাভাঙা হলুদ চাঁদটা মাথার ওপর উঠে গেছে। রূপালী রং ধরে এখন চমৎকার চেহারা ধরেছে। তখন ব্রততীদের জানালা দিয়ে দেবদারু গাছের ফাঁকে চাঁদটাকে কত রুগ্ন ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। সেই অসুস্থ চেহারা এখন আর নেই। যেন অসুখবিসুখ সেরে গিয়ে হাওয়া খেতে বেড়াতে বেরিয়েছে, নতুন জীবন ফিরে পেয়ে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে ফিকফিক করে হাসছে।

বস্তুত হ্যাবা রুগীর চেহারা নিয়ে সন্ধ্যাবেলা চাঁদটা যখন দেবদারু গাছের পিছন দিয়ে উঁকি দিয়েছিল তখন রণধীরের বৈঠকখানায় বসে সীতাংশু সতেজ প্রফুল্ল একটি মুখের দিকে তাকিয়ে পৃথিবীর যাবতীয় রোগশোকের কথা ভুলে গিয়েছিল। তার তখন মনেই হয় নি, এই

জগতে অসুখবিসুখ বলে কিছু আছে। অথচ একটু পরেই ম্যানেজারের বাড়িতে রণধীরের ডাক পড়েছিল। ম্যানেজারের ছেলের টাইফয়েড হয়েছে, গাড়ি নিয়ে আর্দালি ছুটে এসেছে, ডাক্তারবাবুকে এখনি যেতে হবে। আশ্চর্য, তখনও, এত বড় একটা অসুখের খবর শুনেও কিন্তু সীতাংশু মানুষের রোগ নিয়ে স্বাস্থ্য নিয়ে একফোঁটা মাথা ঘামায় নি। সে শুধু চিন্তা করছিল ব্রততী তার ডাক্তার স্বামীকে কতখানি ভালবাসে এবং ডাক্তার তার স্ত্রীকে কতটা স্নেহের চোখে মমতার চোখে দেখে।

আগে সে এতটা চিন্তা করে নি। কতদিন সেখানে গিয়েছে, দু'জনকে কতবার দেখেছে। তারপর এই সতেরো দিন সে রাণীরবাগ যায় নি। আর সেখানে যাবে না মনে মনে সে প্রতিজ্ঞাও করেছিল। কিন্তু হঠাৎ আজ আবার তাকে যেতেও হলো। প্রতিজ্ঞার কথাটা মনে ছিল ঠিকই। কিন্তু ডাক্তারের ঘরে পা দিয়ে সে অন্য নাটক দেখল। ব্রততীর চোখে জল, মনে অভিমান, ডাক্তারের অসহায় চেহারা, ব্রততী স্বামীকে সামাল দিতে পারছে না, ভয়ানক জেদী একরোখা মানুষ সে, ঘরের দিকে তার মন নেই, বাইরের মানুষের উপকার করতে তাদের রোগ সারাতে নাওয়া-খাওয়া ভুলে অহর্নিশি বাইরে বাইরে ঘুরছে—অনেক কিছু সীতাংশু শুনল, দেখল, কেমন হেঁয়ালির মতন ঠেকছিল সবটা তার কাছে।

তারপর অবশ্য তার হেঁয়ালি ভাঙল। রান্নাঘরে বসে বন্ধুপত্নীকে দেখল, তার কথা শুনল।

সেই যাকে বলে প্রগাঢ় সুখে দু'জন আকণ্ঠ ডুবে আছে। তাদের দাম্পত্য প্রেমের পরিমাপ করবে এমন সাধ্য সীতাংশুর নেই। ছিল না। বলতে কি, ম্যানেজারের বাংলো থেকে ডাক্তারের ফিরে আসার পর, যখন সে জামাকাপড় ছাড়ছিল, কি যখন তিনজন একত্রে খেতে বসল, তাদের স্বামী-স্ত্রীর কথাবার্তা শুনে, দু'জনের চেহারা দেখে সীতাংশুর লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছা করছিল। কেননা, একটু

আগে, অন্তত এক সেকেণ্ডের জন্য হলেও, সীতাংশুর মনে হয়েছিল, কি জানি হয়তো ভিতরে ভিতরে এই দুটি মানুষ সুখী নয়, হয়তো কোথাও একটা ফাটল আছে, বাইরে থেকে দেখা যায় না, তৃতীয় ব্যক্তি বুঝবে না, কিন্তু সেই ফাটল দিয়ে ক্রমাগত একটা বিষাক্ত কিছু ধোঁয়ার আকারে নির্গত হচ্ছে, একদিন বিস্ফোরণ ঘটবে, তারপর দুটি জীবন ছিন্নভিন্ন হয়ে কোথায় ছিটকে পড়বে কেউ বলতে পারবে না।

না, সীতাংশু কানমলা খেয়েছে তাদের দাম্পত্য প্রেমের বহর দেখে। তখন যেন এক-একটা মিনিট এক-একটা ঘণ্টার মতন দীর্ঘ ক্লান্তিকর মনে হচ্ছিল তার কাছে, কতক্ষণে সেখান থেকে সে বেরিয়ে পড়বে।

ভাল করে খেতে পারে নি, সব কিছু কেমন বিস্বাদ ঠেকছিল। আর সেই মুহূর্তে তার এমন জোরালো প্রতিজ্ঞাটা চুরমার হয়ে গেল। কপালের রগ দপদপ করতে লাগল। ঈর্ষার জ্বলুনি রক্তের কোষে কোষে ছড়িয়ে পড়তে সেই দুর্নিবার লোভ ভয়ঙ্কর সর্বনাশা নেশাটাও আবার তাকে পেয়ে বসল।

এখন খোলা হাওয়ায় উন্মুক্ত আকাশের নিচে এসে সে স্বস্তিবোধ করছিল। রাণীরবাগের চৌহদ্দি পার না হওয়া পর্যন্ত দ্রুত পায়ে সে হাঁটছিল। যেন ভয়ঙ্কর কিছু একটা তাকে তাড়া করছিল। তাই একরকম ছুটতে ছুটতে সেদিনের সেই গাছটার নিচে এসে সে দাঁড়াল।

সেদিন এই গাছতলায় বসেই সে ঠিক করে ফেলেছিল, এখানে কিছুতেই থাকবে না সে, কাঠের ব্যবসা গুটিয়ে ফেলে কলকাতা চলে যাবে।

আজ আর সে-সব কথা সে ভাবল না।

অন্য একটা চিন্তা তার মাথার ভেতরটা ঘুণপোকার মতন কুরে কুরে খাচ্ছিল।

অতিরিক্ত সুখ পাবার পরেও যদি আরো কিছু পেতে চায় তো রণধীর কি তার সেই দাবি মেটাতে পারবে?

রান্নাঘরের ছবিটা মনে পড়ল সীতাংশুর। উনুনে টগবগ করে মাংস ফুটছে। কড়াইয়ের ওপর ঢাকনা চড়িয়ে রূপসী ভালবাসার অপরাধের কথা বলছে। সেই মুহূর্তে কথাটা তার মাথায় ঢোকে নি, পরে সব বুঝেছে।

ভালবাসার একটা সমুদ্র বুকে নিয়ে রণধীরের স্ত্রী রাণীরবাগের সেই ঘরে বসে আছে। বাইরে যেতে তার ইচ্ছা করে না। কেবল ঘর গুছোচ্ছে ঘর সাজাচ্ছে, ঝি-চাকরকে সরিয়ে দিয়ে নিজের হাতে রান্না করছে, আর এসব করার পর যদি হাতে সময় থাকে, তখন গোলাপবাগানে গিয়ে প্রাণভরে গোলাপের গন্ধ শুঁকছে।

এবং এটাও সত্য, সীতাংশু যা চোখে দেখে এসেছে, ব্রততীর সেই ভালবাসার সমুদ্রে রণধীর হাবুডুবু খাচ্ছে, নাকানি-চোবানি খাচ্ছে বললে কথাটা সুন্দর হয়, ব্রততী তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে, জিনিসটা উপভোগ করছে। তারপরও সে আবার ভালবাসার অতৃপ্তির হাই তুলছে। আরো ভাল করে সংসার সাজাতে চায়, আরো সুন্দর করে যদি ঘর গুছোতে পারত।

তাই খরগোসের বাচ্চাকে সীতাংশু ভালবেসে ফেলেছিল শুনে মহিলা চমকে উঠল না। হাসল না। ঠাট্টা করল না। কেননা, সব ভালবাসাই তার মনে ঝঙ্কার তোলে। অথবা তার হৃদয়সমুদ্রে ঢেউ তোলে। ভালবাসার নেশায় যুবতী বুঁদ হয়ে আছে।

কান দুটো গরম হয়ে উঠল সীতাংশুর।

তবে আর এমন করে দেখা কেন, এতে অপরাধের বোঝা বাড়ে। অন্তর্জ্বালা আরম্ভ হয়।

তখন কাউকে আর ভয় থাকবে না তার।

বিবেকের পুলিশও সেলাম ঠুকে তাকে পথ ছেড়ে দেবে।

•

টিয়াটুলির জঙ্গলের কাছাকাছি এসে তার ভিতরটা শান্ত হলো। এতটা পথ কেমন করে যে সে হেঁটে এসেছে। তার মনে হচ্ছিল

তখন, একটা ফার্নেসের ভিতর থেকে ছাড়া পেয়ে বুঝি সে ক্রমাগত ছুটতে আরম্ভ করেছিল। ঘনঘন নিশ্বাস পড়ছিল। আর তার কেবল ভয় হচ্ছিল পাশের খাদের ভিতর না পড়ে যায়। তবু তাকে ছুটতে হয়েছে।

এখন সেসব ভয় কেটে গেল। শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এল। বনের গাছপাতার গন্ধ নাকে লাগতে শরীর মন জুড়িয়ে গেল।

ইচ্ছা করে আর একবার সে দাঁড়াল। কুঁচলতার জঙ্গল পথের ওপর এসে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। একটা ঝোপের ভিতর হাত ঢুকিয়ে পাতার শীতল স্পর্শ অনুভব করল। হাতে শিশির লাগল। তার মনে পড়ল, কার্তিক শেষ হয়ে অগ্রহায়ণ মাস আরম্ভ হয়েছে। মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাত দিয়ে কুঁচের ঝোপটা জোরে নেড়ে দিল। টপটপ করে শিশির ঝরে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে তার হৃৎপিণ্ড মোচড় দিয়ে উঠল। শীতের রাত্রের শিশির সে কত ভালবাসে, কতদিন পাতার গা থেকে ঘাসের মাথা থেকে হাতের তেলো দিয়ে শিশির তুলে সে কপালে মুখে মেখেছে। একটা পবিত্র ভাব মনে এসে যায় তখন।

এখন আবার তার পবিত্র হয়ে ওঠার লোভটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। ঝোপটা ধরে আর একবার সে জোরে নাড়া দিল। ঝরঝর করে শিশির ঝরে পড়ল। কান পেতে আশ্চর্য শব্দটাও শুনল। তখন সন্ধ্যাবেলা; রাণীরবাগের সেই সাজান ঘরে এমন ঝরঝর করে এক জোড়া কালো চোখ থেকে খানিকটা জল ঝরে পড়েছিল না? অভিমানের অশ্রু, সুখের কান্না!

সেই কান্না দেখে শীতের রাত্রের পাতাঝরা শিশিরের কথা তার মনে পড়ত, কিন্তু পড়েনি। কেন যে পড়েনি এখন কারণটা বুঝল।

এই শিশিরের মতন সেই অশ্রু শীতল নয়, তার স্পর্শ সুখকর নয়। উষ্ণ আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য এবং প্রচণ্ড ভালবাসার তাপ লেগে অমন

সরসীর মতন কালো চোখের অশ্রুও উত্তপ্ত হয়ে আছে। যেন দু' ফোঁটা জল হাতে লাগলে সীতাংশুর হাত পুড়ে যেত।

তাই তো হবে। ঠোঁট বেঁকিয়ে সে হাসল।

যার বুকের ভিতর এত বড় একটা ভালবাসার সমুদ্র টগবগ করে ফুটছে তার চোখের জল কখনও ঠাণ্ডা হতে পারে!

কিন্তু এটাও তো সত্য কথা, সেদিনের মত মাথার ওপর প্রকাণ্ড ছাতিম গাছের ডালে একটা রাতজাগা পাখির ডানার ঝাপটা শুনে সেদিকে একবার চোখ তুলে গাছের ডালটা একবার দেখে নিয়ে আবার সে হাঁটতে লাগল। অতিরিক্ত তাপ লেগে জল এক সময় বাষ্প হয়ে উড়ে যায়, জলের পাত্রটা তখন শুকিয়ে খটখটে হয়ে ওঠে। কাজেই একদিন যে রণধীরের রূপসী স্ত্রীর চোখের জলও শুকিয়ে যাবে না, হলপ করে তা কে বলতে পারে! এত বড় একটা সত্য বেমালুম অস্বীকার করার মুস্কিল আছে না?

সীতাংশু থমকে দাঁড়াল। একটা থুপ থুপ শব্দ তার কানে এল। বাঁ দিকে চোখ পড়তে তার মনে হলো ঝোপটা যেন নড়ছে। ওদিক থেকেই শব্দটা আসছে। যেন কুড়াল দিয়ে কেউ কিছু কাটছে। এটা অবশ্য সীতাংশুর টিম্বার রেঞ্জের মধ্যে পড়ে না। তা হলে অন্য ব্যাপার হতো, শব্দ শুনে এখনি লাঠি টর্চলাইট নিয়ে তার দারোয়ান ছুটে আসত। এবং বিনা অনুমতিতেই জঙ্গলে ঢুকে কেউ কাঠ কাটছে দেখলে তাকে ধরে হিড়হিড় করে সীতাংশুর সামনে টেনে নিয়ে আসত। তারপর সীতাংশু যা দণ্ড দেবার দিত। দণ্ড আর কি, বে-আইনী কাজ করছে বলে একটু ধমকটমক দিয়ে এবং ভবিষ্যতে যাতে এমন কাজ না করে তা হলে অধিকতর কড়া শাস্তি পেতে হবে বলে সতর্ক করে মানুষটাকে বিদায় করত। প্রায়ই এমন ঘটনা ঘটে। আশপাশের গাঁয়ের গরিব চাষী মজুরেরা জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে সময় সময় জঙ্গলে ঢুকে পড়ে এবং সুযোগ পেলে দরকারী এক-আধটা গাছ পর্যন্ত কেটে নামিয়ে ফেলে।

এখনও সীতাংশু সেরকম কিছুই সন্দেহ করে দাঁড়িয়ে পড়ল। এই বন অবশ্য তার জমিদারীর মধ্যে পড়ে না। তা হলেও এত রাত্রে একটা মানুষ কাদের কাঠ কেটে নিয়ে যাচ্ছে—জিনিসটা তার ভাল লাগল না।

'কে ওখানে?' হাতের টর্চটা টিপে ধরে চেঁচিয়ে উঠল সে। শব্দটা তৎক্ষণাৎ বন্ধ হলো।

কাজেই তার সন্দেহ আরও দৃঢ়মূল হলো। নিশ্চয়ই চুরি করে কেউ দরকারি গাছটাছ কেটে নিয়ে যাচ্ছে।

'ওখানে কে কাঠ কাটছে!' আবার সে চিৎকার করে উঠল, ঝোপ ঠেলে দু'পা অগ্রসর হবারও চেষ্টা করল। গায়ে কাঁটা লাগাতে আর এগোতে সাহস পেল না। ঠিক রাস্তা খুঁজে বার করতে না পারলে ভিতরে ঢোকার অসুবিধা আছে সে জানত।

টর্চটা জ্বেলে রেখে মিনিট দুই দাঁড়িয়ে অপেক্ষাও করল। তারপর, চোরটা ভয় পেয়ে পালিয়ে গেছে অনুমান করে সে হাঁটতে আরম্ভ করল। কিন্তু কয়েক পা এগোবার পর আবার তাকে দাঁড়াতে হলো। সম্ভবত ওপাশ দিয়ে ঘুরে একটা মানুষ তার সামনে এসে দাঁড়াল। জ্যোৎস্না ছিল। তা হলেও গাছের জন্য জায়গাটা অন্ধকার হয়ে আছে বলে মুখটা হঠাৎ চিনতে পারল না সীতাংশু।

'কে!' বিজলী বাতিটা আবার জ্বালল সে।

'আমি মুরারি।'

সীতাংশু দেখল মুরারিই বটে। তার করাতী। এক হাতে কোদাল শাবল আর এক হাতে এত বড় একটা ওল। এখনো মাটিটাটি লেগে আছে, যেন এইমাত্র মাটি খুঁড়ে ওলটা তুলে আনা হয়েছে।

ব্যাপারটা বুঝে নিতে সীতাংশুর এক সেকেণ্ডও লাগল না।

'এত রাত্রে তুই এখানে?'

'হুঁ বাবু, এটা তুলে আনলাম।' জঙ্গলের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে মুরারিও হাসল। 'হু, রাত একটু বেশিই হয়ে গেল বাবু, তা করি কি এখন, পেট তো মানে না।'

কথাটা মিথ্যা কি। দিনকাল খারাপ যাচ্ছে!

দিন দিন জিনিসপত্রের দাম হুহু করে কেবল বাড়ছেই, করাতী কাঠুরিয়ারা যা মজুরী পায় তাতে তাদের দিন প্রায় চলে না। পুষ্যির সংখ্যা বেশি থাকলে তো কথাই নেই। তেমনি কুলিমজুরদের অবস্থা। এখানে ওখানে সর্বত্র। একবেলা যদি ভাত রুটি কষ্টেস্থষ্টে চালাতে পারছে, আর একবেলা যেন চলছে না। অনেকেই শাকপাতা সিদ্ধ কচুটচু চালাচ্ছে। সীতাংশুর কারখানায় যারা খেটে খায় তাদের অবস্থা আজই ঠিক ততটা খারাপ হয় নি বলে তার ধারণা ছিল।

মুরারির কথা শুনে গম্ভীর হয়ে সে হাঁটতে লাগল।

মুরারিও সঙ্গে হাঁটছিল। মুরারির ডেরা পিছনে পড়ে রইল।

'তুই কোথায় চললি?'

'বাবুকে একটু এগিয়ে দি।'

দু'বার কেশে নিয়ে গলাটা পরিষ্কার করল মুরারি। 'বাবুর ফিরতে রাত হয়ে গেল।'

'হুঁ, তা একটু হলো।' সীতাংশু সংক্ষেপে উত্তর করল। সে যে রাণীরবাগ বেড়াতে গিয়েছিল মুরারি জানত। একমাত্র মুরারিই তার কাছাকাছি থাকে—অন্য করাতীরা আরো দূরে থাকে। তিন-চার মাইল দূরে থাকে এমন করাতী কাঠুরিয়ারাও মুরারির সঙ্গে কারখানায় কাজ করতে আসে। কুলিমজুরেরা অবশ্য আর একটু কাছের একটা বস্তিতে থাকে, তা-ও এখান থেকে দেড় দু' মাইল রাস্তার কম না। মুরারিই সীতাংশুর নিকটতম প্রতিবেশী। ষাটের কাছে বয়স হয়েছে। তা হলেও বেশ খাটতে পারে। কাজকর্মও বোঝে ভাল। তা ছাড়া মানুষটা সরল। ভিতরে ঘোরপ্যাঁচ

একেবারে নেই। কয়েকটা কারণেই বুড়োকে সীতাংশুর খুব পছন্দ হয়। এই বুড়োর ছেলে মাধবই সীতাংশুকে খরগোসের বাচ্চাটা উপহার দিয়েছিল।

'তা তোর তো পুষ্যি খুব বেশি নেই।' যেন সেই কথাটাই চিন্তা করছিল সীতাংশু। 'তুই, তোর বৌ আর ঐ একটি তো ছেলে। তেমন একটা টানাটানি যাবার তো কথা নয়।'

কথা বলার আগে মুরারি ঘাড় বেঁকিয়ে একদলা থুথু ফেলল। তারপর গলায় একটা শব্দ করে হাসল কি কাশল ঠিক বোঝা গেল না। তবু সীতাংশুর মনে হলো বুড়ো যেন গলার নিচে একটু হাসল। দুঃখী মানুষ যেমন করে হাসে। তারপর একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল।

'কি হলো!' সীতাংশু আড়চোখে তার দিকে তাকাল। জায়গাটা পরিষ্কার। মাথার ওপর তেমন গাছপালা নেই। স্বচ্ছ জ্যোৎস্নায় মুরারির নাক ও থুতনির রেখাটা এবার স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। এককালে মানুষটা বেশ জোয়ান জবরদস্ত ছিল বোঝা যায়। কাঠামোটা এখনো কত বড়।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল সে। যেন একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বাবুকে বলার আছে। কোদাল শাবল সমেত ডান হাতটা একটু তুলে ধরে নিজের কপাল দেখাবার ভঙ্গি করল মুরারি।

'বাবু, এখানটায় যদি দুঃখু লেখা থাকে কে আমায় সুখ দেবে বলুন।'

সীতাংশু দাঁড়িয়ে থেকে চুপ করে রইল। মুরারি ঘাড় কাত করে বলল, 'হুঁ, পুষ্যি তো কমেই গিয়েছিল, আবার এখন কাঁধের বোঝাটা বাড়ল।'

'কেন?' সীতাংশু চমকে উঠল।

'সুখী চলে এসেছে।'

'সে কি, ওর না বিয়ে হয়েছিল!'

সীতাংশু একটা ঢোক গিলল। সুখী মুরারির মেয়ের নাম। একদিন মুরারির মুখেই সে শুনেছিল। দু' বছর আগে মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। আর তার এখন ভাবনা নেই। জামাইয়ের কাছে মেয়েটা সুখেই আছে। মাধবের মুখেও তার দিদির গল্প শুনেছে সীতাংশু। 'হঠাৎ মেয়ে চলে এল কেন!' বিড়বিড় করে উঠল সে।

'আমার কপাল বাবু—আমি কি জানতাম ছোটলোকের ছেলের চরিত্তির দোষ আছে। এখন শুনছি আসানসোলে একটা মেয়েমানুষ রেখেছে হারামজাদা।'

সুখীর বর আসানসোলে কি একটা কারখানায় চাকরি করে, সীতাংশু শুনেছিল।

'তারপর?' খুবই খারাপ লাগল তার এখন কথাটা শুনে। 'কবে এসেছে তোর সুখী?'

'বিকেলের টেরেনে।'

'একলা এসেছে?'

'হুঁ, একলাই চলে এসেছে, বাচ্চাটাকেও সঙ্গে নিয়ে এসেছে।'

সীতাংশু চুপ করে রইল; সুখীর একটা বাচ্চা হয়েছে সীতাংশু কিন্তু জানত না।

মুরারি আর একদলা থুথু ফেলে সীতাংশুর চোখের দিকে তাকাল। 'তার কথা কি আর বলা যায় মানুষকে, বাবুকেও কথাটা বলি নি। বুকের দুঃখুটা বুকে চেপে বসেছিলাম। বিয়ের ছ'মাস পরেই কথাটা কানে এয়েছিল। লোকটার স্বভাব-চরিত্তির সুবিধের নয়। ভাবলাম তখন, কলকারখানার মানুষ, শহরে-বন্দরে থাকে—তাই একটু মতিগতি চঞ্চল ছিল, এখন বিয়ে করেছে, সুন্দরী বৌ পেয়েছে, স্বভাবটা শুধরে যাবে—গেল না। একটা বছর ধরে শুনছিলাম সুখীকে মারধোর করে, নেশাভাং করে কোনোদিন ঘরে ফেরে, কোনোদিন ফেরে না, খাওয়া-পরায় আমার মেয়েকে কষ্ট দেয়। দুটো বছরের মধ্যে মেয়েটাকে আমি একদিনের জন্য আমার কাছে

আনতে পারি নি। লোক পাঠিয়েছি, নিজে গেছি। বলে, কাজকর্মের অসুবিধা আছে; আর কাজকর্ম কি, মেয়েটাকে উপোষ রেখে হারামজাদা কেবল খাটিয়ে মারে আর মারধর করে।' এই পর্যন্ত বলে মুরারি বাঁ কাঁধটা তুলে চোখ মুছল। হাত জোড়া, তাই কাঁধ দিয়ে চোখ মুছল।

ঠিক এই মুহূর্তে মানুষটাকে কি বলে সান্ত্বনা দেবে সীতাংশু বুঝতে পারছিল না। চুপ করে রইল।

'তা আজ নিজের চোখে দেখলাম। এসেই মেয়ে পিঠের কাপড়টা তুলে দেখাল। বাবু, আপনি যদি একবার দেখেন, চোখের জল রাখতে পারবেন না, অমন সাদা ধবধবে চামড়া আমার সুখীর। কিন্তু পিঠটা নেই—সারা পিঠে মরা সাপের মতন কালো কালো দাগ, সব মারের চিহ্ন, কত মারই না খেয়েছে ছোটলোকের সন্তানের হাতে আমার মেয়ে, এখন বুঝি।'

দুঃখের কথা, তা হলেও এত রাত্রে জঙ্গলের কাছে দাঁড়িয়ে সব শুনতে আর ধৈর্য রাখতে পারছিল না সীতাংশু। হাঁটবার জন্য একবার পা বাড়িয়েও নিরস্ত হলো।

'তা হলে এখন কী করবি ঠিক করেছিস, মেয়ে তোর কাছেই থাকবে ?'

মুরারি বড় করে ঘাড় কাত করল।

'এখানেই থাকবে। শাকপাতা খাই কচুসেদ্ধ খাই, আর আমি ওকে শয়তানটার কাছে পাঠাব না। সুখীর মা মেয়ের পিঠে হাত রেখে কী কান্নাটাই কাঁদল তখন, দেখলে আপনার বুক ফেটে যেত—'

মুরারি আবার বাঁ কাঁধটা তুলে চোখ মুছল। সীতাংশু চুপ থেকে বন-প্রান্তরের ওপর লুটিয়ে-পড়া অফুরন্ত জ্যোৎস্নার খেলা দেখতে লাগল। কী একটা পোকা কোনদিকে পাতার আড়ালে থেকে রী রী শব্দ করছিল। সীতাংশুর এবার শীত করছিল।

'এখন আপনিই না হয় একটা সুপরামর্শ দিন বাবু, মেয়ে নিয়ে আমি যে এখন কী বিপদে পড়ে গেছি—'

'আচ্ছা সে দেখা যাবে, এই তো তোর মুখে সব শুনলাম, এবার বাড়ি যা, দু'বার এতটা পথ হেঁটে আমারও খুব পরিশ্রম হয়েছে—কাল ভোর না হতে আবার হালদারপাড়া থেকে করাতীরা আসবে।'

'হু, লক্ষ্মণ আসবে ইয়াসীন আসবে, সকালেই তো কথাবার্তা হয়ে আছে বাবু।' যেন বাবুর গলায় একটু বিরক্তি একটু অধৈর্যের গন্ধ পেয়ে মুরারি খুবই লজ্জা পেল। 'যান বাবু, খাওয়া-দাওয়া করে শুয়ে পড়ুন। বাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তাই খবরটা বলে রাখলাম। হুঁ, সুখীর মা বলছিল, বাবুর সঙ্গে পরামর্শ কর, বাবু একটা সুবুদ্ধি দেবেন। বাড়তি দুটো মুখের খাদ্য যোগান তো চাট্টিখানি কথা না। চলি বাবু।'

মুরারি আর দাঁড়াল না। কচু ও কোদাল-শাবল হাতে ঘরের দিকে ফিরে চলল।

তেমনি একভাবে দাঁড়িয়ে থেকে বুড়ো মানুষটাকে একটু সময় দেখল সীতাংশু। তার খুব খারাপ লাগছিল। হুট করে এভাবে কড়া করে কথাটা না বললেই কি চলছিল না! কতটা পথ যেত বুড়ো তার সঙ্গে। রাস্তা শেষ হয়ে গেছে, ঐ তো তার কারখানার চাল দেখা যাচ্ছে, কারখানার পিছনে তার ঘর। ঘরের পিছনে প্রকাণ্ড ঝাউগাছের মাথায় চাঁদের আলো ভেঙে পড়েছে। রাণীরবাগের সেই সোহাগিনী গিন্নীর মতন চাঁদ হাসছে।

'অথচ পৃথিবীতে কত দুঃখ-কষ্ট ছড়িয়ে আছে।'

এই যেমন মুরারির আছে, তার মেয়ে সুখীর দুর্ভাগ্য। না, সীতাংশু দুঃখী নয়। নিজের কথা সে মোটেই চিন্তা করে না, গ্রাহ্য করে না। জঙ্গলের ডেরায় একলা একটা খাটিয়ায় শুয়ে তার রাত কাটে, নিজের হাতে সে রেঁধে খায়। আরো অনেকরকম কষ্ট সে

সহ্য করে। এই সংসারে কিছু কিছু মানুষ সুখে আছে বলে দুঃখটা ভোগ করতে তার ভালই লাগে।

কিন্তু এখন সুখী মানুষদের কথা চিন্তা করে তার রাগ হলো। মুরারি ও তার মেয়ের দুর্দশার কথা ভেবে চাঁদের হাসিটা তার খারাপ লাগছিল।

এইহাসির সঙ্গে রাণীরবাগের এক রূপসীর হাসির এত মিল থাকবে কেন ভেবে সে ঠিক করতে পারছিল না। তার রাগ সেখানে।

গলা মোমের ওপর সলতেটা ভাসছিল। ভেসে ভেসে জ্বলছিল। হৃৎপিণ্ড ধুক-ধুক করার মতন বাতির শিখা হাওয়া লেগে কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

অপলক চোখে তাকিয়ে দেখছিল ছোট ছেলেটি। যেন মোমের শিখার চেয়েও তার বুকটা কাঁপছিল বেশি।

দমকা হাওয়া উঠলে তার শ্বাস-প্রশ্বাস থেমে যাচ্ছে। আব বুঝি বাতিটাকে বাঁচানো গেল না। হুস করে নিভে যাবে।

কিন্তু তবুও নেভে না। টলটলে মোমের জলে কাত হয়ে শিখাটা ডুবে যেতে যেতেও আবার ভেসে উঠে। তখন ছেলেটির চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ভাল করে নিশ্বাস ফেলতে পারে।

গাছতলাটা অন্ধকার। মোমের হলদে আলো আর একটি সুন্দর মুখে এসে পড়েছে।

কিন্তু ছেলেটির মতন মেয়েটি যেন এতটা নিবিষ্টচিত্ত হয়ে বাতির শিখার দিকে তাকিয়ে থাকতে পারছিল না। গাছগুল্ম ঘাস-লতার ওপর চাঁদের আলো চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে। পাতা থেকে পাতার ওপর টপটপ শিশির ঝরছে।

মেয়েটি—যুবতী বলাই ভাল, কান পেতে শিশিরের শব্দ শুনছে

টলটলে জ্যোৎস্নার খেলা দেখছে। কিন্তু তেমন করে যেন দেখছে না, শুনছে না কিছু।

ফোটা ফুলের মতন মুখখানা। তা হলেও কেউ যদি একটু সূক্ষ্ম চোখে তাকায় তো দেখতে পাবে যুবতীর চোখের কোলে নিবিড় অন্ধকার লেগে আছে। যেন একটা দুঃখের রাত্রি জমাট বেঁধে আছে সেখানে। চাঁদের আলো মোমের আলো সেখানে পৌঁছতে পারছে না।

'এই দিদি, নিবে গেল!'

যুবতী চমকে উঠল। ঘাড় ফেরাল।

'আর ক'টা আছে?' ছোট ভাইয়ের কাঁধের ওপর হাত রাখল সে। মোমের প্যাকেটটা কোলের কাছে রেখেছিল ছেলেটি। মোড়কের ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিল। তারপর দিদির দিকে চোখ ফেরাল।

'আর মোটে দুটো আছে।'

'ইস্ কত রাত করে ফেলল তোর বাবু। চারটে মোম শেষ হয়ে গেল!'

ছেলেটি হঠাৎ কথা বলল না।

'কখন ফিরবে তোর বাবু?'

'সেই তো সন্ধ্যেবেলা ফেরার কথা।'

'এখন রাত ক'টা হবে?' যুবতী আকাশের দিকে চোখ তুলল। যেন শ্বাস টেনে বাতাসের গন্ধ অনুভব করে রাতের গভীরতা অনুমান করতে চেষ্টা করল। 'এগারোটা বারোটা হবে এখন।' একটু চুপ থেকে যুবতী আবার বলল, 'আমার মনে হয় তোর বাবু আজ আর ফিরবে না।'

ছেলেটি কেমন ভয় পেল। গাছতলাটা অন্ধকার না থাকলে দেখা যেত তার চোখে গভীর হতাশা ফুটে উঠেছে। ফুটফুটে মুখখানা ব্যথার স্পর্শ লেগে থমথম করছে।

'কোথায় গেছে তোর বাবু বললি তখন?'

'রাণীরবাগ।'

'কে আছে ওখানে ?'

'বাবুর বন্ধু ডাক্তারবাবু।'

যুবতী ঘাড় ফিরিয়ে পেছনের টালির ঘরটা দেখল। কি একটু ভাবল নিজের মনে।

'তোর বাবু এই ঘরে থাকে ?'

'হুঁ, আর আর ঐ যে ওখানে—' ছেলেটিও ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে তাকাল। 'ওটা কারখানা। ওখানে বাবা করাত দিয়ে কাঠ চেরে, লক্ষ্মণ থাকে, ইয়াসিনও থাকে।'

যুবতী কথা বলল না।

'আবার ওধারটায়—' ছেলেটি চুপ থাকল না, আঙুল দিয়ে পিছনের একটা জায়গা দেখাল। 'কাঠুরিয়ারা কাঠ কাটে। ওপাশটায় মস্তবড় টেরাক এসে দাঁড়ায়। কুলিরা হৈ-হৈ করে এত এত কাঠ তুলে দেয় গাড়িতে। গাড়ি হুড়হুড় করে ইস্টিশানের দিকে চলে যায়।'

যুবতী এবারও নীরব থেকে একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল।

'সত্যি দিদি, দিনের বেলা জায়গাটা এমন গমগম করে। কতরকম আওয়াজ হয়। করাতের ঘসঘস, কুড়ালের থুপথুপ, আবার জঙ্গলের ভেতর থেকেও গাছ কাটার দুপদাপ আওয়াজ ভেসে আসে। আর কত মানুষের ছুটোছুটি। রাত হলে কেমন ঝিম মেরে যায় চারদিক। কেমন যেন ডর ডর করে।'

'তা তুই এখন কী করবি ?' ভাইয়ের দিকে চোখ ফেরাল যুবতী।

গম্ভীর হয়ে গিয়ে ছেলেটি মাদারের ডাল দিয়ে ঘেরা নতুন মাটির ঢিবিটা দেখল। ঝাউপাতার ফাঁক দিয়ে চিকরিকাটা জ্যোৎস্না এসে সাদা ঢিবিটাকে কেমন নীলাভ সবুজ করে তুলেছে। যেন ওটা খরগোসের কবর না, একটা তুলসীবেদী। পাতলা এইটুকুন একটা তক্তার ওপর গলা মোমটা দেখতে দেখতে কেমন শক্ত হয়ে গেল। আঙুল দিয়ে ছেলেটি মোমটা খুঁটে দেখল।

'আর একটা মোম জ্বালবি?' যুবতী ছোট ভাইয়ের কাঁধে হাত রাখল।

'হুঁ, জ্বালতে হবে, যদি বাবু এসে কবরে বাতি না দেখে তো বেজায় মন খারাপ করবে।'

যুবতী অল্প শব্দ করে হাসল। ছোট ভাই ছাড়া আর কেউ তার হাসি শুনল না। যদি শুনত তো বুঝত কত দুঃখের জলে ভেজা সেই হাসি, কত দীর্ঘশ্বাসের ঝড় বয়ে গেছে মানুষটির বুকের ভেতর।

'সেই সন্ধ্যে থেকে চার-চারটে মোম জ্বেলে শেষ করলি, তোর বাবু এল না, এখন আবার একটা পুড়িয়ে ফেললে আর মোটে একটা থাকবে—কাল সন্ধ্যাবেলা কবরে পিদিম দিতে হবে না?'

মাধব তাই চিন্তা করছিল। চাঁপাডাঙার দোকান থেকে আধ ডজন মোম কিনে এনেছিল সে। চারটেই ফুরিয়ে গেল। অবশ্য ছোট মোম, এক ঘণ্টার বেশি জ্বলে না। তা হলেও তো বাবু এত দেরি করে ফেলছে রাণীরবাগ থেকে ফিরতে—ব্যাপারটা সে কিছুই বুঝতে পারছিল না। বাবু যদি রাত্রে না ফেরে? বাবুর ওপর তার বেশ একটু রাগ হচ্ছিল।

'হুঁ, তোর বাবু আর ফিরবে বলে মনে হয় না। ঠাণ্ডার রাত। খাওয়া-দাওয়া করে বন্ধুর ঘরে শুয়ে পড়েছে।'

মাধবের দুশ্চিন্তা কাটল না। মাথাটা নাড়ল।

'এমন হয় না কোনোদিন। রাত্রে নিজের ঘরে এসে না শুলে বাবুর ঘুম হয় না। আমায় সেদিন বলছিল। আমরা দু'জন তখন হুই আতাগাছটার তলায় খরগোসটাকে নিয়ে খেলছিলাম। বাবু বলছিল, ঘাস পাতার গন্ধ নাকে না লাগলে বাবুর ঘুম হয় না, খাওয়াটাওয়াও হজম হয় না। এই জন্যই জঙ্গল ছেড়ে কোথাও বড় একটা যেতে চায় না।'

যুবতী চুপ করে শুনল। তারপর হাসল।

'বাবুর সঙ্গে তোর খুব ভাব হয়েছে, তাই না?'

'হবে না।' মাধব হঠাৎ খুশি হয়ে উঠল। 'অমন চমৎকার—ধবধবে খরগোসের বাচ্চাটা ধরে এনে বাবুকে দিয়ে দিলাম—'

'খুব ভালবাসত বুঝি বাচ্চাটাকে তোর বাবু।'

'হুঁ, বলত, ওটা আমার বৌ ছেলে মেয়ে—এককথায় সব। কোলে নিয়ে আদর করত, চুমু খেত, সাবান দিয়ে চান করিয়ে দিত, কচি কচি ঘাস ছিঁড়ে এনে খাওয়াত। কোনদিন রাত্রে সঙ্গে নিয়েও ঘুমোত।'

তবে তো তোর বাবুর মনে খুব কষ্টই হয়েছে—মরে গেল ওটা!'

'হুঁ, বাবুর চোখ দিয়ে টসটস করে জল পড়ছিল কাল। আমিও কেঁদেছিলাম খুব।'

'আর একটা খরগোস ধরে দিবি বাবুকে।'

'চেষ্টা করছি, আজ আর পারলাম না, দুপুরে মোমবাতি আনতে চাপাডাঙা চলে গেলাম।'

'ঘরে চ, তোর বাবু আজ আসবে না। খুব শীত করছে এখন।' আঁচলটা ভাল করে বুকে-পিঠে টেনে দিয়ে বসল সুখী। 'ঠাণ্ডা হাওয়া চালাচ্ছে।'

'তুই যা, তুই ঘরে চলে যা।' প্যাকেটের ভেতর হাত ঢুকিয়ে মাধব আর একটা মোমবাতি টেনে বার করল। 'অনেকক্ষণ এসেছিস, তোর বাচ্চা কাঁদবে।'

'এখন আর কাঁদবে না, বুকের দুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে এলাম।'

'মা কি করছে?'

'ঐ তো, মার কাছেই তো বাচ্চাটাকে রেখে এয়েছি। জেগে উঠে কাঁদলে মা ঠিক ধরবে।'

'বাবা কোথায় গেল?'

'জঙ্গলের দিকে গেছে দেখলাম তখন।'

'হুঁ, বোধ করি ওল তুলতে গেছে।' দেশলাই জ্বেলে মোমবাতিটা ধরিয়ে দিল মাধব। সলতেটা উপুড় করে তক্তার সেই

জমে-যাওয়া মোমের চাকাটার ওপর একটু সময় রাখল। চাকাটা নরম হতে হাতের মোমটা তার ওপর বসিয়ে দিল। চিকরিকাটা জ্যোৎস্নাটা অদৃশ্য হলো, হলদে আলোয় ঝাউতলা আবার ঝলমল করে উঠল। পিছনে ঘাসের ওপর ভাইবোনের গোল মতন ছুটো ছায়া পড়ল। দূরে একটা পেঁচা ডেকে উঠল। পুবদিকের একটা চালতাগাছের ঝুপসি মাথাটা একটু নড়েচড়ে আবার স্থির হয়ে গেল। যেন একটা রাতজাগা পাখি সেখান থেকে উড়ান দিয়ে অন্য গাছে চলে গেল।

সেদিকে চোখ রেখে সুখী আস্তে আস্তে বলল, 'বাবার ঘাড়ে আমি মোটেই চাপব না, এসে দেখলাম তোদের চাল আটার টানাটানি, একটা বাচ্চা আছে আমার, যা হোক একটা কাজটাজ জুটিয়ে নিতে হবে।'

'আহা, এই তো সবে এলি। ছু'দিন থাক না। তুই তোর এই নরম শরীর আর নরম হাত নিয়ে কোন্ কাজটা করতে পারবি শুনি? আমি তোকে রোজগার করে খাওয়াব, একটা কাজে লেগে যাব।'

'বাচ্চা ছেলে, তোকে কাজ দেবে না কেউ।'

'ইস, যেমন তোর কথা, ইস্টিশানের চায়ের দোকানে আমার চেয়ে ছোট একটা ছেলে কাজ করে।'

'কি কাজ করে শুনি?' আছুরে গলায় সুখী হাসল।

'চা বানায়, খদ্দেরকে চা এনে দেয়—' বলতে বলতে মাধব হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল। একটা কথা মনে পড়ে গেল তার। 'জানিস, একদিন বাবু বলছিল, এখান থেকে কারবার গুটিয়ে নেবে, কলকাতা চলে যাবে বাবু, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে—আমি বাবুর কাছে থাকব, বাবুর সব কাজ করে দেব।'

'তাই নাকি!' চোখ বড় করে ভাইয়ের দিকে ঘাড় ফেরাতে সুখী থমকে গেল। পায়ের শব্দ শুনে পিছনে তাকাল। মাধবও চমকে উঠে ঘাড় ফেরাল।

'বাবু এসেছে।' বিড়বিড় করে উঠল সে। মাটি থেকে উঠে দাঁড়াল। সুখীও উঠে দাঁড়াল। কেমন জড়সড় হয়ে গেল।

এত রাত্রে আলো দেখে সীতাংশু ঘরে না ঢুকে সোজা ঝাউতলায় চলে এল। মাধবকে দেখল, মাধবের পাশে লম্বা ছাঁদের একটি মেয়ে মাটির দিকে ঘাড় নুইয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। পিছনে মাদারের বেড়া দেওয়া মাটির ঢিবির ওপর মোমবাতি জ্বলছে।

সম্ভবত মোমের আলোর জন্য এপাশের জ্যোৎস্নাটা ফ্যাকাশে মরাটে চেহারা ধরেছে। অথচ দূরে লতায়-পাতায় গাছের মাথায় রুপোর পাতের মতো চিকচিক করছে চাঁদের আলো।

'কতক্ষণ এখানে আছিস?' সীতাংশু মাধবের দিকে চোখ ফেরাল। 'আমার ফিরতে রাত হয়ে গেল।'

'সেই সন্ধ্যে থেকে বসে আছি বাবু, ক'বার পিরদিম দিয়েছি, চারটে মোম পুড়ে গেছে, আর একটা জ্বাললাম এখন।'

'বলিস কি!' সীতাংশু চমকে উঠল। 'এত মোমবাতি জ্বালবার দরকার ছিল কি, সাঁঝবাতির সময় একটা জ্বেলে দিলেই হতো।' একটু থেমে থেকে আবার সে বলল, 'এই ঠাণ্ডার মধ্যে এত রাত অবধি বসে আছিস—ওটি কে?'

মাধব চোখ ট্যারা করে দিদিকে একনজর দেখে নিয়ে সীতাংশুর দিকে তাকাল।

'আমার দিদি।'

'ও!' অস্ফুট একটা শব্দ বেরোল সীতাংশুর গলা থেকে। কথা বলল না।

যুবতী এবার ঘাড় তুলল, ফোটা ফুলের মতো সুন্দর মুখখানা সীতাংশু ভাল করে দেখতে পেল। মাথায় কাপড় নেই। চমৎকার চুলের গোছা মাথায়, এতবড় একটা খোঁপা, সিঁথিমূলে সিঁদুরের ফোঁটা চোখে পড়ল সীতাংশুর।

তা তো থাকবেই। ভাবল সে। স্বামী বেঁচে আছে। যন্ত্রণা

পেয়ে হোক কি রাগ করে হোক স্বামীর কাছ থেকে চলে এসেছে, এই যা। সম্পর্কটা তো এখনো চুকে যায় নি।

'তোমার নাম কি?' ছোট ছেলে কি মেয়েকে যেমন প্রশ্ন করা হয়, সীতাংশুর গলার স্বরটা অবিকল সেরকম শোনাল। প্রশ্নটা করে সে নিজেও একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল। যুবতী তৎক্ষণাৎ নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরে তাড়াতাড়ি চোখটা নামিয়ে ঘাড় গুঁজে থাকল। লজ্জা লুকোতে হাসি গোপন করতে মেয়েরা যা করে। না, সব মেয়ে তা করে না। আরো দুটি-একটি মুখ সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল সীতাংশুর। অগত্যা মাধবের দিকে চোখ ফেরাল সে। 'তোর বাবার সঙ্গে দেখা হলো। ওপাশের জঙ্গল থেকে এতবড় একটা ওল তুলে এনেছে।'

'পেয়েছে ওল!' মাধব ফিক করে হাসল। 'বুড়োটা যেন কী, রাত করে ছুটে গেছে জঙ্গলে।'

সীতাংশু আবার কী বলতে যাচ্ছিল, একটা গলার স্বর শোনা গেল দূরে।

একটু সময় তিনজনেই কান পেতে থাকল। পরক্ষণে ভাইয়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে সুখী ফিসফিস করে কিছু বলল। শব্দটা আরো কাছে আসতে সীতাংশু বুঝল বুড়োর গলা। নিশ্চয় ছেলে মেয়ে দুটোকে খুঁজতে বেরিয়েছে মুরারি।

'পালা এইবার, বাড়ি যা।' মাধবের দিকে চোখ রাখল সীতাংশু। 'আমি এসে গেছি যখন আর তোদের বসে থাকতে হবে না। এইবেলা বাড়ি গিয়ে খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়।'

সুখী আগেই হাঁটতে আরম্ভ করেছিল।

মাধব ঘাড় ঘুরিয়ে গাছতলার কবরের ঢিবিটা দেখল। মোমের শিখাটা কেঁপে কেঁপে জ্বলছে। এ পাশে মাদারের বেড়ার ছায়াটা চঞ্চল হয়ে নড়ছে। মাধব আর দাঁড়াল না। ছুটে গিয়ে দিদির হাত ধরে হাঁটতে আরম্ভ করল।

সীতাংশু স্থির চোখে সেদিকে চেয়ে রইল। ভাঁটফুলের জঙ্গলের ভিতর দিয়ে দুটি মূর্তি কখনো ডাল-পাতার অন্ধকার ছায়া, কখনো টলটলে জ্যোৎস্না গায়ে মেখে আস্তে আস্তে অদৃশ্য হয়ে গেল।

খুব ব্যস্ততার মধ্যে কাটছে ক'টা দিন। কলকাতার এক ভাল ফার্ম থেকে বড় অর্ডার পাওয়া গেছে। বড় বড় গাছ কাটা হচ্ছে জঙ্গলে, ঠেলাগাড়ি করে সেগুলি জঙ্গল থেকে আনিয়ে করাতীদের কাছে ফেলে দেওয়া হচ্ছে, সরাৎ সরাৎ করাত চালিয়ে করাতীরা লম্বা লম্বা তক্তা বার করছে, তারপর সেগুলি মিস্ত্রীদের কাছে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, মিস্ত্রীরা স্কেল ঠেলে ফিতে ফেলে সাইজ করে সব টুকরো টুকরো করছে, তারপর সব গিয়ে উঠছে ট্রাকে। অল্প ক'দিনের মেয়াদে এত কাঠ সাপ্লাই দেওয়া।

সীতাংশুকে বেজায় পরিশ্রম করতে হচ্ছে। যেন নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই। ঘুরে ঘুরে সব কাজ দেখা-শোনা করতে হচ্ছে।

তবু ভাল, শীতকাল।

পরিষ্কার আকাশ, খটখটে রোদ। কাঠ কাটানো কাঠ শুকানো, চটপট সব হয়ে যাচ্ছে। বৃষ্টি-বাদল থাকলে কাজের ভয়ানক অসুবিধা হতো।

যেন এইদিনে কাঠুরিয়ারা করাতীরাও কাজ করে সুখ পায়। গান গেয়ে গেয়ে তারা কুড়াল চালায় করাত টানে। গরমকালে বড় কষ্ট তাদের। রৌদ্রে ঘামে সহজেই তারা কাবু হয়ে পড়ে।

কিন্তু শীতকালের দোষ এই, দিনগুলি ভয়ানক ছোট। বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বেলা পড়তেও আরম্ভ করে। তারপর হুট করে একসময় অন্ধকার হয়ে যায়।

ওদিকের কাজকর্ম সেরে সীতাংশু যখন তার আস্তানায় এসে ঢোকে তখন রীতিমত রাত। আলো জ্বালতে হয়। আলো জ্বেলে

ঘরদোর গুছানো, রান্নাবান্নার আয়োজন করা।

একটা জিনিস কিন্তু বোঝা যায় না। লোকের চোখেও কেমন অদ্ভুত ঠেকে।

মুখ ফুটে এই নিয়ে কেউ সীতাংশুকে প্রশ্ন করবে এমন মানুষই বা এখানে কে আছে।

যে বলবার সে ঠিকই বলেছিল। রণধীর বলেছিল। 'আমি ভেবে পাই না এত লোকজন খাটাচ্ছিস তুই, আর তোর হুটো ভাত ফুটিয়ে দেবে পাতকুয়ো থেকে দু' বালতি জল তুলে দেবে ঘর বারান্দাটা ঝাঁট দিয়ে দেবে—তার জন্য তুই একটা লোক খুঁজে পাস না! এত খেটেখুটে এসে নিজের হাতে এসব করা পোষায়?'

'আমার খুব পোষায়, আমার ভাল লাগে। আর একটা লোক এসে আমার ঘর-দোর বিছানা-পাটি, খাওয়া ঘুম ঠিক করে দেবে—সে এলে আমায় হুটো ভাত ফুটিয়ে দেবে স্নানের জল তুলে দেবে—না এলে আকাশের দিকে মুখ করে বসে থেকে আঙুল চুষতে হবে—এ আমার সহ্য হবে না। রাঁধলাম কি রাঁধলাম না, খেলাম কি খেলাম না, ঘরে ঝাঁটা পড়ল কি পড়ল না, আমারটা আমি দেখব। একটা জায়গায় আমি চূড়ান্ত স্বাধীনতা ভোগ করতে চাই।'

রণধীর একটু অনুযোগের সুরে বলেছিল, 'জঙ্গলে এসে তোর মতিগতি পাল্টে গেছে, কলকাতার মেসে যখন ছিলি তখন ঠাকুর-চাকরের মুখের দিকে চেয়ে তোর দিন কাটত, দোকান থেকে একটা সিগারেট আনতে হলেও চাকরকে ডাকাডাকি করতিস।'

'তা আমি অস্বীকার করছি না, সেখানে আরো পাঁচটা মানুষের সঙ্গে আমাকে বাস করতে হতো, এখানে আমি একলা, কাজেই আমার খুশিমতন আমি চলতে ফিরতে পারি, খেতে পারি পরতে পারি—এই জঙ্গলে আমার কোনো সমাজ নেই, আমিই আমার সমাজ, সুতরাং স্বাধীনতাটা পুরোপুরি ভোগ করছি।'

একটু চুপ করে থেকে রণধীর বলেছিল, 'হুঁ, স্বাধীন তো বটেই,

কিন্তু এই কৃচ্ছ্র সাধনেরও কোনো অর্থ হয় না, নিজের হাতে ধোয়া মাজা ঘষা, উনুন ধরানো রান্না চাপানো—আমি মনে করি এতে সময়ের অপব্যবহারই হচ্ছে, সামান্য ক'টা টাকা ফেলে দিলে একটা লোক এসে যেখানে সব করে দিতে পারে—সময়টা অন্য কাজে লাগান যেত।'

শুনে সীতাংশু হেসেছিল।

'আমার কাঠের ব্যবসা দেখাশোনা করেও হাতে প্রচুর সময় থাকে, সময়টা কাটে না বলে আমি এসব কাজ নিয়ে মেতে থাকি। হাতের কাছে কোনো বই নেই, খবরের কাগজ আসে না এখানে, ধারে-কাছে সিনেমা-থিয়েটারও নেই যে সেসব দেখে সময় কাটাব—কাজেই—'

তার কথা শেষ হতে দেয় নি রণধীর।

'আসলে তোর রুচিবিকৃতি ঘটেছে, জঙ্গলে এসে পুরোপুরি জংলী বনে যাবার সাধ হয়েছে, যেমন খুশি থাকলাম পরলাম খেলাম—এটাই হলো আসল কথা। চোখের ওপর যা দেখছি। যেমন তোর পোষাক-আসাক তেমনি তোর ঘরের ভেতরের চেহারা—ধোয়া মাজা ঘষার কথা বলছিস, তা-ও যে মন দিয়ে করিস এ আমি কী করে বিশ্বাস করব। আর রাঁধাবাড়া, কী রান্না করিস কী খাস ঈশ্বর জানে। এ তো আর সব সময় এসে চোখে দেখতে পাই না।'

যেন বন্ধুকে চটাবার জন্য সীতাংশু ঘাড় কাত করেছিল। 'হুঁ, সব সময় রান্নাও করি না, জংলীদের মতন কাঁচা জিনিসই চিবিয়ে খাই, তার একটা স্বাদ আছে, এবং স্বাস্থ্যের দিক থেকেও এটা ভাল, দেখিস না, ডাক্তাররা আজকাল কাঁচা জিনিস খাওয়ার ওপর খুব জোর দিচ্ছে।'—কথা শেষ করে হো-হো করে সে হেসে উঠেছিল।

রণধীর তারপর আর একটা কথাও বলে নি। কেবল ফ্যালফ্যাল করে বন্ধুর মুখটা দেখেছিল।

তাকে আঘাত দেবার জন্যই কি সীতাংশু এসব বলেছিল? রণধীর চলে যাবার পর সে চিন্তা করেছে। তার সাজান-গোছান

ঘরের দরকার নেই, চকচকে পোষাক-পরিচ্ছদ ছাড়াই সে ভাল আছে, ঘড়ির কাঁটা ধরে কেউ তার চা জলখাবার তৈরি করে দেবে ভাত রেঁধে দেবে—মোটেই সে পছন্দ করে না। জঙ্গলে আছে, সেভাবেই জীবনযাপন করতে সে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে।

এবং কথাটা মিথ্যে না।

কিন্তু কেন তার এই পরিবর্তন? তিনদিনেও দাড়ি কামালাম কি কামালাম না, সাতদিন যেমন-তেমন একটা ময়লা পোষাকই পরে থাকলাম, ঘরের এখানে-ওখানে জঞ্জাল জমে থাকলেও ভ্রূক্ষেপ থাকে না, একবেলার রান্না ভাতে জল দিয়ে রেখে আর-একবেলা খেতে আপত্তি নেই। এমন তো আমি ছিলাম না?

নিজেকে প্রশ্ন করেছে সীতাংশু। তবে কি রণধীরের সাজান-গোছান ঘর দেখে, সুন্দরী গৃহকর্মনিপুণা ঘরণী দেখে একটা অভিমান তার মধ্যে বাসা বাঁধল!

তেমন একটা ঘর হলেই সে ঘর সাজাবে, তেমন একটি ঘরণী পেলেই নিয়মিত দাড়ি কামাবে, পরিষ্কার জামা-কাপড় পরবে, সময়মত স্নান করতে যাবে?

মাইনে-করা লোক দিয়ে সেসব হয় না।

কিন্তু ইচ্ছা করলেই তো সে একটা ঘরণী পেতে পারে। একটি মেয়েকে বিয়ে করে ঘরে আনা তার পক্ষে এমন কিছু কঠিন না। আজ ইচ্ছা করলে কাল সে পাত্রী জোটাতে পারে।

কিন্তু আর একটি ব্রততী জোগাড় করা সম্ভব হবে কি?

কাজেই তার এই কৃচ্ছ্রব্রত।

চিন্তাটা সময় সময় একটা শারীরিক যন্ত্রণার মতন তাকে অস্থির করে তোলে।

সেদিন আর ঘরের দিকে পা বাড়াতেই তার ইচ্ছা করে না। কাজ শেষ হয়ে যায়, করাতীরা নিজেদের গাঁয়ে চলে যায়, কাঠুরিয়ারা মজুরী নিয়ে ঘরে ফিরে যায়, কুলি মিস্ত্রী জমাদার কেউ আর টিয়াটুলির এই

জঙ্গলের কারখানায় বসে থাকে না।

সীতাংশু একলা চুপ করে বসে থাকে, পায়চারি করে কখনো, গাছের পাতার শব্দ শোনে। শীতের কুয়াশা ও ভয়াবহ রকম একটা নৈঃশব্দ্য নিয়ে চারদিকে অন্ধকার নেমে আসে।

আকাশের জ্বলজ্বলে তারাগুলির দিকে চোখ রেখে সীতাংশু তখন ভাবে, ঘরে গেলেই ময়লা জামা-কাপড়ের কথা মনে পড়বে, গালভর্তি দাড়ির জন্য দুশ্চিন্তা হবে, নোংরা বাসন-কোসনের দিকে চোখ যাবে, তেলচিটে বিছানাটা দেখে গা ঘিনঘিন করবে, তা ছাড়া কুঁজোয় জল তোলা আছে, উনুন ধরানোর দুর্ভাবনা আছে—যেখানে ঘর নেই সেখানে এসব কিছুই নেই। তুমি নিশ্চিন্ত নির্বিকার থেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতে পার।

কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কারখানার চৌহদ্দী পার হয়ে বনের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে সে এগোতে থাকে। জঙ্গলের মাথা-উঁচু প্রকাণ্ড গাছগুলি তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে।

একটা জায়গায় এসে সে স্থির হয়ে দাঁড়াল। মনের মতন একটা জায়গা পেল এতক্ষণ পর।

কারখানা থেকে বেরিয়ে সে ডাইনে হেঁটেছে বাঁয়ে হেঁটেছে, কিন্তু কেন জানি কিছুটা পথ এগোবার পর আর ভাল লাগে নি, সেই পথ ছেড়ে অন্য পথ ধরেছে। তারপর ডাইনে বা বাঁয়ে না গিয়ে নাক বরাবর সোজাসুজি এগিয়ে গেছে।

পাতার শব্দ পোকার শব্দ ছাড়া অন্য কোনো শব্দ তার কানে আসছিল না।

তারপর যেন সেসব শব্দও এক সময় থেমে গেল।

অত্যন্ত নিঃশব্দ নির্জন জায়গা।

বড় বড় গাছ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যেন প্রত্যেকটা গাছ একটা বিস্ময়, একটা কৌতূহল নিয়ে দিনের পর দিন রাতের পর রাত

একটা ভয়ংকর কিছুর জন্য অপেক্ষা করছে। সেটা কি জিনিস মানুষ বুঝতে পারে না। বনের পশু-পাখি কীট-পতঙ্গেরা বুঝতে পারে কি না তা অবশ্য বলা মুস্কিল।

হয়তো বুঝতে পারে। গাছেদের আশঙ্কা উৎকণ্ঠা কৌতূহল দেখে সময় সময় এই জন্যেই বোধহয় তারাও এত বেশি চুপ করে থাকে। তারাও বনে থাকে। শাল সেগুন দেবদারু পলাশ জারুল—প্রত্যেকটা গাছের মনের কথা তারা টের পায়, যে জন্য পাখির বাচ্চাটাও পর্যন্ত এক সময় টুঁ শব্দটি করে না।

তাই তো, কিসের ভয়, কেন এত চুপচাপ সব।

ভূমিকম্পের আশঙ্কা? বড় রকমের একটা ঝড়ের আশঙ্কা? দাবাগ্নি? অনাবৃষ্টি?

সীতাংশু মাঝে মাঝে কথাটা চিন্তা করে। হুঁ, যখন হাঁটতে হাঁটতে এক সময় বনের গভীর অংশে এসে সে উপস্থিত হয়। অনেক দিন এমন হয়েছে।

আজও সে এই জিনিস অনুভব করল। তার মনে হলো সমস্ত সৃষ্টি নিথর নিস্পন্দ হয়ে আছে। এসব জায়গায় এলে মনে হয়, পৃথিবী কত প্রাচীন সৎ বিজ্ঞ এবং দূরদর্শী।

এসব জায়গায় এসে দাঁড়ালে সীতাংশুর নিজের কথা আরও বেশি মনে হয়। নিজের দিকে তাকাতে ইচ্ছা করে। যেহেতু সে বনের বাইরে থাকে। ঘরবাড়ি তৈরি করে নিজের সুখ সুবিধা সে নিজেই দেখছে, বনের মুখের দিকে মোটেই তাকিয়ে থাকছে না। বনের সঙ্গে সে, এক কাঠ কেটে ব্যবসা করা ছাড়া, আর কোনো রকম যোগাযোগই রাখে নি। কাজেই বন তার কাছে এত দুর্বোধ্য, এত অপরিচিত। সরলতা সে ভুলে গেছে, স্বাভাবিকতার অর্থ কি জানে না। সে কৃত্রিম অসৎ অপরিণামদর্শী এবং নানা দিক দিয়ে অজ্ঞ।

অবশ্য বনের বাইরে সে সভ্য সৎ বিজ্ঞ ভূয়োদর্শী। আর পাঁচটা জ্ঞানী মানুষের মতন সে-ও বোমা এরোপ্লেন রকেট নিয়ে গর্ব করে।

দামী সিগারেট খায়, নিত্য নতুন ফ্যাশানের পোষাক পরে, কায়দা করে চুল ছাঁটে, কায়দা করে হাসে। সে জানে না, বোমা এরোপ্লেন রকেট জামা-কাপড়ের ফ্যাশন মিষ্টি হাসি তাকে এবং পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে।

এই জন্যই একদিন গভীর অরণ্যের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে কেমন বিমূঢ় বিচলিত হয়ে পড়ে। তার যেন তখন ইচ্ছা করে তার জ্ঞাতিগোষ্ঠী পৃথিবীর বাকি সব মানুষকে এখানে ডেকে এনে দেখায়, তারা কতটা বিজ্ঞ সভ্য সংস্কৃতিবান হয়ে উঠেছে। তারা নিশ্চয় লজ্জা পেত তখন। কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে যেত। এক-একটা বিশাল প্রাচীন গাছের দিকে তাকিয়ে তারা নিজেদের অসারত্বের কথা চিন্তা করত। গাছেরা যে একটা কিছুর জন্য অপেক্ষা করছে, চোখের সামনে ভয়ংকর কিছু দেখছে, যে কারণে সমস্ত বনভূমি জুড়ে এত কিছু মৌনতা এত স্তব্ধতা, শহর-বন্দরের মানুষ কিছুক্ষণের জন্য হলেও তা বুঝতে পেরে দৌড়ঝাপ পোষাক-আসাকের ফ্যাশান ও বুদ্ধির বাড়াবাড়িটা কমিয়ে দিত।

কিন্তু কাকে ডেকে এনে দেখাবে। চিন্তা করে সীতাংশু নিজের মনে একটু হাসল।

একটা ছুটো মুখ তার চোখের সামনে ভেসে উঠল।

না, কাউকে এখানে ডাকা যায় না। তারা এখানে এলেও চোখ বুজে থাকবে, কানে আঙুল দিয়ে রাখবে। পাছে পাতার সরসর শব্দ কি ঘাসপোকার ঝী-ঝী আওয়াজটাও কানে যায়। অসুবিধা তো বটেই, ভয়ংকর অস্বস্তিবোধ করবে তারা এখানে এলে। ততক্ষণ ঘরে বসে তারা ক্রাইম নভেল পড়ত, কফি খেত, কি ঘর সাজাত, নিজে সাজত।

আর শহরের মানুষ এখানে কে আছে, অন্য যারা আছে তারা বনের কাছাকাছি থাকে। বনের ভাষা তাদের কাছে খুব একটা দুর্বোধ্য ঠেকবার কথা নয়। যেমন মুরারি, ইয়াসিন এবং তার

কারখানার আরো দুটি-একটি করাতী কাঠুরিয়া। তারা বন ভালবাসে, একটা বিশাল পুরোনো গাছ দেখলে কতক্ষণ থমকে দাঁড়ায়। গাছকে তারা শ্রদ্ধা করে। গাছের গুঁড়িতে কপাল ঠেকিয়ে প্রণাম জানায়, তেল-সিঁদুর লেপে দেয়, ফুলের মালা পরিয়ে দেয়। তারা জানে, বন ছাড়া তারা বাঁচতে পারবে না, গাছ লতাগুল্মের জগৎকে অতিক্রম করে তারা বেশিদূর এগোতে পারবে না।

যারা এগিয়েছে তারা কতটা পথ গেছে এবং আর কতদিন এভাবে এগোতে পারবে নিজেরা সেকথা একবার চিন্তা করে না, করবার সময় নেই, ক্ষমতাও হয়তো নেই এই বিষয়ে কিছু ভাববার।

ভাবছে—এই বন, বনের ঊর্ধ্বশির তরুরাজি। তারা অনেক দূর দেখতে পায়। তারা অনেকদিন ধরে সব দেখছে।

তারা ঠিক বুঝে গেছে মানুষ কোথায় চলেছে, কোন্ সর্বনাশের দিকে আড়াআড়ি করে সব এগিয়ে যাচ্ছে।

এই জন্যই গাছেদের চোখেমুখে এত ভয়, পত্রে শাখায় কালো আতঙ্কের ছায়া সারাক্ষণ ঝুলছে। নিজেদের জন্য তারা একটুও চিন্তিত নয়। মানুষের ভয়ংকর পরিণামের কথা ভেবে তারা নীরব ও মুহ্যমান হয়ে আছে।

তাই তো, দাম্ভিক গর্বিত মানুষকে একথা কে বোঝাবে, তারাও যে এককালে অরণ্যের সন্তান ছিল—তাদের নিশ্বাসে এখনও বনের গন্ধ লেগে আছে, রক্তে লতা-পাতা-গুল্মের নির্যাস এখনও ঘন হয়ে মিশে আছে।

মানুষ একথা ভুলে গেছে।

কিন্তু অরণ্য তা ভোলে নি। নিজের সন্তানদের কে ভোলে! সীতাংশু একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল।

বনে এসে বনের কথা এত গভীরভাবে সে আর কোনোদিন চিন্তা করে নি।

একটা পুরোনো অশ্বত্থগাছের নিচে দাঁড়িয়ে সে এত সব ভাবছিল। গাছ না, যেন হাজার বছরের বৃদ্ধ এক ঋষিকে সে আবিষ্ট হয়ে দেখছিল। কত ঝুরি কত শিকড় তার, কাঁচা পাকা আধপাকা নধর শুকনো সবুজ বিবর্ণ কতরকম চেহারা একটি গাছের পাতার, যেন লক্ষ কোটি পাতার বোঝা ও লাল লাল ফুল নিয়ে বিশাল বৃক্ষ দিনের পর দিন রাত্রির পর রাত্রি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

এই গাছকে অস্বীকার করবে, তার বিশালত্ব প্রাচীনত্ব, তার দর্শন ও জ্ঞানকে উপেক্ষা করবে এমন শক্তি সীতাংশুর নেই।

গাছের গুঁড়িতে কপাল ঠেকিয়ে সে প্রণাম করল। প্রণাম সেরে যখন সোজা হয়ে দাঁড়াল একটা মিষ্টি হাসির শব্দ তার কানে এল। যেন কচি গলায় কেউ হাসল। যেন আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে মানুষটা। সীতাংশুকে হঠাৎ এই নির্জন জায়গায় অশ্বত্থ গাছকে প্রণাম করতে দেখে অল্প শব্দ করে হেসে উঠল। কিন্তু একবারই হাসল। আর হাসল না। বিব্রত হয়ে সীতাংশু এদিক ওদিক ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে লাগল। কাউকে দেখতে পেল না সে।

অথচ বেশ মসৃণ নরম গলায় কেউ হাসল, পরিষ্কার সে শুনতে পেল।

তার একবার ইচ্ছা করল গলা উঁচু করে জিজ্ঞাসা করে, 'কে ওখানে দাঁড়িয়ে?' চারদিকে ঘন ঝোপঝাড়। কেউ লুকিয়ে থাকলে চট করে যে চোখে পড়বে না তা-ও সে বুঝতে পারছিল। এবং যদি মানুষটির দেখা না দেবার মতলব থাকে, তবে শত চেষ্টা করলেও একলা এই ঘোর ঘোর সন্ধ্যায় তাকে খুঁজে বার করা সীতাংশুর পক্ষে কঠিন হবে।

না, ভুল শোনে নি। একটা হাসির শব্দ ঠিকই তার কানে এসেছে, তবে অত্যন্ত মৃদু গলায় কেউ হাসছিল এবং হাসতে আরম্ভ করে তখনি হাসি থামিয়ে দিয়েছে, যেন লজ্জা পেয়েছে, ভয় পেয়েছে।

নিজেকে সংযত করে মুখ বুজে চুপ করে বসে আছে, পাছে আবার না গলা দিয়ে হাসি ঠেলে বেরোয় এই আশঙ্কায় ছু' হাতে মুখ রাখাও অস্বাভাবিক না। ছবিটি কল্পনা করে সীতাংশু মনে মনে হাসল, তারপর একটু একটু করে আবার এগোতে আরম্ভ করল।

ছু'পা এগোবার পর থমকে দাঁড়াল সে। বনতুলসীর ঝোপটা শেষ হয়ে পাহাড়ের মতন উঁচু হয়ে গেছে জায়গাটা। অনেকটা জায়গা জুড়ে প্রকাণ্ড একটা ঢিবি। ঢিবির ওপর ছুটো চমৎকার খেজুর গাছ দাঁড়িয়ে আছে। গাছের পিছনে রুপোর থালার মতন বিশাল চাঁদ ঝকমক করছে।

দৃশ্যটা সুন্দর।

এক সেকেণ্ড স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে সীতাংশু দৃশ্যটা দেখল। কিন্তু জ্যোৎস্নার ঝলকটা চোখে সয়ে যেতে খেজুর গাছের গুঁড়ির কাছে কালোমতন একটা কিছু তার চোখে পড়ল। না, জিনিসটা এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে নেই। রীতিমত নড়া-চড়া করছে। তা না হলে সে মনে করতে পারত মরা কোনো গাছের গুঁড়িটুড়ি পড়ে আছে। ওপরের অংশটা কেউ কেটে নিয়ে গেছে, বাকিটা রয়ে গেছে। হয়তো আর একটা খেজুর গাছই ছিল। ওপরটা কেটে ফেলাতে গুঁড়িটা কালো বিবর্ণ হয়ে আছে, জিয়ল বা মাদার গাছ হলে ঐ গুঁড়ি থেকেই আস্তে আস্তে নতুন ডালপাতা গজাতে আরম্ভ করত ; এটা অশ্বত্থ না, তা হলে গুঁড়ি এত সরু হতো না। শাল-সেগুনও না। শাল সেগুনের গুঁড়ি কেউ রেখে যায় না। সেসব গাছের গুঁড়ির দিকটাই বেশি কাজে লাগে। মাথাটা ঝড়ে ভেঙে গেলেও, কেউ-না-কেউ এতদিনে গাছের বাকি অংশটা তুলে নিয়ে যেত। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে এমন কালো রং ধরত না।

যাই হোক, জিনিসটা নড়া-চড়া করছে, আদৌ যে ওটা গাছের কোনো অংশ না সেই সম্পর্কে সে নিশ্চিন্ত হলো। তবে কি ছাগল, গরু, গাধা, মোষ বা ঐ ধরনের কিছু ঢিবির ওপর উঠে ঘাস খাচ্ছে।

কিন্তু ঢিবির ওপর তেমন ভাল ঘাস বড় একটা থাকে না। এই ক' মাস ঘুরে ঘুরে সীতাংশু যা দেখল, অধিকাংশ ঢিবির মাথায় কাঁটা ঝোপঝাড় ছাড়া কিছু থাকে না। কাঁটার জঙ্গলে ছাগল, গরু, মোষ চরতে পারে না।

তাহলে ওটা কী হতে পারে, সে চিন্তা করতে লাগল। দৃষ্টিটাকে অণুবীক্ষণের মতন সূক্ষ্ম করে আরও দু' মিনিট সে সেদিকে তাকিয়ে থাকল। হঠাৎ তার চোখে পড়ল, যেন জিনিসটা বড় হয়েছে, একটু উঁচু হয়ে উঠেছে। এবার সীতাংশু বুঝতে পারল, ঢিবির ওপর একটা মানুষ নড়া-চড়া করছে, এতক্ষণ হামাগুড়ি দিয়ে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছিল, এবার মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু প্রমাণ সাইজ মানুষ না, বামন-টামন বা বাচ্চা ছেলে কেউ হবে।

তৎক্ষণাৎ একটা সন্দেহ সীতাংশুর মধ্যে দানা বেঁধে উঠল। বনতুলসীর ঝোপ ঠেলে একরকম ছুটতে ছুটতে ঢিবির কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

এবার সে পরিষ্কার দেখতে পেল মানুষই বটে এবং যেমনটা সে অনুমান করেছিল, বাচ্চা ছেলে। ফুটফুটে চাঁদের আলো থাকলেও দূর থেকে মূর্তিটাকে কালো ঝাপসা মতন দেখাচ্ছিল। এখন আর ঝাপসা কিছু রইল না, ছোট্ট মানুষটিকেও সে চিনতে পারল।

'হেই মাধব!' চেঁচিয়ে উঠল সে।

কিন্তু মাধব সাড়া দিল না। তার দিকে তৎক্ষণাৎ ঘুরে দাঁড়াল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মুখের কাছে হাত তুলে তাকে যেন চুপ করতে ইসারা করল।

'ব্যাপার কি!' বেশ একটু কৌতূহল অনুভব করল সীতাংশু। নিচু জমি ছেড়ে আস্তে আস্তে ঢিবির ওপর উঠতে আরম্ভ করল। কিন্তু বোঝা গেল মাধব তাতে বিরক্ত বোধ করছে। হাতের ইঙ্গিত করে খুব একটা ব্যস্ততা নিয়ে সীতাংশুকে যেন এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে উপদেশ দিচ্ছে।

তার হাবভাব দেখে সীতাংশুর হাসি পেল। এবং পাছে সে আরও রুষ্ট হয় রাগ করে, চিন্তা করে সীতাংশু আর ওপরে উঠল না। একটা আকন্দঝোপের পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। চাঁদের আলোয় আকন্দঝোপটাকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল। দুধসাদা রং ধরে পাতাগুলি কেমন চকচক করছিল। মাধব ততক্ষণে আবার হামাগুড়ি দিয়ে খেজুর গাছের গুঁড়ির দিকে এগোতে আরম্ভ করেছে। যেন অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে একটু একটু করে সে সেদিকে এগোচ্ছে, মাঝে মাঝে মাথাটা কাত কবে মাটির দিকে কান রেখে সে খুব মনোযোগের সঙ্গে কী যেন শুনতে চেষ্টা করছে।

আরও প্রায় তিন মিনিট এভাবে কাটল। ধৈর্য ধরে সীতাংশু ততটা সময় চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। হাতে কোনো কাজ নেই ভেবে একটা দুটো আকন্দপাতা ছিঁড়ল। টসটস করে দুধের মতন খানিকটা করে আকন্দের কষ ঝরে পড়ল। তারপর ওপরের দিকে চোখ তুলতে সে দেখতে পেল, মাধব আবার ঘাড় তুলে দু' পায়ের ওপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবার পায়ের গোড়ালী দিয়ে সে মাটির ওপর জোর ঘা দিচ্ছে। যেন মাটির নিচে কিছু লুকিয়ে আছে, সাড়া শব্দ পাচ্ছে না বলে গোড়ালী ঠুকে মাটিতে আঘাত করছে।

সীতাংশু একটু একটু করে ঢিবির ওপর উঠতে লাগল। মাধব চোখ ঘুরিয়ে তাকে দেখল, কিন্তু আর যেন ব্যস্ত হয়ে হাতের ইসারা করে তাকে ওপরে উঠতে বাধা দিল না।

সীতাংশুর চোখে মুখে ফুরফুরে হাওয়া লাগল। ঝোপঝাড়ের ভিতর হাওয়াটা গরম গরম ছিল। অতিরিক্ত গাছগাছড়ার দরুণ বাতাস সেখানে তেমন করে চলাফেরা করতে পারে না, তাই গুমট লাগে। ঢিবির ওপরের বাতাস অনেক. বেশি নির্মল তাজা মনে হচ্ছিল। সীতাংশুর ভাল লাগল।

খেজুর গাছের গুঁড়ি ছেড়ে মাধব একপা দু'পা করে তার কাছে সরে এল।

'বাবু!' ফিসফিসিয়ে উঠল সে।

'হুঁ, তুই এখানে কি করছিস?' সীতাংশু খাটো গলায় প্রশ্ন করল।

'একটা ধরেছি, আর পারা যাচ্ছে না—বড্ড চালাক ওরা, ধাড়িগুলো বেশি বজ্জাত।' যেন এতক্ষণ শ্বাস বন্ধ করে ছিল, এবার বড় করে একটা নিশ্বাস ফেলল মাধব। অত্যধিক উত্তেজনা ও ছুটোছুটির দরুণ সে যে ক্লান্ত হয়েছে বেশ বোঝা যাচ্ছিল।

সীতাংশু অবাক হলো।

'কি ধরছিস এখানে?'

'এই তো খরগোসের বাসা, ঢিবির গর্তের ভেতর আরাম করে আছে সব, হুঁ, দু-তিন কুড়ি হবে।'

'তাই নাকি!' সীতাংশু চোখ ঘুরিয়ে ঢিবির চারপাশ দেখল। জায়গায় জায়গায় কাঁটা ঝোপ রয়েছে। এখানে ওখানে একটা দুটো গর্তও তার চোখে পড়ল।

না, তার জানা ছিল না এমন চমৎকার উঁচু জমিতে গর্ত খুঁড়ে খরগোসেরা বসবাস করে। এবং তারা যে খুব চতুর মাধবের মুখে সে এই প্রথম শুনল।

'তা, একটা তো ধবেছিস, কোথায় সেটা?' সীতাংশু অল্প হাসল। 'বাচ্চা? না ধাড়ি?'

'বাচ্চা', মাধব খুব একটা উৎসাহবোধ করছিল বলে মনে হলো না কিন্তু। নিস্তেজ গলায় বলল, 'ধাড়িগুলো খুব বদমাস, ধরা যায় না।' একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, 'আমাদের আগের বাচ্চাটার মতন ধবধবে রঙের পেলাম না। এটার রং কেমন ফ্যাশফ্যাশে—অনেকটা ধোঁয়ার রঙের, আর বড্ড রোগা।'

'আগেরটা খুব তেজী ছিল। রংটাও ছিল দুধের মতন।'

সীতাংশুর চোখের দিকে চেয়ে মাধব শুধু ঘাড়টা একবার কাত করল। কথা বলল না। একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল। তার চোখ

ছলছল করে উঠছে বোঝা গেল। কিছুতেই যে সে আগের বাচ্চাটার কথা ভুলতে পারছে না সীতাংশু এখন আবার নতুন করে অনুভব করল। কত নরম মন ছেলেটির। অথচ আজ সারাদিন একবারও কিন্তু তাদের সেই আদরের ফুটফুটে বাচ্চাটার কথা সীতাংশুর মনে পড়ল না। এটা কি বয়সের ব্যবধানের জন্য? সীতাংশু বুড়ো হতে চলেছে, তার লক্ষণ? সহজেই মনের দাগ-টাগ মুছে যায়?

'রোগার জন্যে কিছু আটকাবে না, ভাল করে খাইয়েটাইয়ে ওটাকেই মোটা করে তুলব।' যেন মাধবকে সান্ত্বনা দিল সে। 'তা একটা যখন ধরা হয়েছে আবার কি, আর খোঁজাখুঁজি করছিস কেন?'

মাধব কাঁধ চুলকাল। 'ভাবলাম, মোটাসোটা সাদা রঙের যদি একটা পেয়ে যাই।'

'কিছু দরকার নেই আর কষ্ট করে। চ এবার বাড়ি যাই, রাত হয়েছে। বাচ্চাটাকে কোথায় রেখেছিস?' সীতাংশু ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক ওদিক খুঁজছিল।

'দিদির কাছে।'

সীতাংশু চমকে উঠল। মাধবের দিদি? সেই কাল যাকে সে দেখেছিল? সুখী? স্বামীর কাছ থেকে যে চলে এসেছে।

'কোথায় তোর দিদি?' ফ্যালফ্যাল করে মাধবের চোখ দুটো দেখল সে।

'নিচে।' মাধব আঙুল দিয়ে ঢিবির নিচের বনতুলসীর ঝোপটা দেখাল। 'দিদি ওখানে আছে, আমি ওপরে উঠতে বারণ করে-ছিলাম।'

সীতাংশু ঘাড় ফিরিয়ে বনতুলসীর ঝোপের দিকে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে একটা চমৎকার ছবি তার চোখে পড়ল। অথচ একটু আগে ঐ ঝোপের গা ঘেঁষে ঢিবির দিকে তাকে এগোতে হয়েছিল। তখন কাউকে সে দেখতে পায় নি। এখন দেখল। কোমর পর্যন্ত জঙ্গলে ঢাকা রয়েছে মানুষটির। কাজেই পায়ের দিকটা দেখা

যাচ্ছিস না। কোমর থেকে গলা পর্যন্ত শরীরের ওপরের অংশটাকে মনে হচ্ছিল শ্বেতপাথরের তৈরি কোনো জিনিস। ফরসা একখানা কাপড় পরেছে, তার ওপর এমন ধবধবে জ্যোৎস্না। মুখখানাকে মনে হচ্ছিল সদ্যফোটা একটি ফুল। সেই অনবদ্য মুখ ও শ্বেতবসনে ঢাকা শরীর নিয়ে ঢিবির ওদিকটা যেন আলো করে আছে যুবতী। বুকের কাছে একটা কিছু ধরে রেখেছে। নিশ্চয় খরগোসের বাচ্চাটা।

'ঐ যে দিদি এসে গেছে!' মাধবও তাকে দেখল।

'আয়, এবার বাড়ি ফেরা যাক।'

বিড়বিড় করে বলল সীতাংশু। মাধব কথা না বলে ঘাড় কাত

এবার আর নতুন করে খরগোসের বাচ্চাটার জন্যে 'বাসা' তৈরি করতে হলো না। কাঠের বাক্সের গায়ে লোহার শিক ও জাল লাগিয়ে আগের বাচ্চার জন্যে যে বাসাটা তৈরি করা হয়েছিল সেটাই ঝেড়ে-মুছে পরিষ্কার করা হলো। পুরনো খড় ফেলে দিয়ে নতুন খড় বিছিয়ে চমৎকার একটা বিছানাও তৈরি করা হলো।

আগের দিন রাত্রে সব করা সম্ভব হয় নি।

পরদিন সকালে মাধব চটপট হাত লাগিয়ে কাজ শেষ করল।

অবশ্য মাধবকে আর একটি মানুষও সাহায্য করল। তার দিদি। আগের বাচ্চাটার ঘাস রাখার জন্য যে বেতের ঝুড়িটা ব্যবহার করা হতো সুখী নিজে থেকে সেটা সুন্দর করে ধুয়েটুয়ে ঘাসের ওপর, যেখানে রোদ এসে পড়েছিল, উপুড় করে রেখে দিল, যাতে চট করে জলটা ঝরে যায়।

কাজেই এবার সীতাংশুকে এসবের জন্য একটুও মাথা ঘামাতে হলো না।

ধোঁয়ার রঙের রোগা বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে ঘরের সামনে

আমলকীতলায় বসে খুব আদরটাদর দিচ্ছিল সে, আর মাঝে মাঝে চোখ তুলে মাধবের কাজ দেখছিল, তার দিদির ছুটোছুটি দেখছিল। জঙ্গলের দিকে ছুটে গিয়ে একফাঁকে সুখী এত কচি ঘাস ছিঁড়ে নিয়ে এল।

তার ফরসা সুন্দব হাতের মুঠোয় সোনালি সবুজ ঘাসের আঁটিগুলি যে কী অপরূপ দেখাচ্ছিল! হুঁ, যখন সে ঘাস নিয়ে আমলকীতলায় এসে দাঁড়ায়, সীতাংশুর চোখের পলক পড়ছিল না। আর এদিকে তার কোলে বাচ্চাটা তখন অতিমাত্রায় চঞ্চল হয়ে ওঠে। সুখীর হাতে তাজা ঘাস দেখে সে ঠিক টের পায় তার খাদ্য এসে গেছে। যেন সে আশা করেছিল এমন একটি মানুষই বন থেকে তার ঘাস নিয়ে আসিবে। সীতাংশু কিছুতেই বাচ্চাটাকে সামাল দিতে পারছিল না। পা ছুঁড়ছিল, মাথা নাড়ছিল, রেগে উঠে ঘাড় গলা ফুলিয়ে সীতাংশুকে যেন তখনি কামড় বসিয়ে দেয়, আঁচড়ে দেয়।

‘আয়, আমার কাছে আয়।’ সুখী আদর করে ডাকল।

সীতাংশু কোল থেকে ওটাকে নামিয়ে দিল। তার আশঙ্কা ছিল, সবে জঙ্গল থেকে ধরে আনা হয়েছে, ছাড়া পেলেই বাচ্চাটা আবার জঙ্গলের দিকে ছুটে যাবে। কোথায় কোন ঢিবির গর্তে তার বাবা মা ভাই বোন মাসী পিসিরা তার জন্য ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করছে, রাস্তা খুঁজে খুঁজে সে ঠিক তাদের কাছে চলে যাবে।

কিন্তু সীতাংশু অবাক হলো।

ওদিকের কাজ সেরে মাধবও তখন ঠিক তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ঠোঁট ছড়িয়ে মাধব হাসছিল। সীতাংশুর কোল থেকে নেমে বাচ্চাটা জঙ্গলের দিকে ছুটে যাবে দূরে থাক সেদিকে এক বার তাকালও না। পিছনের পা দুটো একটু ভেঙে রেখে সামনের পা দুটো তুলে দিয়ে কেমন নাচতে নাচতে সুখীর কোলে গিয়ে উঠল।

এবার মাধব শব্দ করে হেসে উঠল।

সীতাংশুও হাসল।

সুখী হাসল না। বরং যেন একটু লাল হয়ে উঠল। সীতাংশু তার দিকে তাকিয়ে আছে। তার হাতের ঘাস বাচ্চাটা কুটকুট করে ছিঁড়ে খাচ্ছে। খুশি হয়ে মাধবও দিদিকে দেখে হাসছে। ছুটি পুরুষ একসঙ্গে হাসছে দেখে যুবতী একটু লজ্জা পাবে সন্দেহ কি।

সীতাংশু সে-কথাই ভাবছিল।

'এটা খুব সকাল সকাল পোষ মানবে বাবু।'

'হুঁ, তাই মনে হয়।' সীতাংশু মাধবের দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়ল। মনে মনে বলল, এমন চমৎকার ফরসা হাতের খাওয়া ও আদর-যত্ন পেলে পোষ মানতে দেরি হবার কথা কি।

'অথচ আগেরটাকে পোষ মানাতে কী কষ্ট আমাদের করতে হয়েছিল।'

'তা হয়েছিল।' সীতাংশু আর মাধবের দিকে তাকাল না। ওদিকের বড় নিম গাছটার পিছনে মুরারিকে দেখতে পেয়ে সে চুপ করল।

যেন বেশ একটু উত্তেজিত হয়ে মুবারি হন হন করে এদিকে ছুটে আসছে।

হয়তো কোনো কাজের কথা নিয়ে বুড়ো করাতী বাবুর কাছে ছুটে আসছে। গাছটা পিছনে রেখে মুরারি সামনে এসে দাঁড়াতে সীতাংশু হাসল।

'কি হলো মুবারি।' সীতাংশু আগে কথা বলল।

মুরারি তার কথার জবাব দেবার আগে কুঁচকানো পাকা ভুরু জোড়া তুলে আগে ছেলেকে দেখল, তারপর মেয়ের দিকে চোখ রাখল। সুখী একমনে খরগোসের বাচ্চাটাকে ঘাস খাওয়াচ্ছে। বুড়োকে সে দেখল। একবারই চোখ তুলে দেখল। তারপর যা করছিল, ঘাড় গুঁজে বাচ্চাটার মুখের সামনে ঘাসের গোছা তুলে দিয়ে 'খা, লক্ষ্মীসোনা, পেট ভরে খা' বলে মিষ্টি গলায় আদর করতে লাগল।

যেন বিরক্ত হয়ে মেয়েকে কিছু বলবে বলে বুড়ো ব্যস্ত হয়ে ছুটে এসেছিল। বুড়োর চেহারা দেখে সীতাংশুর তাই মনে হচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ এমন সুন্দর দৃশ্যটা দেখে কেমন যেন থমকে গেল, যেন খুবই অবাক হলো সে, একটা কথাও আর মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে না। এমন কি, সীতাংশু লক্ষ্য করল, বুড়োর কুঁচকানো ভুরু জোড়াও প্রসন্ন সরল হয়ে উঠল। শুকনো ঠোঁটের ফাঁকে একচিলতে হাসি উঁকি দিল।

তাতে সীতাংশুর কথা বলার সুবিধে হলো।

'এটার রং একটু ময়লা। আগেরটা একেবারে দুধের মতন ধবধবে ছিল, তাই না বুড়ো ?'

মুরারি ঘাড় ঘুরিয়ে বাবুব মুখ দেখল।

'তা এটাও মন্দ না। রঙে কি এসে যায় বাবু, যাকে আদর করব, কাছে রাখব তার রং দেখতে গেলে চলবে কেন। রং দেখব না রূপ দেখব না, তার গুণ দেখব, স্বভাবখানা দেখব।'

'ঠিক কথা।' বুড়োর দার্শনিক উক্তি সীতাংশুকে খুশি করল। 'মনে হয় স্বভাবখানাও ভালই হবে, এই একবেলার মধ্যেই কেমন বাধ্য হয়ে গেছে, মাধবের দিদি একবার ডাকতেই ছুটে গিয়ে কোলে চেপেছে, একটু ছটফট করছে না, নেমে যেতে চাইছে না ; জঙ্গলে যে তার ঘরবাড়ি আছে, বাবা মা ভাই বোনকে সেখানে ফেলে এসেছে, একবারও যেন কথাটা তার মনে পড়ছে না।'

বুড়ো আবার একটু গম্ভীর হয়ে মেয়েকে দেখল। ছেলের দিকেও একবার চোখ রাখল। তারপর সীতাংশুর মুখের দিকে চোখ ফেরাল।

'তবে কথা কি বাবু, আদর সোহাগ সবাই কিছু মনে রাখে না। চক্ষুর পলক ফেলতে মায়ামমতা ভুলে যায় এমন বেইমানও সংসারে কম নেই।'

'তা তো আছেই।' সীতাংশু মাথা নাড়ল। 'কত লোক বন থেকে পশু পাখি ধরে আনে, আদর করে ওদের খাওয়ায়, কত যত্ন

করে, হয়তো দেখা গেল অল্প ক'দিনেই বেশ পোষ মেনে গেল, তারপর একদিন একটু সুযোগ পেয়েছে কি অমনি জঙ্গলে পালিয়ে গেল বা আকাশে উড়ে গেল। মায়ামমতা আদরযত্ন কিছুই মনে রাখল না।'

শুকনো গলায় মুরারি হাসল।

'তা না হয় ওরা পশুপাখি বাবু, খুব একটা দোষ দেওয়া যায় না —কিন্তু যদি মানুষে এমন করে—'

'তা তো বরেই।'

মুবারির দেখাদেখি সীতাংশুও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'সুখী, আমার কথা শুনছিস মা।' মুরারি মেয়ের দিকে চোখ ফেরাল।

সুখী মুখ তুলল।

'কি বলছ?'

'ওদিকে যে তোর বাচ্চাটা ভয়ানক কান্নাকাটি করছে।'

'করুক গে, মা আছে, দেখবে।'

'এই ছাখ, দিদিমা হলো এক জিনিস, মা হলো আর-এক জিনিস। তোর বাচ্চাকে তুই যত সহজে হাত করতে পারবি আর একটা মানুষ তা পারবে ক্যানে।'

সুখী ভুরু কুঁচকালো।

'তা আমি করব কী। সেই ভোর রাতে উঠে পেটভরে বুকের দুধ খাইয়ে ঘুমটুম পাড়িয়ে এলাম, বেলা ক'টা বাজল এখন? উঠেই কান্না। কাঁদুক, কেঁদে কেঁদে মরে যাক।'

মুবারি হাসল। ওটা যে দুঃখের হাসি বেশ বোঝা গেল। মেয়ের মুখখানাও লক্ষ্য করছিল সীতাংশু। যেন সেই মুখে রাগ ঘেন্না বিরক্তি বেদনা, অনেক কিছু থমথম করছিল।

'পেটের সন্তান, করবি কী।' মুরারি আড়চোখে আমাকে দেখল, মুখটা ফিরিয়ে এক দলা থুথু ফেলল। 'মাধুর মা একলা সবদিক

সামাল দিতে পারে না, জেগে উঠে এমন অঝোরে কাঁদছে আমার দাহু—'

মুরারির কথা শেষ হলো না।

সুখী কেমন জ্বলে উঠল।

'থাক, তোমায় আর আদরের ডাক ডাকতে হবে না, আমি তো হুচোখে দেখতে পারি না ক্ষুদে শয়তানটাকে, শয়তানের বাচ্চা না না হলে আমার হাড়মাস এমন জ্বালিয়ে খায় চব্বিশঘণ্টা।'

'এই ছাখ।' বুড়ো আবার তুঃখের হাসি হাসল। 'কার রাগ কার ওপর পড়েছে—তা শয়তানের বাচ্চা হলেও তো তুই গভ্ভে ধরেছিলি মা, এখন তো ফেলতে পারিস না—'

'ওই ফেলেই দেব একদিন পুকুরের জলে—'

যেন সুখী কেঁদে ফেলল, গলাটা কাঁপছিল, সঙ্গে সঙ্গে মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিল। 'ইচ্ছা করছিল শয়তানের বাচ্চাকে শয়তানের কাছে রেখে আসি—আমার কোন্ দায় এই বোঝা ঘাড়ে নেবার?'

মুবারির ঘোলা চোখ চকচক কবে উঠল।

সীতাংশু ঘাড় হেলিয়ে গাছের পাতা দেখল। মাধব হাত বাড়িয়ে দিদির কোল থেকে খরগোসের বাচ্চাটাকে নিজের কাছে টেনে নিল। সুখীর অন্য হাতে ধরা ঘাসের আঁটিটা মাটিতে পড়ে গেল। মাধব সেটাও কুড়িয়ে নিল।

কেউ কথা বলছিল না।

জঙ্গলের ভেতর গাছ কাটার শব্দ হচ্ছিল।

সীতাংশুর মতন মুরারিও যেন কান খাড়া করে শব্দটা শুনল। তারপর সীতাংশুর দিকে চোখ ফেরাল।

'ওরা সব এসে গেছে বাবু।'

'হুঁ।' সীতাংশু ঘাড়টা একটু কাত করল। 'ইয়াসীন লক্ষ্মণ জনার্দন—সবাই এসেছে, আনন্দকে তো দেখলাম না?'

'ওর মেয়েটার জ্বর বাবু, কাল বলছিল, আজ বোধ করি তার কাজে আসা হবে না।'

সীতাংশু কথা বলল না।

'ইদিক-ওদিক জ্বরজ্বালা মন্দ হচ্ছে না।' কথাটা বলে মুবারি আড়চোখে মেয়েকে দেখল। সুখী এবার হাঁটতে আরম্ভ করেছে। বাড়ির রাস্তাই ধরেছে। সীতাংশুও এক পলক তাকিয়ে দেখল। মুরারি মুখটা ফিরিয়ে আনল। 'তেমন আর কী বয়স হয়েছে বাবু, মনটা এখনও একেবারে ছেলেমানুষের মত। সকাল হতে ভায়ের সঙ্গে খরগোসের বাচ্চা দেখতে চলে এল।'

'তা তো বটেই।' সীতাংশু মাথা নাড়ল। কাল রাত্রেও যে তার মেয়ে ছোট ভাইয়েব সঙ্গে জঙ্গলে খরগোসের বাচ্চা ধরতে ছুটে গিয়েছিল মুবাবিকে আর তা এখন বলল না সে। বলল, 'এসেই ভাইবোনে মিলে বাচ্চাটা কোথায় থাকবে কী খাবে কোথায় খেলা করবে, সব তদারক করছিল।'

'ঐ তো বললাম, ওদিকে নিজেব বাচ্চা কাঁদছে।' মুরারি গলার নিচে একটু হাসল, সঙ্গে সঙ্গে মুখটা গম্ভীর করে ফেলল। 'এক ফোঁটা মেয়ে আমার, আজো কিনা সাঁঝবাতি লাগলে একলা ঘর থেকে বেরোতে সাহস পায় না, আব এমন দুধের মেয়ের কপালটা এমন করে ভেঙে দিল শয়তান।' হাতের পিঠ দিয়ে চোখটা মুছল বুড়ো। 'ওই শয়তানের কথা মনে পড়লে আমার মেয়ের বুকে আগুন জ্বলে ওঠে; তখন পেটের সন্তানটাকেও যেন সহ্য করতে পারে না। কাল রাত্রেও শুনলাম, ঐটুকুন দুধের শিশুকে ধমকাচ্ছে গালিগালাজ করছে, যেন কিল চড় মারতে বাকি থাকে শুধু।'

'না, ঐটুকুন শিশুর আর কী দোষ—ওর বাপের ওপর রেগে গিয়ে এ রকম করে তোমার মেয়ে।' সীতাংশুও মুখটা গম্ভীর করে ফেলল।

'মেয়ে কাল আমায় বলছিল, বাবা আমি যদি আমার একটা মুখ নিয়ে তোমার ঘাড়ে এসে পড়তাম দুঃখু ছিল না, আর একটাকে

সঙ্গে নিয়ে এসে তোমায় মুস্কিলে ফেললাম—এখন এটার দুধের খরচ জোগায় কে।'

'তুই কী বললি তার উত্তরে?' যেন সীতাংশুর কৌতূহল হলো, এই মাগ্‌গীর বাজার, এই আয় মুরারির, চারটে মানুষের তাতে রুটি জোগাড় করতে হিমসিম খেয়ে যাবে। কাল রাত্রে জঙ্গলে ওল তুলতে এসে সীতাংশুকে বলছিল না সব? তাই তো, বুড়ো এখন নাতির দুধ জোগাড় করবে কেমন করে? এত বড় একটা বাড়তি খরচ?

এই ব্যাপারে মুরারির কিছু করবার নেই। ঘোলাটে চোখ দুটো সীতাংশুর মুখের ওপর মেলে ধরে অসহায়ের মতন শুধু হাসল। তারপর আকাশের দিকে আঙুল তুলে দিল।

'তবে কিনা আশা আছে, যা হোক করে জোগাড় হয়ে যাবে। সব কথা এক সঙ্গে চিন্তা করি না—করতে গেলে যে পাগল হয়ে যাব, তাই না বাবু?'

সীতাংশু বিড়বিড় করে কিছু একটা বলল।

একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে মুরারি বলল, 'হুঁ, আশা ছাড়তে নেই এই জন্যে বাবু, জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেন তিনি—তাই মেয়েকে বললাম, বাচ্চার দুধের জন্য তোকে ভাবতে হবে না, আমরা সবাই যদি এক মুঠো করে খেয়ে বাঁচি, তোর বাচ্চাও এক ফোঁটা করে দুধ পাবে, বাচ্চা কিছু উপোস থাকবে না।'

সীতাংশু অবাক হয়ে বুড়োকে দেখল। এই দিনেও ঈশ্বরের ওপর অগাধ বিশ্বাস! গণ্ডায় গণ্ডায় লোক উপোস থাকছে চোখের ওপর দেখেও? লোকটার মনের জোর আছে বৈকি। জীব দিয়েছেন যিনি আহার জোগাবেন তিনি। যেন মুরারির কথার পুনরুক্তি করতে সীতাংশু ঠোঁটটা দু'বার নাড়ল।

'চলি, বেলা হলো বাবু, আমি না গেলে ইয়াসীন লক্ষ্মণ ঠিক বসে থাকবে, করাতে হাত লাগাবে না।'

করাতের কাজ অবশ্য আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। ওদিক থেকে

একটা ঘসঘস শব্দ সীতাংশুর কানে আসছিল। তা হলেও বুড়োর সেখানে উপস্থিত থাকা দরকার। বুড়ো না থাকলে ওরা কাজে ফাঁকি দেয়, সীতাংশু জানত।

'কিন্তু তোর সঙ্গে একটা দরকারী কথা ছিল যে।'

'বলুন, এখন বলবেন বাবু? না, দুপুরে জলখাবার টাইমে একবার আসব?'

'আচ্ছা, তাই আসিস।' সীতাংশু ঘাড় কাত করল। কাজ ফেলে রাখতে চাইছে না বুড়ো। লম্বা পা ফেলে করাতঘরের দিকে চলে গেল সীতাংশুর হেড্-করাতী। বিশ্বাসী মানুষ। কিন্তু তেঁতুল-তলার ছায়া-ঢাকা পথে বুড়োকে চলে যেতে দেখে সীতাংশু আর একবার কথাটা চিন্তা করল।

'বাবু!'

সীতাংশু ঘুরে দাঁড়াল। মাধব। খরগোসের বাচ্চাটাকে কাঁধে তুলে নিয়ে হাসছে। দু-হাত শূন্যে ছড়িয়ে দিয়েছে সে। যেন সার্কাসের খেলা দেখাচ্ছে।

তার কাণ্ড দেখে সীতাংশুও হাসল। খরগোসের বাচ্চাটা খুবই ভয় পেয়েছে বোঝা যাচ্ছিল। কালো চোখ দুটো বড় করে দু' কান খাড়া করে এমন তটস্থ হয়ে মাধবের কাঁধ চেপে ধরেছে বেচারা! দেখে সীতাংশুর মায়া হলো।

'তা এটার কী নাম রাখবি ঠিক করেছিস কিছু?'

মাধব ঘাড় নাড়ল।

'কাল রাত্রেই আমরা নাম ঠিক করে ফেলেছি।'

'আমরা' বলতে সীতাংশু একটু থমকে গেল। আগের বাচ্চাটার যখন নাম রাখা হয়, তখন মাধব ও সীতাংশু এক সঙ্গে বসে পাঁচটা নাম নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করেছিল। অর্থাৎ কোনোটাই তাদের মনঃপূত হচ্ছিল না। অনেক বাছাবাছির পর একটা নাম দু'জনের মনে ধরে যায়। তাই তো, রঙের সঙ্গে চেহারার সঙ্গে, এমন কি

স্বভাবের সঙ্গে যাতে মিল থাকে এমন নাম রাখতে হবে। তা না হলে নাম রেখে সুখ নেই, এবং সেই নাম ধরে ডেকেও আরাম নেই। বেশ বাবুমতন মেজাজ ছিল আগের বাচ্চাটার এবং রংটাও ধবধবে ছিল। তাই দু'জনে মিলে নাম দিয়েছিল 'ধলা'।

'এটার কী নাম রাখল?' মাধবের চোখের দিকে তাকিয়ে ছিল সীতাংশু। কাঁধ থেকে নামিয়ে বাচ্চাটাকে আবার কোলে নিল মাধব। তারপর একগাল হাসল।

'দিদি দিয়েছে নামটা। কালা।'

'তা বেশ তো।' সীতাংশু এবার বুঝল 'আমরা' বলতে মাধব আজ আবার কোন্ মানুষটির কথা বলছে। 'সুন্দর নাম হয়েছে। রংটা যখন ময়লা, ওই নামেই আমরা ডাকব।' মাধবের চোখে চোখ রেখে সে হাসল।

'দিদি বলছিল আপনার পছন্দ না হলে অন্য নাম রাখা হবে।'

'কিচ্ছু দরকার নেই, চমৎকার নাম। ধলা মরে গেছে। কালা এসে তার অভাব পূরণ করল।'

মাধব খুশি হলো। সীতাংশু সেখানেই থামল না।

'তোর দিদিকে বলবি, আমার খুব পছন্দ হয়েছে নামটা।'

মাধব ঘাড় নাড়ল। এবং খুশির আতিশয্যে ঘাড় নুইয়ে কালার মুখে চুমু খেল।

'এখন তো আমাকে চাঁপাডাঙার হাটে চলে যেতে হয়।'

'কেন!' সীতাংশু একটু অবাক হলো। তারপর যেন তার হাটে যাওয়ার কারণটা বুঝল। ঘাড় নেড়ে বলল, 'উহুঁ, আর মোমবাতি এনে দরকার নেই—ধলার কবরে আর বাতি দেওয়া হবে না। আজ থেকে আমরা ধলার কথা ভুলে গেছি। আমরা কালাকে পেয়েছি। তাকে নিয়ে সারাক্ষণ আনন্দে কাটাব।'

এবার মাধব শব্দ করে হাসল।

'কালার জন্যই তো চাঁপাডাঙা যাচ্ছি। তার গলার বেল্ট নেই ঘুঙুর নেই।'

'তা বটে।' সীতাংশু লজ্জা পেল। 'হুঁ, বেল্ট ঘুঙুর সবই আনতে হবে।'

'একটিন বিস্কুট। দিদি বলছিল আসানসোলে এক ভদ্রলোকের একটা খরগোস ছিল, কুড়মুড় করে বিস্কুট খেত।'

শুনে সীতাংশু আমোদ পেল।

'তাই নাকি, তবে তো একটিন বিস্কুটও আনতে হয়। কখন যাবি?'

'এখন চলে গেলে দুপুরের আগেই ফিরে আসা যায়।'

'আচ্ছা ঠিক আছে, টাকা নিয়ে যা।' সীতাংশু পকেট থেকে মনিব্যাগ তুলল। 'বেল্ট-এর রংটা যেন সুন্দর হয়, পছন্দ করে আনবি।'

'সাদা বেল্ট হবে।' যেন উত্তরটা মুখে নিয়ে তৈরি হয়ে ছিল মাধব। 'দিদি বলে দিয়েছে, আর কোনো রং মানাবে না কালার গলায়।'

'তা বটে।' সীতাংশু মাথা নাড়ল। 'ধলার গলায় আমরা কালো বেল্ট পরিয়েছিলাম।'

'এবার সাদা বেল্ট হবে, তার সঙ্গে কালো রঙের ঘুঙুর বেঁধে দেওয়া হবে।' উত্তেজনায় মাধবের চোখ বড় হয়ে উঠল। 'চমৎকার দেখাবে।'

এটাও যে তার দিদির পছন্দ সীতাংশুর বুঝতে কষ্ট হলো না। হেসে বলল, 'ধলার কালো বেল্ট-এর গায়ে আমরা লাল ঘুঙুরের ছড়া বেঁধে দিয়েছিলাম।'

'ধলার কথা যেন আমার আর মনেই পড়ছে না।' মাধব হি-হি করে হাসল। 'ধলা নেই বলে একটুও কষ্ট হচ্ছে না। কালাকে পেয়ে সব ভুলে গেছি।'

ফ্যালফ্যাল করে সীতাংশু কিশোরের মুখটা দেখল, তারপর

একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল। তাই হয়। একটি এসে গেলে আর-একটির কথা মনে থাকে না। বিচ্ছেদ-বেদনা ফিকে হয়ে যায়। এইমাত্র তার মুখ থেকেই তো কথাটা বেরোল। ধলার কবরে আর বাতি দেওয়া হবে না। কালাকে পেয়ে সারাক্ষণ আনন্দে কাটবে।

বাচ্চাটাকে খাঁচায় পুরে রেখে মাধব যখন নতুন বেল্ট ঘুঙুর আনতে নাচতে নাচতে চাঁপাডাঙার পথে ছুটে গেল, তার মনে হলো, ইচ্ছা করে ঐটুকুন ছেলেকে সে নিষ্ঠুব করে তুলল। তা না হলে আগের বাচ্চাটার কথা মনে করে আজও কিশোরের চোখ দুটো ছলছল করে উঠত।

'বাক্সটা' ওপাশে সরিয়ে রাখলে ভাল হয়।'

'কেন, ভাল হবে কেন?'

'এদিকটা ফাঁকা হয়ে যাবে। জায়গাটা সুন্দর দেখাবে—অথচ জিনিসটিও ঠিক জায়গায় রাখা হলো।'

ব্যবস্থাটা সীতাংশুর মনঃপূত হলো। খুশি হয়ে বলল, 'তবে তাই কর, ওদিকেই ওটা সরিয়ে রাখ।'

'আর বিছানাটা এমন মাঝঘরে না রেখে জানালার কাছে টেনে নিতে হবে।' সুখী বিছানার কাছে সরে গেল।

সীতাংশু জানালায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। এবাব সে তার পিছনটা দেখল। অনেক চুল মাথায়। কোমর ছাড়িয়ে গেছে। মাধবের দিদি এভাবে চুল এলো করে রেখেছে কেন, এক সেকেণ্ড চিন্তা করল সে। সম্ভবত ভিজে চুল। চিকচিক করছে। নিশ্চয় স্নান করে এসেছে। কে জানে, হয়তো চুল বাঁধছিল, তারপর মুরারির কথা শুনে চুল বাঁধবার আগেই সীতাংশুর ঘর ঝাঁট দিতে ছুটে এসেছে।

কথাটা চিন্তা করে সীতাংশুর কেমন কষ্ট হলো মনে।

তাইতো, চুলটা বেঁধে এলে তেমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত না। ওবেলা আসতে পারত, কাল এসে ঘর বারান্দা ঝাঁট দিলেও সীতাংশু অসুখী হতো না। এমন কি আরও দুদিন অপেক্ষা করতে পারত সে।

দিনের পর দিন তার ঘর বারান্দায় ধুলো জঞ্জাল তো জমছিলই। এই জন্য তার মনে তিলমাত্র ক্ষোভ ছিল না। কথায় কথায় কাল সে মুরারিকে বলেছিল। হুঁ, যদি সুখী তার ঘরটা একটু ঝাঁট দিয়ে দেয়, জিনিসপত্র এলোমেলো হয়ে থাকে, সেগুলি একটু গুছিয়ে রাখবে, আর দুবেলা পাতকুয়ো থেকে দু' বালতি জল তুলে দেবে—হাতে অন্য কাজকর্ম থাকে সীতাংশুর, এদিকটায় তেমন মন দিতে পারে না, আবার বাইরের একটা লোক রাখবে তা-ও সে ভরসা পায় না। চুরি করে পালিয়ে গেলে তার কিছু করবার থাকে না।

মুরারি কেবল খুশি হয়েছিল বললে ভুল হবে। হাতে চাঁদ পেয়েছিল। একটু আগে আঙুল তুলে সে আকাশ দেখিয়েছিল। ঈশ্বরের কথা বলেছিল। জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি। কথাটা বলেছিল সে সকালবেলা; আর ঠিক দুপুরে, কারখানার জলখাবার টাইমে সীতংশু তাকে প্রস্তাবটা দিল। বাইরের লোক রাখতে হলেও তো সীতাংশুকে টাকা দিতে হতো, সেটা না হয় মুরারির মেয়েই পেল। তার কোলে বাচ্চা আছে, দুধের একটা বাড়তি খরচ আছে।

যেন স্বয়ং ঈশ্বর মুরারির সামনে দাঁড়িয়ে এত বড় একটা সমস্যার সমাধান করে দিল।

বাবু নিজে থেকে সুখীর একটা ব্যবস্থা করে দিলেন। কেননা শুধু দুধের খরচ না, বাবুর একলা সংসার, সামান্য এই ক'টা কাজের জন্যে সুখীকে যে টাকাটা তিনি দিতে চাইছেন, তাতে যে সুখীর

খাওয়া খরচও একরকম কুলিয়ে যায়। যেন তখুনি টাকার অঙ্কটা শুনে মুরারি থতমত খেল। তারপর জোরে মাথা ঝাঁকাল।

'উঁহু, কেবল ঘর ঝাড়া-পোঁছা জল তোলা কেন, হুবেলা হুটো অন্নও ফুটিয়ে দিতে পারবে মেয়ে।'

'না না, তার দরকার হবে না।' সীতাংশু আপত্তি তুলতে গিয়েছিল। মুরারি গ্রাহ্য করে নি।

'বাবুর যেমন কথা। বলে কি না ঘরের কাজ বলতে ওই উনানের ঝকমারিটাই তো হলো আসল। খামকা গুনে গুনে এত ক'টা টাকা দেবেন, আর ওদিকে কিনা হাত পুড়িয়ে ধোঁয়া গিলে নিজের হাতে রেঁধে খাবেন ; কেন এত কষ্ট করবেন বাবু, আমি তো চোখে দেখি কী আপনার খাওয়া হয়—উঁহু এমন করলে দেহ টিকবে কেন।'

সীতাংশু আর কথা বলে নি। মনে মনে ভাবল, বরং ভালই হবে তা হলে, সুখীর মাইনে বাবদ আরো হু' পাঁচ টাকা বেশি দেওয়া যাবে। তা হলে মেয়েটার খাওয়া-পরা এবং বাচ্চার হুধের খরচের জন্য মুরারিকে একেবারেই ভাবতে হবে না। হুঁ, তারই তো কর্মচারী, বুড়ো হয়েছে, তা ছাড়া বড় সরল বড় নিরীহ—এমন লোককে যদি সাহায্য না করে সীতাংশু তো কাকে করবে। বলতে কি, সুখীকে তার ঘরে কাজ করতে দিয়ে সীতাংশু রীতিমত একটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করল। গরীব মানুষ—এই বিপদে মুরারিকে এভাবে সে সাহায্য করতে পারল।

'হুঁ, কি বলছিলে।' সীতাংশু বিছানার কাছে গিয়ে দাঁড়াল, এবার সে সুখীর মুখোমুখি হলো। 'জানালার কাছে তক্তপোষটা টেনে নিলে ঘরের ভেতরের চেহারাটা আর একটু ভাল দেখাবে, এই তো ?'

সুখী তার চোখের দিকে তাকাল না। তক্তপোষের ওপর বিছানো ময়লা তোষক বালিশের ওপর চোখ রেখে থুতনিটা একটু নাড়ল।

'তবে তাই করা যাক, উঁহু, তুমি পারবে না। দাঁড়াও, ওদের কাউকে ডেকে দি, তক্তপোষটা টেনে দেবে।'

'ওদের দরকার হবে না। হালকা চৌকি। আপনি ওদিকটা ধরুন, আমি এদিকটা ধরছি।' হাত থেকে ঝাঁটাটা নামিয়ে রেখে সুখী কোমরে আঁচল জড়িয়ে নিল। সীতাংশু জামার হাতা গুটিয়ে নিল। এবং দেখা গেল, কাজটা যত কঠিন মনে করেছিল সে, মোটেই তা নয়। খুবই হালকা জিনিস। তাই তো হবে, যেমন তেমন করে আমকাঠ দিয়ে একটা তক্তপোষ তৈরি করে নিয়েছে সে, আর ঐ তো একটা পাতলা তোষক, আর এইটুকুন দুটো বালিশ। তা-ও এখন ঠাণ্ডা পড়েছে বলে। তা না হলে, বাইরে একটা দড়ির খাটিয়া পাতা আছে, গরমটা সে ওখানে শুয়েই কাটিয়ে দিয়েছে।

'ওফ্, কী নোংরা হয়েছে চাদর বালিশ।'

সুখী বিড়বিড় করে উঠল। অস্পষ্ট হলেও সীতাংশু কথাটা শুনল। শব্দ করল না। জানালার কাছে তক্তপোষ সরান হয়েছে। মাধবের দিদি যেমন চেয়েছিল। সীতাংশু ভাবল, বিছানার হাঙ্গামা এখানেই চুকল। কিন্তু দেখল, তা নয়। ক্ষিপ্র হাতে যুবতী টেনে টেনে বালিশের ওয়াড় খুলে ফেলছে, চাদরটা গুটিয়ে নিয়ে মেঝেয় ছুঁড়ে ফেলছে, ঝাড়ন দিয়ে তোষকের ধুলো ঝাড়ছে, এবং এক ফাঁকে ছুটে গিয়ে বালিশ দুটো রৌদ্রে ঘাসের ওপর রেখে এল।

মেয়েটির নাকের ডগা কুঁচকে আছে দেখে সীতাংশু কৌতুকবোধ করল। নিজের মনে হাসল। হুঁ, চিরকালই সে জামাকাপড়ে বাবু ছিল। বিছানাটিও ধবধব করত। তার ঘরে এক ফোঁটা ময়লা জমতে পারত না। সেটা তার কলকাতার জীবনে। যখন মেসে ছিল। তার বন্ধু রণধীর দেখেছে। আজ জঙ্গলে এসে তার সবই বদলে গেছে। অথচ সে একটা কারখানার মালিক, লোকজন খাটাচ্ছে। তাই বোধ করি মাধবের দিদি বিস্মিত হয়েছে। ভদ্রলোক এমন নোংরা হয়ে থাকতে ভালবাসে কেন, যুবতী নিশ্চয়ই ভেবে কূলকিনারা

পাচ্ছে না। তার বাবার মনিব। মুখ ফুটে কিছু বলতেও পারছে না, আবার ভিতরের বিরক্তি ও ঘেন্নাটাও যেন চেপে রাখতে পারছে না।

মানুষটির মনের অবস্থা কল্পনা করে সীতাংশু কৌতুকবোধ করল ও মনে মনে হাসল।

'একেবারে সময় পাচ্ছি না। সোডা সাবান দিয়ে সেদ্ধ করে যে সব কেচেটেচে দেব—' কতকটা যেন নিজের মনে বলতে আরম্ভ করেছিল সে।

মাধবের দিদি তার দিকে চোখ তুলল।

'আমি কেচেটেচে সব পরিষ্কার করে দেব। আগে তো ঘরটা গুছিয়ে নি। সবই এমন এলোমেলো হয়ে আছে।'

'আমি এলোমেলো হয়ে থাকব, নোংরা ও ময়লার মধ্যে থাকতে পছন্দ করি।' চট করে যেন আজ সীতাংশুর মুখ দিয়ে উত্তরটা বেরোল না, যেমন রণধীর এসে তার ঘরদরজা জামাকাপড় বিছানাপাটি দেখে নাক সিঁটকাতে আরম্ভ করলেই সরাসরি বন্ধুকে সে শুনিয়ে দিতে পেরেছে।

'আপনি একটু বাইরে যান। ভীষণ ধুলো উড়ছে।' সুখী ঘর ঝাঁট দিচ্ছিল।

সীতাংশু আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

ঘাসের ওপর মাধব খরগোসের বাচ্চাটাকে নিয়ে খেলছিল। নতুন বেল্ট কিনে আনা হয়েছে, সঙ্গে ঘুঙুর এসেছে। সাদা বেল্ট কালো ঘুঙুর। কালার গলায় চমৎকার মানিয়েছে। হলদে রোদ উঠেছে। সবুজ ঘাস ঝকঝক করছে। ওপাশটায় আমলকী গাছের নিচে রৌদ্র ও ছায়ার চিকরিকাটা আলপনা বোনা হয়েছে। মাধবের মাথায় উস্কখুস্ক লাল চুল। হাততালি দিচ্ছে সে। কালা ছুটে ছুটে চলে যাচ্ছে। যেন জঙ্গল তাকে ডাকছে। খেজুরগাছওয়ালা ঢিবিটা তাকে ডাকছে। মাধব পিছনে ছুটছে। পাঁজাকোলা করে কালাকে সেই বাসকঝোপের কাছ থেকে তুলে নিয়ে আসছে।

ছু' কান খাড়া করে দিয়ে বাচ্চাটা মাধবের মুখের দিকে তাকায়। চোখে ভয় বিস্ময়। মাধব তার মুখে চুমু খায়। তারপর কোল থেকে আবার ঘাসের ওপর নামিয়ে দেয়। হাততালি দেয়। এবার যেন কালা তেমন চট করে জঙ্গলের দিকে ছুটে যেতে পারে না। যেন কিসের বাঁধনে আটকা পড়ে গেল। ছুটতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। ঘাড় ঘুরিয়ে ভয় বিস্ময়-ভরা বড় বড় চোখ ছুটো তুলে উস্কখুস্ক লাল চুলে ছাওয়া মাথাটা দেখে, হাসিমাখা কচি মুখটা দেখে। যেন তখন কিছুতেই আর বাসকঝোপটার দিকে এগোতে পারে না। ওদিকে ছুটে না গিয়ে এখানেও যে ফিরে আসবে, হাততালি দিয়ে শিস দিয়ে ছোট মানুষটা বার বার তাকে ডাকছে, তা-ও যেন হয় না। যেন দোটানায় পড়ে গিয়ে বনের পশুশাবক থুতনি তুলে আকাশ দেখে গাছের পাতা দেখে পাখি দেখে। ভালবাসার টান। ছুদিকে টান থাকলে অবস্থাটা তাই দাঁড়ায় নাকি। কোনোদিকে যাওয়া হয় না। মাঝখানে দাঁড়িয়ে থেকে আকাশ দেখতে হয়। সীতাংশু দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

ছবিটা মনে দাগ কেটে থাকার মতন। মাধবের দিকে চোখ ফিরিয়ে সে ঈষৎ হাসল। ঘাড়টাও নাড়ল। অর্থাৎ কালাকে পোষ মানাবার জন্য মাধব যেমন অক্লান্ত পরিশ্রম করছে তাতে শীগ্‌গিরই যে সে সফল হবে, হেসে ঘাড় নেড়ে আকারে ইঙ্গিতে সীতাংশু তাই তাকে জানিয়ে দিয়ে গেল। সীতাংশু করাতীদের কাজ দেখতে চলে গেল।

ছোট কারখানা। সীতাংশু একলা এটা গড়ে তুলেছে। সে মালিক ম্যানেজার, আবার হিসাবপত্রও তাকেই দেখতে হয়। জনদশেক করাতী, আধ ডজন মিস্ত্রী, আর ওদিকে জঙ্গলে কাঠ কাটার জন্য রয়েছে দশ-বারোজন কাঠুরিয়া। ছোটখাটো জঙ্গল বন্দোবস্ত নিয়েছে সীতাংশু, কাজেই খুব বেশি লোকের দরকার

হয় না। কাঠ ওঠানো নামানো এবং আর পাঁচটা মেহনতি কাজ করার জন্য আছে বারো-চোদ্দজন কুলি। আর আছে তার ট্রাক ড্রাইভার, ক্লীনার এবং বনের গাছপালা পাহারা দেওয়া তদারক করার জন্য রয়েছে তিনজন মালী এবং দুটি দারোয়ান। দারোয়ানদের কারখানা এবং কাঠগুদামটাও দেখতে হয়।

সকলেই সকলের পরিচিত, নামধাম জানে ঘরবাড়ি চেনে। একজন যদি দৈবাৎ কাজে না আসে আর পাঁচজন তার খোঁজ করে, কুশলবার্তা জানতে চেষ্টা করে। মোটের ওপর সকলের মধ্যেই একটা চমৎকার সদ্ভাব রয়েছে। এই জন্য সীতাংশু সুখী। যেন একটা সুখী পরিবার গড়ে তুলেছে সে টিয়াটুলির এই জঙ্গলে। সকলকেই সে মোটামুটি বিশ্বাস করে, ভালবাসে। তাদের অভাব-অভিযোগ থাকলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মেটাতে চেষ্টা করে। কাজেই তারাও তাদের বাবুর ওপর সন্তুষ্ট।

তার যা সুফল, একটা আঁটোসাঁটো, পরিবেশ ও শৃঙ্খলার মধ্যে এখানে সারাদিন কাজ হয়, কাজ শেষ করে কুলি করাতী কাঠুরিয়ারা একটা হৈ-হৈ আনন্দ নিয়ে যে যার গাঁয়ে ঘরে ফিরে যায়। পরদিন সূর্য উঠতে আবার এসে কাজে লাগে।

খুব শান্তিতে আছে সীতাংশু। তা না হলে কলকাতার ছোট বড় কত সব কারখানার দৃশ্য তার আজও মনে পড়ে। স্ট্রাইক লক-আউট বিক্ষোভ, কত কি ব্যাপার। নিত্য-নতুন অসন্তোষ আক্রোশ ধূমায়িত হচ্ছে, আর দুদিন পর পর দাউ দাউ করে আগুনও জ্বলছে। কেবল কলকাতা কেন, এখানেও তো রণধীরের মুখে শোনা যায়, এই চা-বাগানে ওই চা-বাগানে কুলিরা কর্মচারীরা কথায় কথায় কাজ বন্ধ করছে, তাদের অভাব-অভিযোগ নিয়ে নানারকম আওয়াজ তুলছে, সভা ডাকছে, মিছিল বার করছে।

টিয়াটুলির জঙ্গলে সে সব অশান্তির ঢেউ আজও এসে লাগে নি।

কোনোদিন যে লাগবে না ততটা আশাবাদী অবশ্য সে নয়।

অল্পপরিসর নিয়ে তার বাগান। কারখানাও ছোট, সামান্য ক'টি লোক নিয়ে তার কারবার। সবটা জিনিসই সে, বলতে গেলে, একরকম হাতের মুঠোয় ধরে রাখতে পারছে, সারাক্ষণ চোখের সামনে নেড়েচেড়ে দেখছে, কোথাও একটু গ্লানি ময়লা, বিন্দুমাত্র ক্ষোভের আভাস জমে উঠছে টের পেলে তৎক্ষণাৎ ঘষেমেজে সেটা সাফ করে দিচ্ছে।

কাজেই আজও টিয়াটুলির জঙ্গলে পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে বোতামটি হয়ে আছে তার এই ছোটখাট প্রতিষ্ঠানটি। এই জন্য অনেকেই তাকে প্রশংসা করে ঈর্ষাও করে। রণধীর ঈর্ষা প্রশংসা দুটোই করে। তার বক্তব্য, নিজের পোষাক-আসাক চালচলন সাদাসিধে রেখে সীতাংশু বুদ্ধিমানের কাজই করেছে। সে যদি দুবেলা রাজভোগ খেত কথায় কথায় গাড়ি চড়ে বেড়াত, জমকালো বাংলো তৈরি করে সেখানে বাস করত তো তার কুলি করাতী কাঠুরিয়াদের চোখ টাটাত, দুদিনেই নিজেদের অবস্থার দিকে তাকিয়ে তারা তিতিবিরক্ত হয়ে উঠত, ফলে বিক্ষোভ আওয়াজ কাজ বন্ধ—অনেক কিছুই সীতাংশুকে দেখতে হতো শুনতে হতো।

বন্ধুর এই উক্তি সীতাংশু নীরবে সহ্য করেছে—এটা যে রণধীরের একরোখা মন্তব্য তা সে তাকে মোটেই বোঝাতে চেষ্টা করত না, শুনে হেসেছে চুপ করে থেকেছে। কেননা আর একটা চোখ খোলা রেখে রণধীর যদি সব দেখত চিন্তা করত তো তার থাকা খাওয়া পোষাক পরিচ্ছদ নিয়ে বন্ধু তাকে এভাবে খোঁচা দিত না।

সীতাংশু স্বীকার করে তার করাতী কাঠুরিয়ারা জঙ্গলের এই গাছগুলির মতন নীরব নিরীহ, কুলি মিস্ত্রীরা সরল শান্ত। হুঁ, এখন পর্যন্ত সে তাই দেখছে এবং তাদের সারল্য ও শান্তভাব যাতে নষ্ট না হয় তার জন্য সীতাংশুকে কম সতর্ক থাকতে হয় না। নতুন কারখানা। এর লাভলোকসানের খবর রণধীর রাখে না। সীতাংশুও বলে না। তার কর্মচারীদের জন্য সে কত ব্যয় করছে, নিজের জন্য

কত রাখছে সে সব হিসাব যদি রণধীর জানতে চাইত, সীতাংশু নিশ্চয় তাকে বলত, তার আয়ব্যয়ের হিসাবের খাতাটা খুলে বন্ধুকে দেখাত।

কিন্তু রণধীর বুদ্ধিমান। ভুল করেও কোনোদিন সীতাংশুর হিসাবের খাতায় উঁকি দেবে না। কেননা তা হলে টিয়াটুলির এই জঙ্গলের কারখানার আজও এমন শৃঙ্খলার সঙ্গে কাজকর্ম চলছে কেন বা কারখানার মালিকটির এই দৈন্যদশা কেন এই নিয়ে আর পাঁচজনের ঈর্ষা সন্দেহ তো আছেই, রণধীরের পক্ষে ঠাট্টা-রসিকতা করা অসুবিধা হতো। চতুর রণধীব জেনেশুনে সেই অসুবিধায় পা বাড়াত কোন্ দুঃখে।

যাই হোক, বন্ধুর এই ঠাট্টা-রসিকতা নিয়ে সীতাংশু মাথা ঘামায় না। অপরের সন্দেহ ঈর্ষাও সে গ্রাহ্য করে না। সে জানে সে সুখী, কেননা তার কর্মচারীরা সুখী। সে রাজভোগ খেতে চায় না, সাজান-গোছান চমৎকার বাংলোয় থাকতে চায় না, মোটা ভাত খেয়ে মোটা কাপড় পরে তার করাতীরা হৈ-হৈ করে করাত চালায়, কাঠুরিয়ারা কাঠ কাটে, কুলিরা মোট বয়ে আনে। কাজ শেষ করে গান গেয়ে তারা ঘরে ফেরে। যেন এই সাদাসিধে জীবন তারও কাম্য। আড়ম্বর থাকবে না, চাকচিক্য থাকবে না। বাইরের জাঁকজমক এখানে অশোভন ঠেকবে।

যেমন জঙ্গলের একটা গাছকে সে ভালবাসে তেমনি একটা করাতীকে কাঠুরিয়াকে কি একটি কুলিকেও ভালবাসে। তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে সে একাত্ম হয়ে থাকতে চায়। কোনরকম ব্যবধান রেখে চলতে তার লজ্জা করে। তারা জলখাবার টাইমে ভুট্টা খায় চালভাজা খায়। সীতাংশুও তাই খায়। তাদের মতন তার ময়লা বেশভূষা মাটির ঘর। এইজন্য রণধীরের চোখে সে 'জংলী'।

তবু যদি ডাক্তার শুধু এই বলেই ক্ষান্ত হতো! কিন্তু ক্ষান্ত থাকে না, এর সঙ্গে আরও অনেক কিছু যোগ করে রণধীর। এটা সীতাংশুর

চাতুরী, তার কারখানা তার ব্যবসা চালু রাখার একটা কৌশল মাত্র। গরীব সেজে থেকে গরীব কুলি কাঠুরিয়াদের ভুলিয়ে রাখা। তোমরা যেমন, আমিও তেমন। অতিরিক্ত তোমাদের কিছু দেবার নেই।

অবশ্য হাসতে হাসতেই বন্ধু এসব বলে।

তার সঙ্গে সীতাংশুও হাসে। হাসে, কিন্তু দুঃখ পায়।

না কি রণধীরের মুখে এসব শুনেই রাণীরবাগের আর একটি মানুষের কৌতূহল হয়েছে টিয়াটুলির জঙ্গল দেখতে?

কাল কথাটা একবারও তার মনে পড়ে নি। এখন মনে পড়ল। করাতঘরের কাজ দেখে সেখান থেকে বেরিয়ে সীতাংশু বড় জামগাছটার নিচে এসে দাঁড়াল। জঙ্গলের ভিতর খুপ্ খুপ্ শব্দ হচ্ছে। কাঠুরিয়ারা কাঠ কাটছে। অলস দুপুর গড়িয়ে গড়িয়ে টুকটুকে কমলা রং ধরেছে। ডাক্তার-গিন্নীর আদুরে চোখ দুটো সীতাংশুর মনে পড়ল। আদুরে গলার স্বর। 'শোন, আমি একদিন টিয়াটুলির জঙ্গল দেখতে যাব, কবে নিয়ে যাবে বলো।'

ছবিটা মনোরম ছিল সন্দেহ কি।

সীতাংশু মনে মনে হাসল। টিয়াটুলির এই জঙ্গলে ভান বেশি কৃত্রিমতা বেশি, না কি রাণীরবাগের সেই ছিমছাম সাজান ঘরে?

'বাবু!'

'কি—রে!' সীতাংশু ঘাড় ফেরাল।

মাধবের চোখে-মুখে উত্তেজনা। মুখটা লাল, যেন অনেক ছুটোছুটি করেছে। লাল জুল্‌পি বেয়ে টপ-টপ ঘাম ঝরছে। দ্রুত শ্বাস পড়ছে। 'কোথায় গিয়েছিলি?' সীতাংশু তার চোখ দুটো দেখল। 'কালা কোথায়?' খরগোসের বাচ্চাটাকে দেখতে না পেয়ে সে চিন্তিত হলো।

'জঙ্গলে ছেড়ে দিয়েছি।' মাধব ফিক্ করে হাসল।

'তার মানে!' সীতাংশু বিস্মিত হলো, 'ছেড়ে দিয়ে এলি কেন, ওটাকে আর রাখবি না?'

'রাখব না মানে?' সীতাংশুর কথায় মাধব কৌতূহল বোধ করল। 'পোষ মেনে গেছে, হি-হি।' লালচুল ভর্তি মাথাটা ঝাঁকাতে লাগল সে।

এর মধ্যেই পোষ মানল! সীতাংশু অবাক। 'কতদূর ছেড়ে দিয়ে এলি?'

'ওই নালার ধারে, পলাশবনের কাছে।'

'তারপর? আসবে কি করে?'

'ওই যে!' মাধব আঙুল তুলে দেখাল। 'ঠিক এসে গেছে।'

সীতাংশু চোখ তুলে দেখল, তাই তো, ঘাসের জঙ্গল ঠেলে শুকনো পাতার ওপর দিয়ে কালা ছুটতে ছুটতে আসছে। সাদা বেল্ট-এর সঙ্গে আঁটা ঘুঙুর কাঁপছে, ঝুন ঝুন শব্দ হচ্ছে।

'কালাকে ওখানে রেখে আমি ছুটতে আরম্ভ করলাম। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম, ঠিক পেছনে পেছনে ও ছুটছে।' উত্তেজনার দরুণ মাধব ভাল করে কথা বলতে পারছিল না।

'তবে আর কি?' সীতাংশু বড় করে নিশ্বাস ফেলল। 'খুব সকাল সকাল পোষ মানল কালা।'

বাচ্চাটা ততক্ষণে মাধবের পায়ের কাছে এসে পড়েছে। মাধব তৎক্ষণাৎ ঝুঁকে পড়ে ওটাকে কোলে তুলে পাগলের মতন চুমু খেতে লাগল।

সীতাংশুর চোখে পলক পড়ে না। নিঃশব্দ হাসিমুখ ঝুলিয়ে কিশোরের কাণ্ড দেখে।

নিজের চোখ দুটোকে সে বিশ্বাস করতে পারছিল না।

ভিতরের চেহারাটা একেবারে পাল্টে গেছে। সীতাংশুর মনে

হলো, অন্ত কারো ঘরে বুঝি সে ঢুকে পড়ল। ঝকঝক করছে মেঝেটা। চৌকাঠের কাছে পাপোষ। টেবিলে চমৎকার ঢাকনা। ধবধব করছে বিছানা। পশ্চিমের জানালায় নীল পর্দা ঝুলছে।

সে পুরুষ। তার জানালায় পর্দার দরকার নেই। তবে কিনা শেষ বেলার রোদ ঠেকাতে পর্দার দরকার হতে পারে ভেবে ওদিকের দুটো জানালায় পর্দা খাটান হয়েছে।

মনে মনে সে হাসল। খুশি হলো কি! যেন একটু অস্বস্তিই লাগছিল তার। এত সাজান-গোছান—এত পরিচ্ছন্নতা আমার সহ্য হবে কেমন করে। ভাবল সে। বস্তুত একটা বেলার মধ্যে মাধবের দিদি যে তার এই ডেরার ভিতরটা স্বর্গপুরী করে তুলবে চোখে না দেখলে কে বিশ্বাস করবে।

বেশ পাকা হাত মেয়েটির। রুচি আছে, বুদ্ধিও আছে। আর তো ঘিঞ্জি ঠেকছে না ভিতরটা। এমন না যে বাক্সপেঁটরা খাট আলমারী কিছু ঘরের বাইরে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। সবই আছে। কিন্তু কী শৃঙ্খলা, কেমন সুন্দর করে সব গোছান-সাজান হয়েছে। যেখানে যেটি মানাবে। ছোট জায়গা। চলতে-ফিরতে সীতাংশুর কষ্ট হতো। কিন্তু এখন তার মনে হলো, নিশ্বাস ফেলে সে হাত-পা নাড়তে পারবে—অথচ হাত বাড়ালে সবই পেয়ে যাচ্ছে। আরশিটা চিরুনিটা, হাতপাখাটা। এদিক-ওদিক চোখ বুলান মাত্র সবই চোখে পড়ছে।

কৌতূহলের সঙ্গে সে দেখল তার মরচেপড়া ইস্ত্রিটা কেমন চকচক করছে। ওটা যে কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল তার জানা ছিল না। এখন টেবিলের এক পাশে দাঁড় করান রয়েছে। কলকাতা থেকে আসার সময় সবই সে সঙ্গে এনেছিল। ইস্ত্রি ফুলদানি অ্যাশট্রে পাপোষ পর্দা টেবিল-ঢাকনা। কিন্তু কিছুই ব্যবহার করত না। ফলে যা হলো, ময়লা হলো মরচে পড়ল রং জ্বলে গেল। তারপর ধুলোয় জঞ্জালে মাখামাখি হয়ে কোন্ কোণায় কোন্‌টা পড়ে রইল

খেয়ালই করল না। কেননা এ সমস্ত কিছুরই তার প্রয়োজন ছিল না।

জঙ্গলে রয়েছি, কী হবে আমার ইস্ত্রি পাপোষ আর চমৎকার মিনা-করা জয়পুরী ফুলদানি দিয়ে। আজ নতুন করে সব কিছু চোখের সামনে ভেসে উঠতে দেখে তার মনে হলো, প্রত্যেকটা কাজের জিনিস, হাতের কাছে কোনোটাই খুঁজে পাচ্ছিল না বলে তার ভয়ানক অসুবিধাই হচ্ছিল। তাই কি?

এই জন্যই সে মনে মনে হাসল। যেন এখন এগুলি ব্যবহার করতে তার বাধবে আটকাবে।

ইস্ত্রিটা কেবল ঘষে-মেজে পরিষ্কার করা হয় নি। ওটা দিয়ে যে একটা দুপুরের মধ্যে অনেক কাজ করা হয়েছে সীতাংশু চোখের ওপর দেখতে পাচ্ছিল। তার বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড়, ছেড়ে-রাখা ময়লা জামা-কাপড়, তোয়ালেটা পর্যন্ত—যেন এই মাত্র ধোবাবাড়ি থেকে ধুয়ে ইস্ত্রি হয়ে এসেছে। চাদর বালিশের ওয়াড় বিছানায় উঠে গেছে, জামাকাপড় ও তোয়ালের ভাঁজ ভাঙা হয় নি। আলনায় সাজিয়ে রাখা হয়েছে, যাতে প্রয়োজন মতন সে ব্যবহার করতে পারে।

কিন্তু পারবে কি, যেন ভয় করছিল সীতাংশুর, এমন চমৎকার ইস্ত্রি করা জামা কতকাল সে গায়ে চড়ায় নি। এখন পরতে গেলে তার হাত কাঁপবে শরীর কাঁপবে। তেমনি মিনা-করা পিতলের ফুলদানিটা। মুখ দেখা যায় এত চকচক করছে।

কিন্তু কেবল মেজে-ঘষে ওটা পরিষ্কার করেই মাধবের দিদি ক্ষান্ত থাকে নি। জল ভরে পাতা ও ডাঁটাসুদ্ধ ক'টা লাল গোলাপ গুঁজে দিয়েছে। যেন যুবতীর মনের ভাব এই, কেমন করে এসব জিনিস ব্যবহার করতে হয় নতুন করে তা দেখ শেখ। কিনে এনে ঘরের কোণায় জঞ্জালের মধ্যে ফেলে রাখলেই হলো না।

তাই কি? কিন্তু সীতাংশু যে ইচ্ছা করে সব ভুলতে চাইছিল।

রাণীরবাগের একটি ঘরের জানালায় রঙিন পর্দা দেখেছে সে, দোরগোড়ায় নকশা করা পাপোষ পাতা থাকতে দেখেছে, টেবিলের ফুলদানিতে ফুল দেখেছে, হুঁ, পাতা ও ডাঁটাসুদ্ধ টকটকে লাল গোলাপ। তেমনি খাট জুড়ে ধবধবে বিছানা, আলনায় ঝুলান ঝকঝকে জামা-কাপড়। কোথাও এক ফোঁটা ধুলো নেই ময়লা নেই। দেখে সীতাংশুর হাঁপ ধরেছে মাথা ধরেছে। দারুণ অস্বস্তি নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে এসে তার জঙ্গলের ডেরায় ঢুকে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে। কোনো রং নেই এখানে, চাকচিক্য নেই। বিবর্ণতার মধ্যে নিজেকে খুঁজে পায় সে, তার ভিতরের 'জংলী' মানুষটাকে দেখে। যেমন কুলি করাতীদের সঙ্গে থেকে যতক্ষণ কাজ দেখে সে, নিজেকে খুঁজে পায় নিজেকে দেখে, বনের মাথা-উঁচু গাছগুলির তলা দিয়ে যখন হাঁটে নিজেকে বোঝে, চিনতে পারে।

কিন্তু আজ যে সব অন্যরকম হয়ে গেল। মাধবের দিদি কি সীতাংশুর মনের চেহারাটা চিনতে পারছে না!

না, কি করে তা পারবে। সীতাংশুকে ক'দিন দেখেছে? আজ থেকে তো এখানে সে কাজে লাগল।

একটা লোক কেমন করে চলাফেরা করে, কী খায়, কী পরে, কী তার ভাবনাচিন্তা, এত চট করে মাধবের দিদির জানবার কথা নয়। হুঁ, সীতাংশুর কী পছন্দ অপছন্দ। তার ঘরের ভিতরটা কেমন হয়ে থাকলে সে স্বস্তি পায়।

টেবিলের ফুলদানির কাছে দাঁড়িয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে সে গোলাপগুচ্ছ দেখতে লাগল। অপরিচিত মানুষের দিকে মানুষ যেমন করে তাকায়। এমন না যে, সে এই জীবনে গোলাপফুল দেখে নি, গোলাপফুল কাকে বলে চেনে না।

এই জীবনে অনেক গোলাপ দেখেছে সে। এখনও যখন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে হাঁটে, দুটো-একটা গোলাপঝোপ যে তার চোখে পড়ে

না তা নয়। কিন্তু থমকে দাঁড়ায় না, মনোযোগ দিয়ে একটি গোলাপও দেখে না।

মনোযোগ দিয়ে দেখে কারা? কারা তন্ময় হয়ে গোলাপের গন্ধ শোঁকে? যারা শৌখীন মানুষ। তারা যত্ন করে গোলাপ বাগান তৈরি করে, সেই ফুল বাগান থেকে তুলে নিয়ে টেবিলে রাখে, খোঁপায় গোঁজে, পুরুষ হলে জামার বোতামের গর্তে আটকে দিয়ে আনন্দ পায়। অন্য ফুলের আদর তাদের কাছে কম।

সীতাংশুর কাছে গোলাপ যা বন-ধুতুরাও তা, আকন্দ ফুলও তাই। সব ফুলই সে ভালবাসে। কোনো একটা বিশেষ ফুলের ওপর তার পক্ষপাতিত্ব নেই, লোভও নেই।

তাই সে ভাবছিল, অনেক গোলাপ দেখেছে। কিন্তু আজ তার ঘরের টেবিলে ফুলটাকে অন্যরকম ঠেকছিল, অপরিচিত ঠেকছিল।

পিছনে পায়ের শব্দ শুনে সে ঘাড় ফেরাল। মাধবের দিদি ঘরে ঢুকল। দুপুরে কাজ সেরে বাড়ি চলে গিয়েছিল। বিকেল পড়তে আবার এসেছে। ওবেলা রাঁধতে চেয়েছিল। সীতাংশু দেয় নি। বিস্তর ধোয়ামোছা কাচাকাচি করতে হয়েছিল তখন, একটা মানুষকে এক বেলা কত খাটান যায়। চিন্তা করে সীতাংশু বলেছিল, 'বরং বিকেলে এসে দুটো ভাত ফুটিয়ে দিলেই চলবে—এ বেলা থাক।' সুখী ঘাড় কাত করে বাড়ি চলে গিয়েছিল। সীতাংশু নিজের হাতে যা হোক দুটো ফুটিয়ে নিয়েছিল।

কিন্তু বেলা পড়তে সত্যি যে মাধবের দিদি রাঁধতে আসবে কথাটা যেন এর মধ্যে সে ভুলে গিয়েছিল।

হঠাৎ কেমন অবাক হয়ে মানুষটাকে দেখছিল সে।

টান করে খোঁপা বেঁধেছে। চোখে কাজল পরেছে। মুখখানা বড় বেশি মাজাঘষা উজ্জ্বল সপ্রতিভ মনে হলো। সকালে ততটা লাগে নি। না লাগবারই কথা, তখন আর একজনের ঘর-সংসার ঘষেমেজে পরিষ্কার করে তুলতে ব্যস্ত ছিল, নিজের দিকে তাকাবার

সময় ছিল কই। সুন্দর রং গায়ের কিন্তু সেই রঙের সঙ্গে যে এত লাবণ্য এত মাধুরী মিশে আছে, এখন হঠাৎ এই বিকেলের আলোয় আবিষ্কার করতে পেরে সীতাংশু কেমন বোবা হয়ে রইল। মুখ দিয়ে কথা সরছিল না। পানের রসে ঠোঁট দুটি রক্তাভ করে রেখেছে যুবতী। যেন টেবিলের গোলাপের লাল এই লাল ঠোঁটের কাছে হার মানছে। কারণটা আন্দাজ করতে গিয়ে সীতাংশু লক্ষ্য করল, ঠোঁট দুটি বড় বেশি পরিপুষ্ট বড় বেশি সতেজ। জানালা দিয়ে পশ্চিমের রোদ এসে পড়েছে মুখে। পর্দাটা খাটানো হয়েছে, কিন্তু সেটা টেনে দেওয়া হয় নি। হয়তো এখানেই ভুল করে গিয়েছিল মাধবের দিদি। তা না হলে বিকেলের হলদে রোদ কিলবিলিয়ে সাপের মতন জানালা গলিয়ে তার চোখে মুখে এসে ছড়িয়ে পড়ে একটি পুরুষের চোখে এত চমক সৃষ্টি করত কি! না কি ভুল না, ইচ্ছা করেই পর্দাটা গুটিয়ে রেখে গিয়েছিল সে।

সুখী বেশ বুঝতে পারছিল, আর একজনের চোখের পলক পড়ছে না। পলক ফেলার সময়ই পাচ্ছে না। শ্বাস বন্ধ করে তার কাজল বুলোনো চোখ দেখছে নাক দেখছে ঠোঁট দেখছে খোঁপা দেখছে, সেই সঙ্গে তার শরীর দেখছে, হাত আঙুল পায়ের পাতাটিও বাদ দিচ্ছে না।

এমন করে একটি পুরুষ যদি কোনো যুবতীকে দেখে আর সে রূপবতী হয়, তো কী করে সে তখন? চোখ নামিয়ে নেয়? ঘুরে দাঁড়ায়? ছুটে পালিয়ে যায়?

হয়তো যায়। যদি সে কুমারী হয়। পুরুষের চোখে চমক সৃষ্টি করছে ভেবে লজ্জায় অথবা ভয় পেয়ে সেখান থেকে সরে যাওয়া তার পক্ষে অস্বাভাবিক কিছু না। কিন্তু সুখীর বিয়ে হয়েছে। পুরুষের সামনে তাকে অনেকবার দাঁড়াতে হয়েছে। কাজেই একটু শক্ত হতে শিখেছে সে।

কেবল তাই না, সুখীর বেলায় অন্য প্রশ্নও এসে যায়। নিজের

পুরুষটির কাছ থেকে সে কেবল নির্যাতন পেয়েছে, তার ঘেন্না ও আক্রোশের দৃষ্টি সুখীকে অবিরত বিদ্ধ করেছে, আজ হঠাৎ আর একটি পুরুষ যদি তাকে মোহের দৃষ্টি নিয়ে গাদা গাদা বিস্ময় নিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে দেখতে থাকে তো সুখীর মনেও কি কৌতূহল জাগবে না! অবাক হয়ে সে তখন ভাববে, আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকাবার মতন পুরুষ এই সংসারে তা হলে আছে, আমি এখনও ফুরিয়ে যাই নি শেষ হয়ে যাই নি।

এখানে তাই হলো।

অনেক দিনের হতাশার অন্ধকারের পর সুখী যেন এক টুকরো আলো দেখতে পেল।

এই আলোর মধ্যে এক গাদা আশা লুকিয়ে আছে কি না, ভবিষ্যতের এক তাল উজ্জ্বল সোনা লুকিয়ে আছে কি না এসব কথা অবশ্য তখনই তার মাথায় এল না। সে শুধু দেখল—পুরুষটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার ভুরু দেখছে নাক দেখছে চিবুক দেখছে, এসব দেখা হয়ে যাবার পর তার শরীর দেখছে কোমর দেখছে, পায়ের পাতাটাও বাদ দিচ্ছে না। এই দেখার মধ্যে আর কিছু থাক বা না থাক, ঘেন্না আক্রোশ বা তাচ্ছিল্য যে নেই এ সম্পর্কে সে নিশ্চিন্ত হলো।

একটা হাল্কা নিশ্বাস ফেলল সে। ঠোঁটের কোণায় এক টুকরো সুন্দর হাসি ফুটিয়ে তুলতে আর যেন তার কোনো বাধাই রইল না। ভুরু দুটোও ঈষৎ বিলসিত করে তুলল।

'আপনার পছন্দ হয়েছে?'

সীতাংশু প্রায় শিউরে ওঠার মতন চেহারা করল। যুবতীর চোখের দিকে তাকাল।

'কোন্ জিনিস?' হঠাৎ পছন্দের প্রশ্ন কেন, বুঝতে তার কষ্ট হচ্ছিল।

মাধবের দিদি আঙুল দিয়ে টেবিল বিছানা ও আলনায় সাজিয়ে রাখা ধোয়া কাপড়জামা দেখাল।

সীতাংশু চোখ বুজে ঘাড়টা একদিকে হেলিয়ে দিল।

'চমৎকার হয়েছে, কোথাও এক ফোঁটা ময়লার চিহ্নও নেই। আমি তো ভেতরে পা দিয়ে চিনতেই পারি নি এ আমার ঘর।' এতক্ষণ পর সে হাসতে পারল।

'ওফ্, চারদিকে কী নোংরার বাহারই না করে রেখেছিলেন।' সুখী চোখ বুজে মাথাটা পিছনের দিকে একটু হেলিয়ে দিল। কিন্তু হাসল না। বরং নাক কুঁচকোল। যেন এখনও ঘরের কোথাও না কোথাও একটু আধটু নোংরা রয়ে গেছে। সীতাংশুর হাসি নিবে গেল। ঘাড় ঘুরিয়ে তৎক্ষণাৎ সে ঘরের আনাচ-কানাচ দেখতে লাগল। 'শুনুন!' সুখী ঘাড় সোজা করল। 'আপনার পরনের জামাকাপড়টা ছেড়ে রাখবেন। কাল এগুলো সাফ করতে হবে।'

'হুঁ, তা তো বটেই।' পরনের জামা-কাপড়ের দিকে চোখ রেখে সীতাংশু বিব্রত হয়ে পড়ল। 'ধোয়া জিনিস যখন রয়েছে, এগুলো আর পরে থাকা কেন।' অসহায় শিশুর মতন সে হাসল।

যেন এবার সুখী নিশ্চিন্ত হলো। পান খাওয়া লাল ঠোঁটে নতুন করে হাসি জ্বেলে দিল।

'যাক, তবু যে আপনি কথা শুনছেন। ভয় ছিল, এসেই যেমন সব কাচাকাচি ঘষামাজা করছি, আপনি না রাগ করেন।'

'না না, তা করব কেন। সারাদিন ওদিক দেখে এদিকে মন দেবার চোখ ফেরাবার সময়ই হচ্ছিল না। তুমি আসাতে সুবিধেই হলো।'

কথাটা কি সত্য? মাধবের দিদি কি বিশ্বাস করল? দিনের পর দিন যে মানুষ ময়লা জামা-কাপড় পরে ঘোবে, ময়লা বিছানায় শোয়, দাড়িগোঁফ বড় হচ্ছে মাথার চুল লম্বা হচ্ছে দেখেও সেসব কাটবার ছাঁটবার যার এতটুকু আগ্রহ হয় না, ঘরময় জঞ্জাল ছড়িয়ে রাখতে যার ভাল লাগে, আজ হঠাৎ তার পরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষা? পরিষ্কার বিছানা পরিষ্কার জামা-কাপড় দেখে সে খুশি?

ভয়ে ভয়ে যুবতীর মুখের দিকে তাকাল সীতাংশু। তার ভিতরের

জংলী মানুষটাকে না মেয়েটি চিনে ফেলে। আসলে যে সে তার গরীব বাপকে সাহায্য করবে বলে এখানে চাকরি করতে এসেছে, সীতাংশুই ডাকিয়ে এনেছে। এখন এখানে এসে সে যদি সীতাংশুর ময়লা কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করা ঘরের জঞ্জাল সাফ করা কি ঘর গোছানোর কাজ নিয়ে অত্যধিক উৎসাহ দেখায় তো সীতাংশু কি তাতে আপত্তি করবে? ঘাড় নেড়ে তাকে হুঁ হ্যাঁ করে যেতেই হবে। যদি যুবতী রান্না নিয়ে মেতে ওঠে তো তাতেও সীতাংশুর সায় দিয়ে চলতে হবে। ইচ্ছা না হলেও তাকে ফরসা কাপড় পরতে হবে ঘর পরিষ্কার রাখতে হবে। এক একজন এক একভাবে কাজ করে সুখ পায়। একজনের কাজের পদ্ধতির সঙ্গে আর একজনের কাজের পদ্ধতি মেলে না।

কাজেই মাধবের দিদি যেভাবে কাজ করুক, সীতাংশুর চুপ করে থাকা ছাড়া উপায় নেই। আপত্তি করলে, বাধা দিলে যুবতী অসুখী হবে। অসুখী মন নিয়ে কেউ কাজ করতে পারে না। তখন মানুষটি কাজ ছেড়ে দিয়ে হয়তো চলে যাবে। তাতে আর কারো ক্ষতি হোক না হোক মুরারির ক্ষতি হবে। বেচারা ভয়ানক অসুবিধায় পড়বে। সীতাংশু তা চায় না।

কাঁধের আঁচলটা একটু নেড়েচেড়ে সুখী একটা মন্থর হাই তুলল। 'এবার উনুনে আঁচ দিতে হয়, বেলা পড়ে গেল।'

সুবোধ ছেলের মতন সীতাংশু ঘাড় কাত করল।

'হুঁ, দেখতে দেখতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে।' সঙ্গে আর একটা কথাও সে যোগ করল। 'তবে কিনা, তেমন কিছু রাঁধতে হবে না। একটা ভাতে ভাত ফুটিয়ে নিলেই যথেষ্ট।'

'কেন!' যেন সুখী অবাক হলো। ভুরু জোড়া কপালে তুলল। আপনি কি এতই গরীব, রান্নার লোক এসে গেল তবু শুধু ভাতে ভাত খেয়ে রাত কাটাতে হবে!'

'না, তা ঠিক নয়।' লজ্জা পেল সীতাংশু। 'রাত্তিরে বিশেষ

কিছু খাওয়া আমার অভ্যেস নেই, তা ছাড়া রাঁধার মতন জিনিস-পত্তরও ঘরে কিছু নেই যেন। ঝুড়িতে ক'টা আলু আর পেঁয়াজ পড়ে আছে দেখলাম।'

এক সেকেণ্ড কি চিন্তা করল সুখী। উত্তরটা শুনে সে মোটেই খুশি হলো না, তার চোখ দেখে বোঝা গেল। আস্তে আস্তে বলল, 'আমি জানতাম না, মাধবকে তখন পাঠিয়ে দিলে চাষীদের ঘর থেকে হাঁসের ডিম নিয়ে আসতে পারত।'

'তাও তো বেচারাকে দু' মাইল হাঁটতে হতো।' সীতাংশু ক্ষীণ গলায় হাসল। 'তোমরা ছাড়া ধারে-কাছে আর গেরস্থ বাড়ি কোথায়?'

'তা তো নেইই।' সুখী বিড়বিড় করে উঠল। 'এমন জঙ্গলে এসে ঠাঁই নিয়েছেন। চট করে হাতের কাছে কিছু পাওয়াও যায় না।'

'জঙ্গল ছাড়া আমি কাঠ পেতাম কোথায়।' যেন নিজের দোষ স্খালনের চেষ্টা করল সীতাংশু।

তাতেও সুখী বিশেষ সন্তুষ্ট হলো না।

'যাক গে, কাল চাঁপাডাঙার হাট বসবে। টাকা দেবেন। আমি মাধবকে দিয়ে সব আনিয়ে রাখব।'

'তাই ভাল হবে।' সীতাংশু উৎসাহের সঙ্গে ঘাড় বেঁকাল। 'ডিম ডাল আনাজ মশলাপাতি—এক হপ্তার মতন বাজার করে নিয়ে আসবে মাধব।'

সুখী কথা না বলে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। সীতাংশু স্থির চোখে সেদিকে তাকিয়ে রইল।

আগের দু' রাত হাওয়া ছিল। তাই এত পরিষ্কার জ্যোৎস্না ছিল। আজ গাঢ় কুয়াশায় আকাশ বন ঢেকে ফেলল। অথচ চাঁদ উঠল। কুয়াশায় ঢাকা আলোর আকাশটাকে মনে হচ্ছিল ঘষা

কাচের ডুম-পরান একটা প্রকাণ্ড বাতি। কাচের ভিতর দিয়ে বাতির আলো আসছে না, আলোর একটা আভা দেখা যাচ্ছে মাত্র। সেই ধোঁয়াটে আভায় বড় বড় গাছগুলি কেমন যেন ভুতুড়ে চেহারা ধরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বন-প্রান্তরের চেহারাও অস্পষ্ট রহস্যময় ঠেকছিল।

ঘরের সামনে ঘাসের ওপর পায়চারি করছিল সীতাংশু। মাধবের দিদি কাজ সেরে বাড়ি চলে গেছে। এতটা সময় মাধবও এখানে ছিল। সেই সন্ধ্যাবাতি লাগতে খরগোসের বাচ্চাটার সঙ্গে খেলাধূলা সেরে বাচ্চাটাকে ঘরে এনে বাক্সে পুরে রেখে উনুনের পাশে বসে দিদির সঙ্গে সে গল্প করছিল। তার দিদি রান্না করছিল। একবার উঁকি দিয়ে দেখেছিল সীতাংশু। দৃশ্যটা এত সুন্দর লাগছিল। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা রান্নাঘরের ছবি তার মনে পড়ে যায়। হুঁ, রাণীরবাগের একটা রাঁধুনীকে সেদিন সে দেখে এসেছে।

ছবিটা মনে পড়তে সীতাংশুর মন বিষাদে ভরে উঠল। মাধব ও মাধবের দিদিকে বুঝতে দিল না। যেমন চুপি চুপি রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল তেমনি চুপি চুপি সেখান থেকে সে সরে এল। এই মেয়েটিও ঘর সাজাতে পারে ঘর গুছোতে পারে। পাকা গিন্নীর মতন রান্নার হাতটিও চমৎকার। কিন্তু হলে হবে কি। তার রুচি পছন্দ নিপুণতা কোনো কাজে লাগল না। ঘর পেয়েছিল, কিন্তু সেই ঘরে সে থাকতে পারল না।

আজ পরের ঘর সাজাতে চাইছে যুবতী, ঘটা করে রাঁধতে বসেছে। আরও খারাপ লাগল সীতাংশুর, রান্না নামিয়ে তার খাবারটি যত্ন করে ঢেকে রেখে উনুনের আগুন নিবিয়ে লেপেপুঁছে জায়গা পরিষ্কার করে দিয়ে ভাইয়ের হাত ধরে কুয়াশার জ্যোৎস্নায় ঢাকা বনের পথ ধরে যখন সে ঘরে ফিরে যাচ্ছিল।

রহস্যময় মনে হচ্ছিল সব কিছু। বন-প্রান্তর কুয়াশার ঘন আবরণ ও একটি যুবতী ও কিশোরের অস্বচ্ছ মূর্তি একাকার হয়ে মিশে গিয়ে

কেমন যেন একটা দীর্ঘশ্বাসের কবিতা হয়ে সীতাংশুর চোখের সামনে ভেসে উঠে আস্তে আস্তে আবার মিলিয়ে গেল।

সীতাংশু ঘরে উঠে এল।

খরগোসের বাচ্চাটা চিঁ চিঁ করে ডাকছিল। হ্যারিকেন তুলে সীতাংশু উঁকি দিয়ে খাঁচার ভিতরটা দেখল। পায়ের শব্দ শুনে কালা দু' কান খাড়া করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। মিশমিশে চোখ দুটো অন্ধকারের বিন্দু হয়ে স্থির হয়ে আছে। যেন অন্য কারো মুখ আশা করছিল সে। সীতাংশুকে দেখে হতাশ হলো। পশুর চোখেও আশাভঙ্গের বেদনা জাগে বৈকি। সীতাংশুর কেমন কষ্ট হলো। সঙ্গীকে খুঁজছে কালা। সারাদিন মাধবের সঙ্গে খেলাধুলা করেছে। এখন আর লাল চুলে ভরা ছোট্ট মাথাটা দেখছে না, জীবনের আবেগ নিয়ে টগবগ করছে এমন একটা মুখ দেখছে না। খাঁচার অন্ধকারে এভাবে হঠাৎ আটকা পড়ে সে ছটফট করবে বৈকি। হয়তো কাঁদছে।

ভিতরে হাত ঢুকিয়ে সীতাংশু তার মাথায় হাত রেখে আদর করল। কিন্তু তাতেও কালা তেমন প্রসন্ন হলো বলে মনে হলো না। মুখ নামিয়ে চুপ করে রইল।

কে জানে, ভালবাসার বুঝি ক্ষতিপূরণ হয় না। সীতাংশু চিন্তা করল। মাধব সারাদিন যেভাবে ভালবেসে গেছে, এখন সীতাংশু শত চেষ্টা করেও কালার মন পাবে না, সে আদর করলে হবে কি, কালার কিছুতেই মন উঠবে না সে বেশ বুঝতে পারল। বুঝতে পেরে হাতটা গুটিয়ে আনল।

সাতদিন কেটে গেল। আর তার ভয় রইল না। আর আশঙ্কা করার কিছু নেই সে বুঝতে পারল। তার ডেরার ভিতরটা একটু যা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়েছে। তা না হলে সবই ঠিক আছে। সেই জঙ্গল, বড়

বড় গাছ, কাঁটাঝোপ, রৌদ্র-ছায়া, এলোমেলো হওয়া, আর মাধবের মুহুর্মুহু হাততালি, কালার ছুটোছুটি, তার গলার ঘুঙুরের ঝুনঝুন শব্দ। সবই ঠিক আছে, কেবল তার গায়ের জামাকাপড় আগের মতন তেমন ময়লা হয়ে থাকতে দেখা যায় না। মুখের দাড়ি-গোঁফও খুব একটা বড় হতে পারে না।

কিন্তু এই পরিচ্ছন্নতা এই মাজা-ঘষা আর কতটুকুন। যেন জঙ্গলের গাছটা প্রচুর ডালপালা মেলে ছড়িয়ে পড়েছিল, একটু কেটে-ছেঁটে ছোট করে দেওয়া হলো। বাড়ির চারধারের খানিকটা আগাছা সরিয়ে দেওয়া হলো। এই পর্যন্ত।

তা না হলে সবই অবিকল আগের মতন থেকে গেছে। গাছের চারদিকে পাখি পতঙ্গ আলো বাতাস, মাথার ওপর প্রকাণ্ড আকাশ।

সীতাংশুর ভয় ছিল, অতিরিক্ত সাজান-গোছানোর দরুণ তার ডেরাটা না রাণীরবাগের বাংলো হয়ে যায়। বেশি ফিটফাট থেকে না সে হঠাৎ একদিন বাংলোর সেই ডাক্তারবাবুটি হয়ে যায়।

তারপর দেখল, তেমন আশঙ্কা নেই, ঘর আগলাবার মতন, চব্বিশঘণ্টা দেখাশোনা করার মতন ঘরণী কোথায়। কাজ শেষ করে ঘরে ফেরামাত্র যে ফিতের বাঁধন আলগা করে পায়েব জুতো খুলে দেবে, জামা ছাড়িয়ে দেবে? তারপর চা খাবার সামনে সাজিয়ে দিয়ে গল্প জুড়ে দেবে?

এত সব করতে মাধবের দিদির বয়ে গেছে।

বেচারা এখানে চাকরি করতে এসেছে। মাস গেলে ক'টা টাকা পাবে। নিজের খোরাকী আছে, বাচ্চার দুধের খরচ আছে। তাই যতটুকু করবার সে করে দেয়। অতিরিক্ত কিছু করতে সীতাংশুই বা তাকে বলবে কেন।

তবে কি না, মানুষটার রুচি আছে, পছন্দ আছে। তার সঙ্গে চমৎকার একটা শৃঙ্খলাবোধ। কোথাও ময়লা জমে আছে জঞ্জাল

রয়ে গেছে দেখলে যেমন রুষ্ট হয়, খুঁতখুঁত করে, তেমনি অনিয়ম-টনিয়মগুলিও পছন্দ করে না। এই জন্য নিজের দিক থেকেও সীতাংশু আগের কু-অভ্যাসগুলি, যেমন মুখটুক না কামানো চুল বড় করা ময়লা জামাকাপড় পরে ঘোরাফেরা করা, অসময়ে খাওয়া কি ঠাণ্ডার ভয়ে গায়ে জল না দেওয়া অথবা হাট-বাজার করার আলসেমীর দরুণ শুধু ভাতে-ভাত কি পান্তা খেয়ে চালিয়ে দেওয়া—আস্তে আস্তে ছেড়ে দেবার চেষ্টা করছে। অভ্যাস ছাড়তে কষ্ট হয়, তা হলেও কি করা যায়, আর একটা মানুষের কাজের শৃঙ্খলার জন্য নিয়মগুলি যতটা সম্ভব মেনে চলা।

তা না হলে, যেমন সে ছিল, মুক্ত স্বাধীন। যতক্ষণ ব্যবসা-বাণিজ্য দেখার দেখে, কারখানার কাজ দেখে। তারপর আর তার কোনো দায় নেই বন্ধন নেই। তারপর আছে তার মাধব, আমলকীতলার এলোমেলো হাওয়া, নরম ঘাস, কালার ছুটোছুটি, ঘুঙুরের শব্দ।

মাধবের দিদিও এসব ভালবাসে।

হাতের কাজ শেষ হয়ে গেলেই কালাকে কোলে নিয়ে আদর করে, কচি ঘাস ছিঁড়ে খাওয়ায়। কারখানার ছুটির দিন, অথবা কাজের দিন কারখানার ছুটি হয়ে যাবার পর কুলি মিস্ত্রী করাতী কাঠুরিয়ারা যখন চলে যায়, জায়গাটা কেমন থমথম করে। তখন আমলকীতলায় মাটিতে শোয়ানো একটা নারকেল গাছের গুঁড়ির ওপর পা ঝুলিয়ে সীতাংশু বসে, তার পাশে মাধব, মাধবের পাশে তার দিদিও একসময় আস্তে আস্তে এসে টুপ করে বসে পড়ে। সামনে ঘাসের ওপর খরগোসের বাচ্চাটা ছুটোছুটি করে। এতক্ষণ মাধব হাততালি দিয়ে অথবা মুখে হুস হুস শব্দ করে নানারকম অঙ্গভঙ্গি দেখিয়ে কালার আনন্দবর্ধন করছিল, এবার হয়তো মাধবের দিদি তাকে খেলা দিতে আরম্ভ করল। অবাক হবার মতন কথা বটে, মাধবের দিদি আর কতক্ষণ কালাকে দেখাশোনা করতে পারে, কাজের

ফাঁকে এক আধ সময় ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তাকে কোলে নেয় চুমু খায় দুটো একটা নরম ঘাস ছিঁড়ে খেতে দেয়। সারাক্ষণ তো মাধবের সঙ্গেই আছে কালা। সেই সকাল থেকে সন্ধ্যা। সন্ধ্যার পর মাধব ঘরে ফিরে গেলে সীতাংশু বাচ্চাটাকে দেখাশোনা করে। কিন্তু তাতে কি, মাধবের দিদির ঐ একটুকু সময়ের আদর পেয়ে কালা যেন সবচেয়ে তার বেশি বাধ্য হয়ে পড়েছে। হাবেভাবে তাই বোঝা যাচ্ছে। কেননা মাধবের দিদি এসে নারকেলের গুঁড়িটার ওপর পা ঝুলিয়ে বসল কি কালার উৎসাহ যেন অন্য দিকে মোড় ফিরল। মাধব তখন হাজার হাততালি দিক কি হাত পা নেড়ে হুস হুস শব্দ করুক, কালা একবারও আর তার দিকে তাকাবে না, সীতাংশুর দিকেও না, মুখ ঘুরিয়ে ফরসা ধবধবে দুখানা পায়ের কাছে গিয়ে ভিড়বে। যেন এতক্ষণ এই মানুষটার জন্যই সে অপেক্ষা করছিল। যেন এতক্ষণ মাধব বা মাঝে মাঝে সীতাংশুও যে তাকে খেলা দিচ্ছিল সেসব খেলা কিছু না, দুজনের মন রাখতে একটু যা ঘাসের ওপর ছুটোছুটি করা কি গড়াগড়ি দেওয়া বা হুট করে একসময় মাধব কি সীতাংশুর হাঁটুর ফাঁকে ঢুকে পড়ে চি চিঁ শব্দ করে খানিকটা আহ্লাদ প্রকাশ করা, এর অতিরিক্ত কিছু না। যেন এর বেশি কিছু খেলা তার জানা ছিল না।

কিন্তু এবার তার আসল খেলা আরম্ভ হলো।

বলতে কি, যেন এক সেকেণ্ডের মধ্যে কালার চেহারা পাল্টে গেল, চোখের রং অন্যরকম হয়ে গেল, হয়তো এটাই তার চোখের আসল রং, উজ্জ্বল মসৃণ গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ। যে মানুষটি তার চোখের দিকে চেয়ে পান খাওয়া লাল ঠোঁট দুটো ছড়িয়ে দিয়ে হাসছে, তার সুন্দর মুখটা যেন সূর্যের আলো হয়ে কালার চোখের ভিতরটা ঝলমলে করে দিয়েছে।

এবং কালা যে মানুষটির কতবড় ভক্ত তখন বোঝা যায়। পেছনের পা দুটো মুড়ে রেখে সামনের দু' পা শূন্যে তুলে মাধবের

দিদির হাঁটুর কাছে গলাটা বাড়িয়ে দিয়ে এপাশ ওপাশ দুলছে। যেন সূর্যবন্দনা করছে সে। কচি অশ্বত্থপাতার মতন ছোটো কান দুটো খাড়া হয়ে আছে। যেন মাধবের দিদির শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ, ঢোক গেলার ক্ষীণতম শব্দটিও তার না শুনলে নয়।

সীতাংশুর চোখের পলক পড়ে না। মাধবও কেমন শ্বাস বন্ধ করে কালার রকমসকম দেখে। এতক্ষণ সে হাঁপাচ্ছিল। এবার মুখটা শুকনো করে রাখে। কালা যে তার চেয়ে তার বাবুর চেয়ে দিদিকেই বেশি পছন্দ করে এটা যেন খুব সহজভাবে সে নিতে পারছে না, তার চোয়াল বেশ শক্ত হয়ে ওঠে তখন, অর্থাৎ কালার ওপর রেগে যাচ্ছে বোঝা যায়।

মাধবের মনের অবস্থাটা চিন্তা করে সীতাংশুর কষ্ট হয়, আবার অকৃতজ্ঞ কালার কাণ্ডকারখানা দেখে ভিতরে ভিতরে সে না হেসেও পারে না।

কথাটা নতুন করে তার মনে পড়ল।

ভালবাসতে গিয়ে আমরা দুঃখ পাই। আবার ভাল না বেসেও পারি না।

কিন্তু যার মুখ দিয়ে কথাটা বেরিয়েছিল তার দুঃখ আসলে দুঃখ না, দুঃখ নিয়ে সে বিলাস করছিল। একজনকে ভালবেসে তার কাছ থেকে গাদা গাদা ভালবাসা পাচ্ছে সে, যতটুকু দিচ্ছে ফিরে পাচ্ছে তার চেয়ে ঢের বেশি। কিন্তু তবু অতৃপ্তি। ভালবাসার দুঃখ নিয়ে কান্না। সমুদ্রের ফেনা তো থাকবেই।

কাজেই, সীতাংশুর ইচ্ছা করছিল, রাণীরবাগের দুঃখবিলাসিনীকে একবার এখানে ডেকে এনে দেখায়, ভালবাসার দুঃখ জিনিসটা আসলে কী। এখন মাধবকে দেখলে তার চোখ খুলত, ভালবাসার বেদনা নিয়ে মুখে আর ফেনা তুলত না।

সীতাংশুর কানের কাছে মুখটা নিয়ে এল মাধব।

‘কি হলো ?’ সীতাংশু একটু ঘুরে বসল।

'আমার মনে হয় ধলা এমন করত না।'

'না', সীতাংশু সজোরে মাথা নাড়ল। মনে মনে বলল, 'ধলা আদরের মর্ম বুঝত, ভালবাসার মান রাখত, তোকে ছেড়ে কখনই তোর দিদির পাশে ছুটে গিয়ে খুনসুটি করত না।'

তাই করছিল তখন কালা। সুন্দর মানুষটার কাঁধে চেপে বসেছে। তার ঝকঝকে ফরসা গালের সঙ্গে গাল ঠেকিয়ে রেখে চোখ বুজে আছে।

'পাকা বদমাস হয়ে গেছে ওটা।' মাধবের দাঁত কিড়মিড় করে উঠল।

সীতাংশু শব্দ করল না। তবে এটাও সত্য, চিন্তা করল সে, কালার ওপর রাগ করলে হবে কি, দিদির ওপর কোনো সময় মাধব রাগ করে না বিরক্ত হয় না। ক'দিন ধরে তো সীতাংশু দেখছে। যতদিন আসানসোলে বরের কাছে ছিল—ছিল, কিন্তু এখন এখানে আসার পর থেকে দিদিকে এক সেকেণ্ড চোখের আড়াল করতেও যেন তার ইচ্ছা করে না। কালাকে নিয়ে এসে বাইরে খেলতে খেলতেও কতবার সে ছুটে এসে দিদির কাজকর্ম দেখে যাচ্ছে, দিদি রান্নাঘরে থাকলে সেখানেও ঢুকে পড়ছে। এমন কি দরকার হলে দিদিকে সাহায্য করতে মস্ত কূয়া থেকে ক' বালতি জল তুলে দিতেও তার আলস্য নেই। কালাকে তখন কোল থেকে ঠিক নামিয়ে দেবে সে। যদি এসময় কালা বিরক্ত করে তো কালার কান দুটো মলে দিতেও সে কসুর করে না। কাজ সেরে রাত্রে দিদির ঘরে ফিরতে কোনো কোনোদিন দেরি হয়। মাধব ঠিক বসে থাকবে। দিদিকে সঙ্গে নিয়ে তবে বাড়ি যাবে। কতদিন তার ঘুম পায়, চোখে জল দিয়ে বসে থাকে সে, দিদিকে ফেলে রেখে একলা কিছুতেই ঘরে ফেরে না।

না, দিদির ওপর তার রাগ নেই, সব রাগ কালার ওপর। কত সহজে বদমাসটা মানুষের আদর ভুলে যায়। অথচ মজা এই,

মাধবের মনের ভাবটা তখন যা দাঁড়ায়, তার চোখ দেখে সীতাংশু এটা বোঝে, 'তুই যতই খুনসুটি করিস না কেন, তোকে দিদি আদর করে ঠিকই, কিন্তু তোর চেয়ে আমাকে ঢের বেশি ভালবাসে আমার বোন।'

'যদি ধলা বেঁচে থাকত এটাকে ঠিক জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে আসতাম।' মাধব বিড়বিড় করে বলল।

সীতাংশু ঘাড় কাত করল। ধলা বেঁচে থাকলে অবশ্য কালাকে কোনোদিনই ঢিবির গর্ত থেকে ধরে আনা হতো না, মনে মনে বলল সে।

হুঁ, যে কথা হচ্ছিল, সুন্দর মানুষটার কাঁধে চেপে বসে কালা খুব আদর খাচ্ছিল। মানুষটা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। ডান হাত দিয়ে কালাকে ধরে রেখে বাঁ হাত দিয়ে চেপেচুপে খোঁপাটা একটু ঠিক করে নিল, তারপর আমলকীতলা ছেড়ে ওপাশের পলাশঝোপের দিকে এগোতে লাগল। এবার মাধবও উঠে দাঁড়াল, মাধবের দেখাদেখি সীতাংশুও উঠল। পলাশঝোপের দিকে চোখ রেখে দু'জন হাঁটতে আরম্ভ করল।

সুখী একটু তাড়াতাড়ি হাঁটছিল। তারা ঝোপের কাছে পৌঁছনোর আগেই কালাকে নিয়ে সে ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হলো।

'ওদিকে গেল কেন দিদি?' মাধব ফিসফিস করে উঠল।

'মনে হয় কালার জন্য কচি ঘাস খুঁজছে।' সীতাংশু অল্প শব্দ করে কাশল।

'কিন্তু এখানে তো মেলাই কচি ঘাস রয়েছে।' মাধব আঙুল দিয়ে পায়ের কাছের ঘাস দেখাল। কচি ঘাস মাড়িয়ে দু'জনে ঝোপের দিকে এগোচ্ছিল। সীতাংশু মাটির দিকে চোখ নামিয়ে দেখল মাধবের কথা সত্য। 'কে জানে, এখানকার ঘাস কালা হয়তো আর পছন্দ করছে না।' সীতাংশু বিড়বিড় করে উঠল। মাধবের দিকে চোখ তুলে ঈষৎ হাসল।

'কিন্তু ওপাশটায় কাঁটানটের জঙ্গল ছাড়া আর কিছুই পাবে না।' মাধবের গলার স্বরটা রুক্ষ শোনাল।

সীতাংশু আর কিছু বলল না। রৌদ্র ঝলমল করছিল। আজ রবিবার। কারখানা বন্ধ। করাতী কাঠুরিয়া আসে নি। সেই সঙ্গে কুলি মিস্ত্রীদেরও ছুটি। অবিশ্বাস্য রকম একটা স্তব্ধতা নিয়ে চারদিক কেমন থমথম করছিল। কাল থেকে অঘ্রাণ আরম্ভ হয়েছে। তাই সকালটা এত মিষ্টি, রোদটা এত সুন্দর। মাথার ওপর দোয়েল শিস দিচ্ছিল। সীতাংশু ঘাড় তুলে দেখল। মহানিমের পাতা হলদে হয়ে এসেছে। ক'দিন পর ঝরতে শুরু করবে। তারপর আর গাছটাকে চেনা যাবে না।

বস্তুত এখান থেকেই জঙ্গল আরম্ভ, ধরতে গেলে পলাশঝোপ থেকে সীতাংশুর টিম্বার রেঞ্জ শুরু। এটা উত্তর দিক। এতক্ষণ দূরের আকাশটাও দেখা যাচ্ছিল। এখন চোখ তুললে সরু মোটা অসংখ্য শাখা-প্রশাখা ও পাতার সমারোহ ছাড়া আর কিছু দেখা যাবে না। মেটে খয়েরী ধূসর লালাভ অথবা লালে হলুদে মেশানো রং নিয়ে উঁচু উঁচু সব গাছেব কাণ্ড দাঁড়িয়ে। মাধবের কথাটা খুবই সত্য, নিচের দিকে তাকাও, নধর কচি সবুজ ঘাসের চিহ্নও নেই, খয়েরী অথবা কালচে সবুজ রুক্ষ কাঁটার জঙ্গল মাথা জাগিয়ে আছে। আর সেই পরিচ্ছন্ন ঝলমলে রৌদ্রই বা কোথায়, ছায়ায় ছায়ায় সব কেমন অন্ধকার মনে হয়। কেবল উঁচু থেকে কোথাও কোথাও চোখা বল্লমের মতন একটা ছুটো রোদের রেখা নিচে নেমে এসেছে। এখানেই যা ভরসা, মাঝে মাঝে সোনালী রোদের রেখা চোখে পড়ে, তা না হলে ভয় করত, গা ছমছম করত।

আর একটা সুন্দর দৃশ্যও অবশ্য চোখে পড়ে। তাকিয়ে দেখবার মতন। প্রজাপতির মতন অসংখ্য ছোট ছোট পতঙ্গ, সাদা ধবধব করছে তাদের গায়ের রং, কাঁটার জঙ্গল ঘেঁষে অবিশ্রাম উড়ে বেড়াচ্ছে। বস্তুত কিসের লোভে ঝাঁক বেঁধে তারা এখানে ছুটে এসেছে, প্রথমটায়

ভাবতে অবাক লাগে। একটু মনোযোগ দিলেই চোখে পড়বে কাঁটাগাছেও ফুল এসেছে, গাঢ় নীল রঙের অসংখ্য ফুল। ফুল ফল সবই এসেছে সেসব গাছে, কিন্তু ছায়ায় অন্ধকারে এমনভাবে মিশে আছে, হঠাৎ বোঝা যায় না। তবে আকারে ছোট হলেও আশ্চর্য সাদা রং বলে অন্ধকারে পতঙ্গগুলি প্রথমে চোখে পড়ে, তাছাড়া সংখ্যায়ও তারা অনেক, অগুণতি—ক্রমাগত উড়ে বেড়াচ্ছে ঘুরছে, হঠাৎ মনে হতে পারে রাশি রাশি ঘাসফুল বুঝি ঘাসের বুক থেকে উঠে এসে শূন্যে ছুটোছুটি করছে। সেই এক ছবি।

এক মিনিট তারা কথা বলতে পারল না। চুপ থেকে চমৎকার দৃশ্যটা উপভোগ করল।

'দিদিকে তো দেখছি না।' মাধব প্রথম কথা বলল।

'আমার মনে হয় ওদিকে গেছে।' ঝোপের ভিতর দিয়ে একটা পায়ে-চলা পথ এঁকেবেঁকে খানিকটা অগ্রসর হয়ে তারপর বাঁদিকে ঘুরে গেছে। সীতাংশু আঙুল দিয়ে বনের ওপাশটা দেখাল। 'ওখানটায় এত কাঁটা নেই।'

তা যে নেই মাধবও জানে। জঙ্গলের ভিতর তাকে রাতদিন ঘোরা-ফেরা করতে হয়। খরগোস তো আছেই, মনে মনে আরও কত কি খুঁজে বেড়ায় সে। বনমোরগ কাঠবিড়াল বাঁদর, হুঁ, বাঁদরের ছানা ধরে এনে পুষবে এমন একটা কল্পনাও তার রয়েছে। কাজেই বনের কোনদিকে কী আছে না আছে সব তার মুখস্থ। এপাশটায় যদি শাল সেগুন ও পলাশের ভিড় ওপারে রয়েছে তেঁতুল গাব গামো হিজল। যেন সেখানটা আরও গভীর আরও অন্ধকার।

মাধব চোখ তুলে ওদিকটা একবার দেখল।

'ওখানে দিদি মরতে গেছে কেন!' একটা চাপা গোসা নিয়ে সে গজগজ করে উঠল। 'ঠিক সাপের কামড় খেয়ে মরবে।'

'আমার মনে হয় কালাকে ছেড়ে দিয়েছিল, বদমাইসি করে ওটা ওদিকে ছুটে গেছে, কাজেই সুখাকেও পেছনে ছুটতে হচ্ছে।'

'আমি কালাকে আর রাখব না। টিবিতে ছেড়ে দিয়ে আসব। দেখি অন্য একটা বাচ্চা ধরতে পারি কি না। কালার মতন হাড় বদমাস বাচ্চা আমি দুটো দেখিনি—'

হঠাৎ মাধবের হাত চেপে ধরল সীতাংশু। তার কথা থেমে গেল। সীতাংশুর দেখাদেখি বাঁদিকে চোখ ফেরাল সে। দিদিকে দেখতে পেল। কালা ঠিক কাঁধে চেপে চুপ করে বসে আছে। তবে গালের সঙ্গে মুখ ঠেকিয়ে রাখে নি। ঘাড় সোজা করে দু'কান তুলে দিয়ে বনের গাছপালা দেখছে। খুবই শান্তশিষ্ট চেহারা। দেখে মনে হয় না সুখীর কোল ছেড়ে বদমাইসি করে তেঁতুল বনের দিকে ছুটে গিয়েছিল। যেন তখন থেকে সুখীর কাছেই আছে।

সত্যি, ওধারের বড় সেগুন গাছটার পাশ কাটিয়ে সুন্দর মানুষটা যখন আস্তে আস্তে এদিকে হেঁটে আসছিল, মনে হলো, জঙ্গলের ভিতরটা যেন হঠাৎ আলো হয়ে গেল। ঘাড়টা একটু পিছনে হেলান, খোঁপাটা পিঠের কাছে লেগে আছে। চিবুক তুলে ধরে মাধবের দিদি গাছের মাথা দেখতে দেখতে আসছে। যেন মনে মনে কিছু খুঁজছে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটা মানুষকেও সেগুনের মোটা গুঁড়িটার আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। তালগাছের মতন লম্বা, কালো মিশমিশে গায়ের রং, ঝাঁকড়া চুল মাথায়, কপাল ও মাথার দিকটা ঘিরে লাল মতন একটা পট্টি বাঁধা। সম্ভবত চুলটা হাওয়ায় এলোমেলো হয়ে উড়বে বলে এভাবে পট্টি বেঁধে রেখেছে। জামাকাপড় বলতে গায়ে কিছুই নেই। খালি গা। পরনের কাপড়টাও হাঁটুর কাছে এসে থেমে গিয়েছে। তাই সবটা পা-ই চোখে পড়ছিল। যেন শক্ত মজবুত দুটো কাঠের গুঁড়ি, আবলুশ কাঠের কথা মনে পড়িয়ে দেয়।

'কে ওটা।' মাধব বিড়বিড় করে উঠল। 'দিদির সঙ্গে তো ওদিক থেকে বেরিয়ে এল দেখছি।'

'লোকটার হাতে একটা খাঁচা না ?' সীতাংশু ভুরু কুঁচকোল।

'তাই তো', মাধব ঘাড় নাড়ল, 'পাখির খাঁচা।'

'তাহলে পাখিঅলা।' সীতাংশু কতকটা নিশ্চিন্ত হলো। 'দু'জনেই গাছের মাথা দেখছে। পাখি খুঁজছে।'

'তাই হবে।' মাধবের রাগটা নিমেষে উড়ে গেল। চোখে একটা খুশির ঝিলিক দেখা গেল। 'কাল দিদি বলছিল, খরগোসের বাচ্চার চেয়ে পাখি পোষা ঢের ভাল, ঝামেলা কম আনন্দ বেশি।'

'যার যেটা পছন্দ।' সীতাংশু মনে মনে বলল, 'হঠাৎ ঐ পাখিঅলাকে সে পেল কোথায়।'

'পাখিঅলার সঙ্গে দিদিব দেখা হয়ে ভালই হলো। দোয়েল ফিঙ্গে বুলবুল শালিক ময়না টিয়ে—অনেক পাখি এই জঙ্গলে। পছন্দমতন দুটো একটা পাখি দিদিকে ধবে দিতে পারবে খুব—'

তার কথা থেমে গেল। মানুষ দুটো এসে সামনে দাঁড়াল। লম্বা জোয়ান মানুষটার পাশে দিদিকে ছোট্ট পুতুলটির মতন দেখায়। সেই যে সেবার পিয়ালীছড়ার মেলায় মাধব প্লাসটিকের পুতুলগুলি দেখে এসেছিল। লাল গোলাপী গাল, গোলাপী হাত-পা। এমন মিশমিশে কালো রং এই পাখিঅলার, আর দিদির এমন চমৎকার টুকটুকে গায়ের রং, তাই ঝপ করে মেলার পুতুলের ছবি তার মনে পড়ে গেল। দিদির পেছনে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা, কিন্তু এমন গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে, দিদির কাঁধের ওপব তার নিশ্বাস এসে পড়ছে। দেখে এত খারাপ লাগল, যেন তার ইচ্ছাই করছিল চেঁচিয়ে পাখিঅলাকে সাবধান করে দেয়, 'একটু সরে দাঁড়াও তো বাপু, মেয়েছেলের গা ঘেঁষে দাঁড়াবার কোনো মানে হয় না।' অথবা দিদিকে বলে, 'তুই একটু সামনে সরে এসে দাঁড়া দিদি, কেমন গুণ্ডার মতন চেহারা মানুষটার, চোখ দুটো জবাফুলের মতন লাল, হয়তো গাঁজাটাজা টেনে এসেছে।'

কিন্তু দিদিকে এভাবে সাবধান করার আগেই সে দেখল ঘাড়

ঘুরিয়ে দিদি ফিক করে হেসে পাখিঅলাকে বলছে, 'আমাদের বাবু', সঙ্গে সঙ্গে চোখটা আড় করে দিদি সীতাংশুকে দেখাল, তারপর মাধবকে দেখিয়ে বলল, 'আর এই আমার ছোট ভাই।'

পাখিঅলা একটা হাত তুলে কপালে ঠেকাল। 'নমস্কার কর্তা!'

সীতাংশু ঘাড়টা ঈষৎ নাড়ল।

মাধবের মুখের দিকেও লাল চোখ দুটো একবার ঘুরিয়ে ধরতে চেয়েছিল পাখিঅলা, কিন্তু মাধব সঙ্গে সঙ্গে চোখটা অন্যদিকে সরিয়ে নিল।

দিদি হাসছে। হাসিটা তার কানে এল।

নিশ্চয় পাখিঅলা দিদিকে পাখি ধরে দেবে। তাই দিদি এত খুশি।

'কোথায় থাক তুমি?'

'আমি চণ্ডীপুরের মানুষ কর্তা।'

'কিন্তু এখানে তো তোমায় আর কোনোদিন দেখি নি!' সীতাংশু একটা ঢোক গিলল।

'কাল এসেছিল।' সুখী বলল, 'কালই আমায় বলে গিয়েছিল, আমায় পাখি ধরে দেবে।'

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর আবার আমলকীতলায় চমৎকার সভা বসল।

হুঁ, ঘাসের ওপর শোয়ানো সেই শুকনো নারকেলগাছের গুঁড়ির ওপর তিনজন পা ঝুলিয়ে বসেছে। শীতের রোদ তিনজনের পিঠে পিছলে পড়ছে।

খরগোসের বাচ্চাটাকে ঘাসের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। একটা ন্যাকড়ার বল বানিয়ে দিয়েছে মাধব। বলটা নিয়ে কালা একলাই খেলা করছে।

মাধব তার দিকে তেমন মন দিতে পারছে না, সীতাংশুও না। দু'জনের চোখ সুখীর হাতের খাঁচাটার দিকে। খাঁচার ভিতর পাখিটা চুপ করে বসে আছে। ভয় তো পাবেই, সবে ধরা হয়েছে। তাছাড়া এখনও, যাকে বলে একেবারে দুধের ছানা, অপুষ্ট পাখা, ঠোঁটের ভিতরটা রক্তের মতন লাল, গলাটা কত সরু, চিঁ চিঁ করে ডাকছে। পালকের রং এখনও ধোঁয়ার রঙের, ধোঁয়ার সঙ্গে একটু হলুদের ছিটে, ঘাড়ের রোঁয়া খাড়া হয়ে আছে, পাতলা সরু সরু ধোঁয়ার রঙের রোঁয়া।

এই নিয়েই আলোচনা করছিল তিনজন। কবে পালকের আসল রং দেখা দেবে, ডানা শক্ত হবে, ঘাড়ের রোঁয়া মোটা হয়ে ঘন হয়ে একটা সবুজ চকচকে মালার মতন রেখা জেগে উঠবে, আর তখন ঠোঁটের ভিতরটাও এত লাল থাকবে না, ঠোঁটের ওপরটা এমন মেটমেটে না থেকে একেবারে হলদে হয়ে যাবে এবং ডানার নিচের দিকে ক'টা লাল পালক গজিয়ে ওপরটা নীলাভ সবুজ পালকে ছেয়ে যাবে। হুঁ, তখন সে সাবালক, যৌবন এসে গেছে শরীরে। এখনও অবশ্য দেরি আছে। তার আগে যত্ন করতে হবে, ভাল করে খাওয়াতে হবে। তবে তো শিস দেবে গান গাইবে।

সুখীই বেশি কথা বলছিল। পাখিঅলা তাকে সব বলে গেছে। এই দানা খাওয়াতে হবে, এই পোকা ধরে খেতে দিতে হবে। গরম পড়লে ঠাণ্ডা জলে চান করাতে হবে, ঠাণ্ডার সময় নিচে খড় বিছিয়ে খাঁচার ওপরটা একটা পাতলা কাপড় দিয়ে ঘিরে রাখতে হবে। ভয়ানক বাবু পাখি, চট করে অসুখে পড়ে যায়, একবার অসুখ করলে বাঁচিয়ে তোলা এদের শক্ত।

'এ জাতের পাখি আমাদের জঙ্গলে বড় একটা দেখা যায় না।'

'তাই বলছিল পাখিঅলা।' সীতাংশুর দিকে চোখ তুলল মাধবের দিদি। 'শীতের সময় আসে, ঠিক তিন মাস থাকবে এই তল্লাটে, তারপর আবার উড়ে যাবে।'

'কোথায় যাবে?' মাধব বড় করে একটা ঢোক গিলে দিদির চোখ দুটো দেখল।

'উত্তর দেশে চলে যায় ওরা।' সুখী থুতনি তুলে বনের উত্তর দিকটা দেখাল। মাধবও সেদিকে চোখ ফেরাল। সীতাংশু সেদিকে তাকাল না, তার চোখ ছিল সুখীর মুখের দিকে, বাঁ পাশটা দেখছিল। চিবুকের ডৌলটা সুন্দর।

'আবার আসবে পাখিঅলা, সাতদিন পর এসে দেখে যাবে আমরা কেমন যত্ন করছি এর।' সুখী আদুরে চোখ নিয়ে খাঁচার ভিতরটা দেখল।

মাধব বলল, 'লোকটার বাহাদুরী আছে, সেই দেবদারু গাছের মাথায় বাসা বেঁধেছে—কেমন করে ঠিক টের পেয়ে গেল, আর অমনি তরতর করে লাফিয়ে উঠে ঠিক একটা ছানা নিয়ে তবে নিচে নেমে এল।'

পাখিঅলার বাহাদুরীটা যে দেবদারু গাছে লাফিয়ে ওঠা, অথবা আর কেউ যখন টের পেল না চোখে দেখল না গাছের কোন মগডালে পাতার ঝোপের ভিতর একটি পাখির বাসা লুকোনো আছে, কেবল পাখিঅলাই টের পেল—তা না হলে হাত বাড়িয়ে একটা ছানা তুলে আনা তেমন কি বাহাদুরী, ছেলেবেলায় পাড়াগাঁয়ে কত ছেলেকে এভাবে পাখির ছানা চুরি করতে দেখেছে সীতাংশু।

'ওর নাক যে অন্যরকম।' সুখীর চোখের পাতা হঠাৎ বুজে এল। যেন চোখ বুজে পাখিঅলার খড়্গের মতন খাড়া নাকটা কল্পনা করল। 'আমাদের মতন নাক থাকলে কি আর পাখি ধরতে পারত, কখনই পারত না।' চোখ খুলে সে সীতাংশুর চোখের দিকে তাকিয়ে হাসল। 'ও ঠিক গাছতলায় দাঁড়িয়ে গন্ধ পেয়েছে—দেবদারু গাছের মাথায় পাতার ঝোপের ভিতর পাখির বাসা আছে, কেবল বাসা থাকলেই হলো না, ডিম ফুটে বাচ্চা বেরিয়েছে সেই গন্ধও পাখিঅলার নাকে লাগল।'

'তাই তো!' মাধবের চোখ দুটো গোল হয়ে গেল। 'এভাবে কেবল গন্ধ শুঁকে পাখির ছানা খুঁজে বার করা চাট্টিখানি কথা না।'

সীতাংশু চুপ থেকে শুনছিল।

'তবে কি না', একটু ভেবে নিয়ে মাধব আবার বলল, 'কেবল গন্ধ শুঁকে খরগোসের বাচ্চা ধরা যায় না, ওই শালাদের ধরা ভয়ানক শক্ত।'

'তাই তো!' মাধব এমন বিজ্ঞের মতন চেহারা করে কথা বলছে দেখে সীতাংশু মনে মনে হাসল। 'খবগোসের বাচ্চা ধরতে হলে নাক থাকা চাই, কান থাকা চাই, চোখও থাকতে হবে—তিনটে জিনিস যার আছে সে-ই খরগোস ধরতে পারবে।'

'কেন?' সুখীর চোখের পলক পড়ছিল না। 'ওরা তো মাটিতেই থাকে, ওদের ধরা এমন কি কঠিন।'

'মাটিতে থাকে মানে গর্তের ভেতর লুকিয়ে থাকে, তা গর্তের মুখটাই তো সব নয়, মাটির তলা দিয়ে সুড়ঙ্গ চলে গেছে হেই ওখানে।' মাধব আঙুল দিয়ে দূরের সেগুনগাছটা দেখাল। 'কাজেই মাটিতে কান পেতে রেখে সুড়ঙ্গের ভেতরের শব্দ শুনতে হবে—শব্দ শুনে আন্দাজ করতে হবে বাছাধনরা এখানে আছে কি সুড়ঙ্গের ওখানে গিয়ে হাঁটাচলা করছে—ভয়ানক চালাক ওরা।'

'ভয়ানক চালাক।' মাধবের কথায় সায় দিতে গিয়ে এবার সীতাংশু না হেসে পারল না। 'আর চোখও থাকতে হবে বৈকি, কেননা বাতাসের আগে ছুটে চলে ওরা, যাকে বলে কি না বিদ্যুৎ-গতি—কাজেই সমান তালে আমি যদি চোখ না চালাতে পারি, সামনে পেছনে ডাইনে বাঁয়ে দৃষ্টি না বাখি তো আমার চোখে ধুলো দিয়ে ওদের পালিয়ে যেতে কতক্ষণ, এক সেকেণ্ডের মধ্যে কোনদিকে হাওয়া হয়ে মিলিয়ে যাবে টেরও পাব না।'

'বুঝলি? বাবু কি বলছে শুনলি তো?' মাধব বড় করে নিশ্বাস ফেলল।

সুখী একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল।

'এই জন্যেই পাখি ভাল, ওরা এমন বজ্জাত হয় না।'

তেমনি বিজ্ঞের মতন মাধবও মাথা নাড়ল।

'সব খরগোস বজ্জাত হয় না, আমাদের আগের বাচ্চাটাকে তুই দেখিস নি, হুঁ ধলাকে, যেমন সুন্দর ছিল দেখতে, তেমনি স্বভাবটাও ছিল ঠাণ্ডা, এটা তো একটা পাকা বদমাস।' আঙুল দিয়ে কালাকে দেখাল মাধব, ন্যাকড়ার বলটা নিয়ে ছুটতে ছুটতে কালা সেই বাসকঝোপের কাছে চলে গেছে, দু'কান খাড়া রেখে ঝোপের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে কি যেন শুনছে। 'যেমন কালো কিটকিটে দেখতে তেমনি স্বভাবটাও হয়েছে বদ।'

সুখী ফিক করে হাসল।

'আচ্ছা, তুই ওর ওপর এত চটা কেন, আমি তো দেখি খুব ভাল ছেলে কালা, একটুও যন্ত্রণা করে না। আমাকে তো খুবই ভালবাসে।'

মাধব হঠাৎ কথা বলল না। চোয়াল দুটো শক্ত করে গুম হয়ে রইল। তার মনের ভাব বুঝল একজন। সুখীর চোখে চোখ রেখে সীতাংশু হাসল।

'তার মানে স্বভাবটা একটু নোংরা আর কি—সকালবেলা মাধবকেই খাঁচাটা পরিষ্কার করতে হয়—হেগেমুতে একাকার করে রাখে ভেতরটা। ধলা এমন ছিল না। খাঁচায় ঢুকবার আগেই এসব সেরে নিত।'

শুনে সুখী আর হাসল না, বলল, 'তা জন্তু-জানোয়ার পুষতে হলে এমন একটু-আধটু যন্ত্রণা তো পোহাতেই হবে।'

কিন্তু মাধব যে কথাটা শুনে বিশেষ সন্তুষ্ট হলো না তার চোখ দেখে বোঝা গেল। কালার খারাপ স্বভাব বলতে সে ঠিক কী বোঝাতে চাইছে দিদিকে তা ভেঙে বলা সম্ভব না। আগের মতন সে গুম মেরে রইল।

সুখী আবার পাখির খাঁচার ওপর ঝুঁকে পড়ল। লাল ঠোঁট ছুটো ঈষৎ ছুঁচলো করে শিস দিতে আরম্ভ করল। আমলকীপাতার ফাঁক দিয়ে চেরা চেরা রোদ এসে তার গালে গলায় পিঠে চিকরিকাটা আলপনা তৈরি করেছে।

না, সীতাংশু ভাবছিল, এই মানুষটিকেও রাণীরবাগের বাংলোর ঘষামাজা আঁটোসাঁটো পরিবেশের সঙ্গে মেলানো যায় না। নিজে ছিমছাম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে চায় এবং অন্য মানুষকেও তাই থাকতে দেখতে ভালবাসে; কিন্তু তা হলে হবে কি, তার মধ্যেও যে একটা বন্ধনহীন মন বাসা বেঁধে আছে সীতাংশু চোখের ওপর দেখছে। যেন সেও এই বন আকাশ মাটি রৌদ্র ও হাওয়ার সঙ্গে মিশে থাকতে পারলেই সুখী। সুখী যখন সীতাংশুর এখানে এসে কাজ করছে—করছে, বাকি সবটা সময় তার কাটছে আমলকীতলায়, হিজলবনে কি পলাশঝোপের কাছে, কালাকে খেলা দিচ্ছে ঘাস ছিঁড়ে খাওয়াচ্ছে, আর চোখ তুলে তুলে গাছের মাথায় পাখি দেখছে। এবার তার হাতে পাখি এসে গেছে। কোথাকার কোন্ পাখিঅলা, দেখা হওয়া মাত্র তার সঙ্গে ভাব করে ফেলল এবং একটি পাখির ছানাও আদায় করল। পাখি পেয়ে সে তৃপ্ত প্রসন্ন। যেন পৃথিবীতে আর কিছু তার কাম্য নেই।

তা হলেই, সীতাংশু চিন্তা করল, জঙ্গল ভালবাসে; জঙ্গলের পশু-পাখি ভালবাসে। জঙ্গলের লতাপাতা ঘাস-গুল্মের গন্ধ বুক ভরে নিতে চায় এমন আর একটি মানুষ এখানে এসে জুটল। এতদিন একটি কিশোরকে সঙ্গী হিসাবে পেয়েছিল সীতাংশু, এখন থেকে আর একজন দলে এসে ভিড়ল।

সীতাংশু চোখ তুলে পলাশঝোপের দিকে তাকাল। কালাকে হঠাৎ দেখা গেল না। ঘুঙুরের শব্দও আর শোনা যাচ্ছিল না।

'কোথায় গেল ওটা?' সুখী বিড়বিড় করে উঠল। কেবল

পাখি নিয়ে মত্ত নেই সে, খরগোসের বাচ্চাটার ওপরও চোখ রেখেছে বুঝতে পেরে সীতাংশুর এত ভাল লাগল।

'মনে হয় ঝোপের ভেতর ঢুকে পড়েছে।' মাধবকে স্থির হয়ে বসে থাকতে দেখে সীতাংশু তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়াল। 'একবার ওখানে উঁকি দিয়ে দেখতে হয়।' বলে সে সেদিকে এগোতে লাগল।

'দাঁড়ান।' খাঁচাটা হাতে ঝুলিয়ে সুখীও উঠে দাঁড়াল। তার মুখের চিকরিকাটা আলপনা ভেঙেচুরে একাকার হয়ে গেল। এক সময় থোকা থোকা অশ্বত্থ পাতার ছায়া তার মাথায় বুকে ঝুলতে লাগল। অশ্বত্থ গাছের নিচে দাঁড়িয়ে সীতাংশু অপেক্ষা করছিল। সুখী সেখানে এসে দাঁড়াল।

আর দু'পা এগিয়ে গেলে পলাশবন।

কিন্তু ঘাড় ঘুরিয়ে সীতাংশু মাধবের দিদিকে দেখতে লাগল। মুখ চোখ ভুরু চুল।

শীতের বেলা শেষ হয়ে এল। রৌদ্রে এখন অতসীফুলের রঙ ধরেছে। ঝিঁঝি ডাকছে। স্তব্ধ স্তিমিত বন থেকে একটা মিষ্টি গন্ধ উঠে আসছে। ঠিক এমন সময় যৌবনবতী সুন্দর মানুষটিকে চোখের সামনে দেখে সীতাংশুর মনে হলো এই বুঝি বনলক্ষ্মী। বনেই তার আসল রূপ ফোটে, বনই তার যথার্থ স্থান, ঘর-দুয়ার কিছু না। ঘরটা খামকা। তা ছাড়া একটা ঘর ছেড়ে তো চলেই এসেছে।

'এবেলা আর কুয়ো থেকে জল তুলতে হবে না, উনুন ধরাতে হবে না, বাটনা বাটারও দরকার নেই।' সীতাংশুর যেন বলতে ইচ্ছা করছিল, 'একটু পর অন্ধকার হবে, রুপোর থালার মতন এতবড় চাঁদ উঠবে, জঙ্গলের ভেতর চাঁদের আলো ও ছায়ায় লুকোচুরি খেলা আরম্ভ হবে। আমি তুমি মাধব সারারাত ঘুরে ঘুরে আলো-ছায়ার খেলা দেখব, অথবা আমরা তিনজনেও লুকোচুরি খেলব।'

কিন্তু সেসব কিছুই না বলে সে মিটিমিটি হাসতে আরম্ভ করল। সুখী একটু অপ্রস্তুত হলো।

কাজেই এভাবে মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে হেসে মাধবের দিদিকে আর লজ্জায় না ফেলে সে তাড়াতাড়ি বলল, 'মাধব কিন্তু এল না।'

'মন খারাপ করে এখনো গাছের গুঁড়ির ওপর বসে আছে।'

'ধলাটা মরে গিয়ে ওর মন খুব খারাপ হয়ে গেছে। তাই দেখছি ক'দিন ধরে।'

'উঁহুঁ, তা নয়। আসলে কালা আমাকে ভালবাসে বলে কালার ওপর ওর হিংসে, দু'চোখে ওটাকে দেখতে পারছে না।' কথা শেষ করে সুখী হাসল।

'তাই বলল বুঝি এখন ?' সীতাংশু একটু অবাক হলো। তা হলে দিদিকে মুখ ফুটে কথাটা বলতে পেরেছে মাধব ?

কিন্তু সুখী ঘাড় নাড়ল।

'ও নিজের মুখে কিছু বলে নি, আমি ওর হাবভাব থেকে বুঝেছি, চোখ দেখে ধরেছি। কালার জন্যে এত করছে ও, তবু কালা ঘুরেফিরে আমার কাছে আসে, আমার গা ঘেঁষে দাঁড়ায়।'

সীতাংশু কথা বলল না। তেতো-মতন একটা ঢোক গিলল শুধু।

পাখির খাঁচাটা হাতে ঝুলিয়ে সুখী হাঁটতে লাগল। সীতাংশু হাঁটতে আরম্ভ করল।

'ভালবাসার কাঙাল হবে আমার এই ভাইটি,' যেন অনেকটা নিজের মনে সুখী বলল, 'এখন থেকে বোঝা যায়।'

'মনটা নরম।' সীতাংশু তৎক্ষণাৎ না বলে পারল না। 'ধলার জন্যে খুব কান্নাকাটি করেছিল তোমার ভাই।'

'কেউ মারা গেলে একটু কাঁদা ভাল।' এবার পাশাপাশি হয়ে তারা হাঁটছিল। পায়ের তলায় শীতের শুকনো পাতার মচমচ শব্দ হচ্ছিল। 'কিন্তু আমি বলছি কি—' আড়চোখে সুখী মনিবের মুখটা দেখল। 'যখন বড় হবে এই ছোঁড়া, কারো ভালবাসা না পেলে কেঁদে খুন হবে, এখন থেকেই বেশ বোঝা যায়।'

'মানে ও নিজেও কাউকে খুব ভালবাসবে, তাই না ?' সীতাংশুও চোখ আড় করে মাধবের দিদির মুখ দেখল।

'এই জন্যই তো মরবে, এই জন্যই কেঁদে বুক ভাসাবে।'

যুবতী থমকে দাঁড়াল। গলার স্বরটা এমন, যেন শাণের গায়ে ছুরির ফলা লেগে আগুনের ফুলকি উঠল। সীতাংশু চমকে উঠল। আনারস পাতার ওপর একটা টিকটিকি বিকেলের নরম রোদ পোহাচ্ছে। কালো চোখ দুটো একটু সময় সেদিকে ধরে রেখে মাধবের দিদি কী ভাবল, তারপর চোখটা ফিরিয়ে আনল।

'এই জন্যই আমি কাউকে ভালবাসি না, বড় বিচ্ছিরি জিনিস, নিজের মতন করে থাকলাম খেলাম ঘুরলাম কি ঘুমোলাম—তাই যথেষ্ট, খামকা দুঃখু ডেকে এনে লাভ কি।'

চমকে উঠল সীতাংশু। কিন্তু চমকের ভাবটা চোখে জাগতে দিল না। হাসল। তারপর, যেন খুব সতর্ক হয়ে, গাছের পাতার দিকে চোখ রেখে আস্তে আস্তে বলল, 'তাহলেও কিছু কিছু ভালবাসা বুকে থেকে যায়, ভালবাসা একেবারে ছাড়া যায় না।'

'কেন! কিরকম?' সুখী চোখ বড় করল। একটা ঢোক গিলল। তারপর মাথা ঝাঁকাল।

'আমার মধ্যে এক ফোঁটা ভালবাসা নেই, সব ঝেঁটিয়ে পরিষ্কার করে দিয়েছি।' কথা শেষ করে সে হাসল।

অপরাধীর চোখ করতে পারত সীতাংশু, কিন্তু সেটা কাটিয়ে উঠল। যেন নিজের যুক্তি ধরে রাখার মতন কিছু পুঁজি তখনও তার হাতে রয়েছে। 'আমি তো দেখছি একরত্তি ওই পাখির ছানাটাকে আনা থেকে যেমন আদর করা হচ্ছে, কালাকে কোলে নিয়ে কথায় কথায় যেমন চুমু খাওয়া হয়—' তৃতীয় পুরুষের মতন করে সীতাংশু কথাটা বলল। 'পশু-পাখি দিয়েই ভেতরের ভালবাসার চেহারাটা বোঝা যায় কি না।'

'ও, আপনি সেকথা বলছেন!' ডান হাতে পাখির খাঁচা, বাঁ-

হাতের পিঠ দিয়ে মুখের গর্তটা আড়াল করে যুবতী অল্প শব্দ করে হেসে উঠল। 'মাধবের মতন আপনিও ভুল করছেন, উঁহুঁ ভালবাসার ধারেকাছেও আমি নেই, ভাল লাগতে পারে—এই পর্যন্ত। দেখবেন, যখন ভাল লাগবে না আমি ভুল করেও এদের দিকে তাকাব না, দরকার হলে খাঁচাটা খুলে এটাকে একদিন জঙ্গলে উড়িয়ে দেব, কালা কোলে উঠতে চাইলে কান ধরে কোল থেকে নামিয়ে দেব—পা দিয়ে ঠেলে দূরে সরিয়ে দেব, একটুও মনে লাগবে না, আমি তখন ভয়ানক কঠিন।'

যেন বিশ্বাস করতে বাধছিল, তাহলেও সীতাংশু দেখল পান-খাওয়া লাল ঠোঁটে হাসির ঝিলিক নিয়ে যুবতী তার কালো ঢলঢল চোখের তারা ইস্পাতের মতন কঠিন করে তুলল। সেই সঙ্গে চিবুকটা শক্ত হয়ে উঠল, নাসারন্ধ্র স্ফীত হলো।

সীতাংশু তৎক্ষণাৎ মাটির দিকে চোখ নামাল।

তাই তো, এই মূর্তি সে আগে দেখে নি। রাণীরবাগের বাংলোয় ভালবাসার অথৈ সমুদ্র দেখে এসেছে। এখানে তার সামনে দাঁড়িয়ে ধূ-ধূ মরুভূমি। রিক্ত দীর্ণ নিঃস্ব। যেন ভালবাসার ছিঁটেফোঁটা মেঘ এখানে কেউ আশা করতে পারে না।

খুব খারাপ লাগছিল সীতাংশুর, এই শীতের শেষ বেলায়ও তার জলতেষ্টা পেল।

হয়তো পা পা করে ঘরে ফিরে আসত সে। শুকনো পাতার মচমচ শব্দ করে ঝোপের ভিতর থেকে কালা হঠাৎ বেরিয়ে এল।

গাছের পাতা দেখছিল সুখী। পায়ের দিকে তাকাল। কালা এসে সেখানে নাক ঘষছে থুতনি ঘষছে। রাঙা টুকটুকে বুড়ো আঙুলটা শুঁকছে।

সীতাংশু আঁৎকে উঠল। তখনি নুয়ে হাত বাড়িয়ে কালাকে কোলে তুলে নিত। ফরসা পায়ের ধাক্কা খেয়ে বেচারা না ওপাশের কাঁটালতার ওপর ছিটকে পড়ে।

কিন্তু দেখল তার আশঙ্কা সত্য না। চোখের নিমেষে আর একজন তাকে কোলে তুলে নিয়েছে। এক হাতে পাখির খাঁচা আর এক হাতে কালাকে বুকের কাছে ধরে সুখী পলাশঝোপ পিছনে রেখে একটু একটু করে সরে যাচ্ছে।

সীতাংশুর রাগ হলো। তবে আর এই ছেলেভোলানো ভালবাসা কেন, কৃত্রিমতা কেন। তার ইচ্ছে করছিল ছুটে গিয়ে কালাকে কোল থেকে নামিয়ে নিয়ে আসে।

কিন্তু পরমুহূর্তে একটা কথা মনে পড়ে, সে স্থির স্তব্ধ হয়ে গেল। না, যুবতীব সবটাই মরুভূমি না, হয়তো ভালবাসা ছিল, এখনও আছে, ফল্গুধারা হয়ে হৃদয়ের গভীরে লুকনো রয়েছে, মাথাচাড়া দিয়ে ওপরে উঠতে চাইলেই জোর করে চাপা দিতে চাইছে, তাই নিষ্ঠুরতার ভান, এমন দীঘির মতন কালো ঠাণ্ডা চোখ আচমকা ইস্পাতের মতন কঠিন হয়ে ওঠে।

কেনই বা তা হবে না। সীতাংশু একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল। নিশ্চয়ই মাধবের দিদি একদিন, যাকে বলে ভালবাসার ঘর বাঁধতে চেয়েছিল, একজনকে ভালবাসতে গিয়েছিল, তারপর পীড়ন পেয়ে নিগ্রহ পেয়ে সেখান থেকে ফিরে এসেছে। 'অমন সাদা ধবধবে চামড়া আমার সুখীর, কিন্তু পিঠটা নেই, মরা সাপের মতন কালো কালো দাগ, যদি একবার দেখেন চোখের জল রাখতে পারবেন না বাবু।' কানের কাছে মুরারির গলার স্বরটা যেন হঠাৎ শুনল সীতাংশু।

আর সে দাঁড়িয়ে থাকল না।

আমলকীতলার দিকে হাঁটতে আরম্ভ করল। একটা সমস্যার সমাধান খুঁজে পেল সে। ভালবাসতে গিয়ে যুবতী ঘেন্না পেয়েছে অমানুষিক যন্ত্রণা পেয়েছে, তাই ভালবাসার নাম শুনলে সে এখন জ্বলে ওঠে, অথবা হাসে।

বিষাদের তিক্ত হাসিও রূপসী মেয়ের মুখে কেমন সুন্দর লাগে,

চোখ বুজে ছবিটা আর একবার কল্পনা করল সীতাংশু। তাই, মনে মনে বলল সে, তেতো উচ্ছের ফুল দেখতে কম সুন্দর কি, অমন বিষে ভরা ওলের ফুলও কেমন দগদগে আগুনের আভা নিয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকে।

মাধবের দিদির বুকে যদি ছিঁটেফোঁটা ভালবাসা নাও থাকে তো তাতে দোষ দেবে সে কেমন করে। রিক্ত ধূসর মরুভূমির একটা আলাদা সৌন্দর্য আছে না?

সীতাংশু কিন্তু চোখ খুলে আর মাধবের দিদিকে দেখতে পেল না।

পলাশ ফুলের রঙের শাড়ি পরে রাণীরবাগের সেই সুন্দরী মহিলা দাঁড়িয়ে আছে—আমলকীতলার জায়গাটা আলো হয়ে গেছে।

পিছনে ডাক্তারের মোটরবাইক দাঁড় করানো।

একলা আসে নি মহিলা, স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে টিয়াটুলির জঙ্গল দেখতে এসেছে। সীতাংশুর চোখ রণধীরকে খুঁজছিল। শুকনো ঢোক গিলে সে আমলকীতলার দিকে এগোতে লাগল।

'তারপর?' সীতাংশুর চোখে চোখ রেখে ডাক্তার হাসল। 'আমি তোর ডেরার ভেতর ঢুকে তো চিনতেই পারি নি, একেবারে ভোল পাল্টে ফেলেছিস—পর্দা পাপোষ ফিনফিনে বিছানা টেবিলে গোলাপ ফুল—ব্যাপারটা কি বলতে পারিস!'

ব্রততী মিটিমিটি হাসছিল। কিন্তু তার চোখ ছিল মেয়েটির দিকে। ছিমছাম নিটোল গড়ন। কত চুল মাথায়! কী চমৎকার গায়ের রং।

সুখী ঘাড় গুঁজে চা ঢালছিল। রণধীরও থেকে থেকে চোখ আড় করে সুখীকে দেখছিল। দিদির পিছনে মাধব দাঁড়িয়ে। মাধবের কোলে খরগোসের বাচ্চাটা ব্রততী আগেই লক্ষ্য করেছে।

'এই ছেলেটিকে আমি আগেও দেখেছি—তাই না সীতাংশু!'

বন্ধুর কথা শুনে সীতাংশু ঈষৎ হাসল। বস্তুত কেবল তার ঘরের চেহারা না, এখানে আর একটি মানুষকে দেখে কর্তা-গিন্নী দুজনেই অতিমাত্রায় অবাক হয়ে গিয়েছে, সীতাংশু দুজনের চোখ দেখে বুঝতে পারছিল। 'হুঁ, না দেখবার তো কিছু নেই, আমার করাতী মুরারির ছেলে, নাম মাধব।' ঘাড় কাত কবে সে ব্রততীর দিকেও একবার তাকাল, তারপর রণধীরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'আর এটি হলো মাধবের দিদি।'

'অ!' স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে অস্ফুট শব্দ করে উঠল। এবং দুজনেই আবার গভীর মনোযোগের সঙ্গে সুখীকে দেখল। কিন্তু এটুকু পরিচয় পেয়েই তারা সন্তুষ্ট হতে পারছে না, লক্ষ্য করে সীতাংশু আবার ঠোঁট টিপে হাসল।

সুখী চায়ের কাপগুলি টেবিলে সাজিয়ে দিল। টিন থেকে বিস্কুট খুলে একটা প্লেটে রাখল।

'তোমার নাম কি?' ব্রততী এবার সরাসরি প্রশ্ন করল। সুখী অল্প হেসে চোখ তুলল।

'আমার নাম সুখী।'

কিন্তু তারপর? ব্রততী যেন আর কিছু প্রশ্ন করতে সাহস পাচ্ছে না। সীতাংশু চুপ। রণধীরও নীরব। চায়ের কাপ হাতে তুলে নিয়ে সে অগত্যা মাধবের দিকে ঘাড় ফেরাল।

'বাচ্চাটা কবে ধরা হলো?'

'সাত আটদিন হয়ে গেল।' এমন একটা প্রশ্ন কেউ করুক মাধব প্রতিমুহূর্তে আশা করছিল। উৎসাহের চোখ নিয়ে সে কালাকে আর একবার দেখল এবং তখনি কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে এঁদের চোখের সামনে তাকে একটু খেলাটেলা দেবে কি না চিন্তা করল।

'তোমার বাচ্চা পোষ মেনেছে?'

'হুঁ।' ব্রততী প্রশ্ন করতে মাধব তার দিকে চোখ ঘুরিয়ে লক্ষ্য

করে ঘাড় কাত করল। ‘দেখবেন কেমন পোষ মেনেছে!’ সব ক’টা দাঁত ছড়িয়ে দিয়ে কিশোর হাসল।

‘এখন না, একটু পরে।’ সীতাংশু বলল, ‘চা-টা খাওয়া হয়ে যাক, তারপর ওঁরা কালার খেলা দেখবেন।’ বলে সে রণধীরের দিকে চোখ ফেরাল। কেননা ডাক্তার এবং ডাক্তারগিন্নী যে খরগোসের বাচ্চার খেলা দেখার চেয়ে অন্য কিছু দেখতে জানতে বেশি উৎসুক হয়ে উঠেছিল, তাদের চেহারা দেখে সীতাংশু প্রতিমুহূর্তে টের পাচ্ছিল।

রণধীর তার দামী সিগারেটের প্যাকেট খুলে ধরতে সীতাংশু হাত বাড়িয়ে একটা সিগারেট তুলে নিল।

‘সত্যি, এত ভাল লাগছে—একসঙ্গে দুজন আমার ডেরা দেখতে আসবেন, এ যেন স্বপ্নের বাইরে।’ সীতাংশু ব্রততীর দিকে তাকাল।

‘কেন?’ ব্রততী ভুরু পাকাল। ‘আপনি কি স্বপ্নাতীত কিছু হয়ে গেছেন বলে নিজের ধারণা?’

‘ধারণা কেন, অলরেডি হয়েই গেছে।’ রণধীর চেয়ারের পিঠে মাথা এলিয়ে দিয়ে এক গাল ধোঁয়া ছাড়ল। ‘ঘরে পা দিয়েই তো বুঝতে পারছি ব্রাদারের সেই আগের দিনকাল আর নেই।’

সীতাংশু তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি আড় করে মাধবের দিদিকে দেখল। দিদি কিন্তু মাধবের বুদ্ধিমতী। দাঁড়িয়ে থেকে কথা না শুনে ঘাড় গুঁজে চায়ের পট্ কেটলি ছাঁকনি সব গুছোতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তারপর সেগুলি হাতে তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে তখুনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বলতে কি, সীতাংশু এবার হালকা নিশ্বাস ফেলল। সুখী দাঁড়িয়ে আছে, এবং প্রায় তাকে কেন্দ্র করেই স্বামী-স্ত্রীর বিস্ময় কৌতূহল ক্রমশ জমাট বেঁধে উঠছিল, দুজনের টীকা-টিপ্পনী এখন সেদিক-ঘেঁষেই আরম্ভ হয়েছে চিন্তা করে ভিতরে ভিতরে সীতাংশু কম বিব্রত হয়ে পড়ছিল কি। সুখী বেরিয়ে যেতে সে মাধবের দিকে চোখ ফেরাল। কালাকে কোল থেকে মাটিতে নামিয়ে তাকে দিয়ে

খেলা দেখাবার জন্যই যেন ছোট্ট মানুষটি তৈরি হয়ে আছে। কিন্তু অনিশ্চিত অবস্থাটা কাটছিল না বলে তার উৎসাহটা তেমন করে জ্বলে উঠতে পারছিল না। অথবা কখন চা খাওয়া শেষ হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার ওপর খরগোসের বাচ্চার খেলা দেখাবার হুকুম হয়ে যাবে তার জন্য সে অপেক্ষা করছিল।

'মাধব!' সীতাংশু অন্যরকম বলল, 'তুই বরং ততক্ষণ একটু বাইরে গিয়ে কালাকে নিয়ে খেলা কর, আমরা দু-একটা জরুরী কথা সেরে নি।'

মুখ কালো করে মাধব কালাকে কোলে তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

'মন খারাপ হয়ে গেল কিন্তু ছোঁড়ার।' দরজার দিক থেকে চোখ সরিয়ে এনে ব্রততী সীতাংশুর মুখের দিকে তাকাল।

'তা একটু হয়েছে।' সীতাংশু মৃদু হাসল।

'সামান্য একটু খেলা দেখিয়ে গেলে পারত।' রণধীরও হাসল। 'আপাতত তার শখটা মিটত।'

'সারাদিনই একে-ওকে ডেকে খেলা দেখান হচ্ছে।' চা শেষ করে রণধীরের প্যাকেট থেকে আর একটা সিগারেট তুলে নিল সীতাংশু।

টেবিলের শূন্য কাপগুলি একপাশে সরিয়ে রাখতে রাখতে ব্রততী বলল, 'ভাই বোন দুজনেই সুন্দর।'

স্ত্রীর চোখের দিকে তাকিয়ে রণধীর হঠাৎ কেমন নীরব হয়ে রইল। যেন কিছু ভাবতে লাগল সে। কী ভাবতে লাগল তা-ও সীতাংশু কতকটা আঁচ করতে পারছিল। আর চুপ করে থাকা সমীচীন মনে করল না সে।

'হুঁ, মাধবের দিদি আমার ঘরের কাজকর্ম করে দিচ্ছে। আমিই ওর বাপকে বলে কাজে লাগিয়ে দিয়েছি। তা না হলে ভয়ানক বিপদে পড়ে যেত মুরারি। একটা বাচ্চা নিয়ে সুখী চলে এসেছে,

স্বামীর কাছে থাকতে পারে নি। অত্যাচার করে, মারধর করে সে বৌকে। মুবারির ইচ্ছা নেই মেয়েকে আর আসানসোলে পাঠায়। সুখীর বর সেখানে কী একটা কারখানায় চাকরি করে।' এই পর্যন্ত বলে সীতাংশু থামল।

'সুখীও আর বরের কাছে যেতে চাইছে না নিশ্চয় ?'

'না।' ব্রততীর চোখে চোখ রেখে সীতাংশু মাথা নাড়ল। 'আমি অবিশ্যি মুরারির মেয়েকে সরাসরি কিছু জিজ্ঞেস করি নি। তবে মুরারির কথা শুনে বুঝলাম সুখীর আর আসানসোল ফিরে যাবার ইচ্ছে নেই।'

'খুবই কচি বয়েস, টেণ্ডার এজ।' রণধীর ছোট একটা নিশ্বাস ফেলল।

'আর এত রূপ গায়ে!' ব্রততী বিড়বিড় করে উঠল।

ঠিক এই মুহূর্তে দুজনের কথার কী উত্তর দেবে ভেবে না পেয়ে সীতাংশু হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটার দিকে চেয়ে রইল। না কি দুজনের চোখ এড়াবার জন্য সিগারেটের আগুন দেখল সে! 'কচি বয়স', 'গা-ভরা-রূপ' মুরারির মেয়ে সম্পর্কে এত সব কথা শোনার পর হঠাৎ কেবলমাত্র এই দুটি মন্তব্য করে তারা স্বামী-স্ত্রী অণুবীক্ষণের মতন চোখ করে সীতাংশুর মুখটা পরীক্ষা করছিল কি—তা-ও ঠিক বুঝতে পারল না সীতাংশু। দুটি মুখের দিকে সে তাকাতে পারল না, যেন তাকিয়ে কিছু আবিষ্কার করবে ভয় পেয়ে আঙুলের ফাঁকে ধরা সিগারেটটাই মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল।

'তোর করাতীর মেয়েকে আমি প্রথম দেখতে পাই নি, সম্ভবত রান্নাঘরে কাজটাজ করছিল। কিন্তু তোর এই শোবার ঘরে ঢুকে আমি এত অবাক হয়ে গেলাম। তখনই ভাবলাম, নিশ্চয় কোনো মেয়ের হাত লেগেছে এখানে, তা না হলে এত পরিষ্কার এত পরিচ্ছন্ন, এমন সাজান-গোছানো সব থাকতে পারে না।'

রণধীরের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রততী বলল, 'আমি এসেই

লক্ষ্য করেছি, ওপাশে কদমগাছের নিচে পাতকুয়া থেকে জল তুলছিল মেয়েটি, পায়ের কাছে একটি পাখির খাঁচাও দেখলাম, তখন ভাবলাম পাড়াপড়শী কারো মেয়ে, হয়তো সীতাংশুবাবুর কুয়ো থেকে জল নিতে এসেছে।'

সীতাংশু চুপ করে রইল।

সুখী আবার এসে দরজায় দাঁড়াল। ব্রততী সেদিকে চোখ ফেরাল।

'আপনারা কিন্তু খাওয়া-দাওয়া সেরে এখান থেকে যাবেন।' ব্রততীর চোখে চোখ ঠেকিয়ে সুখী সুন্দর করে হাসল।

'না না, সে কী!' ব্রততী সীতাংশুর দিকে ঘাড় ফেরাল। কিন্তু সীতাংশু কিছুই বলল না।

রণধীর বলল, 'ফিরতে অনেক রাত হয়ে যাবে, রাস্তা-ঘাট তেমন সুবিধের নয়।'

'আমি এক্ষুনি রান্না চাপিয়ে দিচ্ছি—' এবার সুখী সরাসরি রণধীরের দিকে তাকাল। 'দেরি মোটেই হবে না। চট করে হয়ে যাবে।'

'আর একদিন, আর একদিন এসে তোমার হাতের রান্না খেয়ে যাব। আজ আমরা এখনি উঠব—' রণধীর নড়েচড়ে বসল। যেন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াবার জন্য সে তৈরি হয়েছে।

সুখী অসহায় চোখে সীতাংশুর দিকে তাকাল। তাই তো, শুধু তার কথায় অতিথিরা এখানে খাওয়া-দাওয়া করতে রাজী হবে কেন? সীতাংশু একবার বলুক।

সীতাংশু ব্রততীর দিকে চোখ ফেরাল। একটু অভিযোগের সুর করে বলল, 'আমি যতদিন রাণীরবাগ গিয়েছি, না খেয়ে কিন্তু একদিনও আসতে পারি নি। কর্তা-গিন্নী দুজনে মিলে যা আরম্ভ করেন, দক্ষিণ হাতের কাজ না সেরে সেখান থেকে চলে আসার আমার সাধ্য কী।'

এবার সুখী উৎসাহ পেল।

'আপনারা গল্প করুন, গল্প করতে করতে আমার রান্না হয়ে যাবে।'

বলে আর সে দাঁড়াল না। যেন উনুনে আগুন দিতে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

'খামকা বেচারার খাটুনি বেড়ে গেল। রণধীর নতুন সিগারেট ধরিয়ে সীতাংশুর দিকে প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিল। সীতাংশু আর সিগারেট নিল না। রণধীর বলল, 'তুই যদি একটু নিষেধ করতিস, তবেই আর বেচারা এই হাঙ্গামা করতে সাহস পেত না।'

'একটু রান্না করে আমার অতিথিদের খাইয়ে যদি বেচারা আনন্দ পায় তো তাতে আমি বাধা দেব না কি।' সীতাংশু ব্রততীর চোখে চোখ রেখে হাসল।

ব্রততী হাসল না। গম্ভীর হয়ে বলল, 'আপনার মুখে সব শুনে মেয়েটার জন্যে আমার খুব দুঃখ হচ্ছে কিন্তু। নিজে দেখতে শুনতেও এত সুন্দর, হাতের কাজকর্মও দেখছি খুব পরিষ্কার—আর তার ভাগ্যটা এমন!'

'ওর জন্য দুঃখ হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু আর একদিক থেকে আমরা লাভবানই হলাম।'

সীতাংশু ও ব্রততী এক সঙ্গে ডাক্তারের মুখের দিকে তাকাল। কথাটা বলে ডাক্তার মিটিমিটি হাসছিল।

'লাভবান কোন্ হিসেবে বলছ তুমি?' ব্রততী ভুরু কুঁচকাল।

'আমাদের জংলীকে একটু ভদ্রলোক করে দিয়েছে মাধবের দিদি। দেখছ না, ঘরদোর কেমন ছিমছাম পরিষ্কার দেখাচ্ছে, তেমনি ময়লা বেশভূষাও আর তার গায়ে নেই, নিয়মিত চুল-দাড়ি কাটছে, মাথা ও মুখের দিকে তাকালে বোঝা যায়।'

এবার ব্রততী মুখে আঁচলচাপা দিল।

সীতাংশু কথা বলল না। নীরব থেকে শুধু হাসল।

ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে ব্রততী অনেকটা নিজের মনে বলল, 'আশ্চর্য, সাধারণ একজন করাতীর মেয়ে, কিন্তু রুচিটা কত সুন্দর।'

'আমার মনে হয়, মনের মতন করে স্বামীর ঘর সাজাতে গিয়েছিল বেচারা, পারে নি, তাই এখানে চাকরি করতে এসে তার শোধ তুলে নিচ্ছে। তাই না সীতাংশু? তোর ঘর গুছোবার দিকে, তোর জামাকাপড় পরিষ্কার রাখার দিকে একটু বেশি মনোযোগ দিয়েছে মাধবের দিদি, কেমন?'

সীতাংশু হঠাৎ কথা বলল না। দৃষ্টি স্থির রেখে বন্ধুর মুখটা পরীক্ষা করল। কথাটার মধ্যে আর কোনো ইঙ্গিত আছে কিনা চিন্তা করে আবার সে অস্বস্তিবোধ করল।

যেন তার মনের অবস্থাটা ব্রততী ধরতে পারল। সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'তার কোনো কথা নেই, হয়তো চিরকালই মেয়েটি এমন। বিয়ে না হতে বাপ-মার কাছে থাকতেও এমন গুছোনো স্বভাব ছিল। মিথ্যে বলছি সীতাংশুবাবু?'

সীতাংশু ঘাড় নাড়ল। রাণীরবাগের আদুরে মানুষটির ওপর আজ খুশি হয়ে উঠল। যেন একটু কৃতজ্ঞতা বোধ করল সে, হেসে বলল, 'বলবো কি, তার পরিষ্কারের ঠেলায় অনেক সময় আমার হাঁসফাঁস উপস্থিত হয়।'

'তা তো হবেই, তা হওয়া খুব স্বাভাবিক।' রণধীর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। 'এমন জংলী বনে গিয়েছিলি এখানে থেকে থেকে।'

কিন্তু সীতাংশু তার দিকে তাকাল না, তার কথা শুনতে তেমন আগ্রহও নেই এমন একটা ভান করে সে ঘাড় ঘুরিয়ে দরজার বাইরে তাকাল। রোদটুকু মিলিয়ে গেছে। গাছপালা কালো হয়ে এল।

ব্রততী উঠে দাঁড়াল।

'আমি আসছি, আপনারা গল্প করুন।'

'কোথায় চললেন?' সীতাংশু প্রশ্ন করল।

'মাধবের দিদি কেমন রান্না করছে একটু দেখে আসি।'

'তাই যাও তুমি।' রণধীর সীতাংশুর কাঁধে হাত রাখল। 'আয় ততক্ষণ আমরা দুজন মাধবচন্দ্রের খরগোসের খেলা দেখে আসি।'

সীতাংশু নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল।

খেতে বসতে একটু রাত হল বৈকি। তারপর গল্প করে খাওয়া। পীতবর্ণের ভাঙা চাঁদ উঠল ঝাউগাছের পিছনে। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ, তাই একটু বড় করে তার আবির্ভাব। কিন্তু চাঁদের দিকে কারই বা চোখ ছিল। এটুকু শুধু তারা জেনে রাখল, রাস্তায় জ্যোৎস্না পাওয়া যাবে, রাণীরবাগ ফিরে যেতে ডাক্তার ও ডাক্তাব-গিন্নীব খুব একটা অসুবিধা হবে না। তারা তখন মাধবের দিদির হাতের রান্না খেয়ে বিমোহিত হয়ে গেছে।

'হুঁ!' চোখ বড় করে ব্রততী বলছিল, 'এতবড় মাগুব মাছ চট করে কোথায় পেলেন?'

'ঘরেই ছিল। রোজ রোজ বাজার করার অসুবিধে, মাধবকে দিয়ে তার দিদি কাল হাট থেকে এত মাছ আনিয়ে হাঁড়িতে জিইয়ে রেখেছিল।'

'আচ্ছা!' সীতাংশুর দিকে তাকাল না রণধীর, মাধবের দিদি পরিবেশন করছিল, হ্যারিকেনের লালচে আলোয় ফরসা মুখখানা কেমন গোলাপের মতন টুকটুক করছে, চোখ তুলে সে তাই দেখছিল। দেখা শেষ করে সে ব্রততীর দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে হাসল। 'যার চোখ আছে তার সব দিকে চোখ থাকে। মাছটি আনাজটি পর্যন্ত আগে থেকে ঘরে আনিয়ে রাখে, পাছে সীতাংশুর খাওয়ার অসুবিধে হয়।'

ব্রততী বলল, 'তুমি দেখছি আমাকেও হার মানিয়েছ, পাকা-গিন্নী বলে আমার এতকাল সুনাম ছিল, কিন্তু কই আজ পর্যন্ত বাজার থেকে কৈ-মাগুর এনে ঘরে জিইয়ে রাখতে পারলাম না যে সময়ে-

অসময়ে সেসব রেঁধে খাইয়ে আমার কর্তাকে কি তাঁর অতিথিদের প্রশংসা কুড়োব।'

বন্ধুপত্নীর কথা শুনে সীতাংশু হাসল।

'তাহলেও আপনি আপনার অতিথিদের কোনোদিন অভুক্ত অতৃপ্ত রেখেছেন বলে অন্তত আমার জানা নেই। যতদিন রাণীরবাগের বাংলোয় গিয়েছি, হয় পিঠে-পায়েস, নয়তো ঝোল ঝাল কালিয়া দিয়ে ভাত খেয়ে ঘরে ফিরেছি।'

'এটা আপনার অতিরিক্ত বিনয়ের কথা।' ব্রততী চোখ তুলে সীতাংশুকে একবার দেখে আবার সুখীর মুখের দিকে তাকাল। 'না, এত সুন্দর রান্নার হাত আমার নেই, আর এমন সুন্দর করে পরিবেশন করাও আমার কর্ম নয়, তুমি ভাই সত্যি গুণী মেয়ে।'

প্রশংসা শুনে সুখী যে খুব একটা আত্মহারা হয়ে উঠল কি লজ্জায় সংকুচিত হয়ে গেল তাকে দেখে তা মোটেই বোঝা গেল না। তেমনি ধীর স্থির সংযত থেকে মুখে স্নিগ্ধ হাসিটি ফুটিয়ে চামচ দিয়ে এঁর পাতে আর একটুকরো মাছ ওঁর পাতে আর একটু ঝোল তুলে দিচ্ছিল।

কিন্তু সুখীকে প্রশংসা করাতে আর একজন যে অতিমাত্রায় খুশি হয়েছে, একটু মনোযোগ করলে সেটা বোঝা যেত। ব্রততী চুপ করার সঙ্গে সঙ্গে সীতাংশু বলল, 'কেবল কি মাছ আনাজ? ঘরে বসেই নিয়মিত যাতে ডিমটা মাংসটা পাওয়া যায় তারও ব্যবস্থা হচ্ছে। সমস্ত প্ল্যানই মাধবের দিদির। হাঁস-মুরগী পোষা হবে—দুধের জন্য গরু। বলছিল, বিস্তর জায়গা রয়েছে এখানে, দুটো হাঁস-মুরগী পোষা বা দু' একটা দুধেলা গাই রাখার কোনো হাঙ্গামা হবে না, হাটবাজার যখন এত দূরে, খামকা কেন খাওয়ার কষ্ট ভোগ করা।'

'বটে!' রণধীর মাথা ঝাঁকাল। 'যার চোখ আছে তার সব দিকেই নজর আছে। খাওয়া নিয়ে তো কম কষ্ট করিস নি। কোনোদিন শুধু ভাতে ভাত, কোনোদিন নুন পান্তা—বড় জোর

একটু শুকনো মাছ পুড়িয়ে খাওয়া। দেখে এক একদিন আমার চোখেই জল আসত—'

ঠাট্টার সুর ছিল রণধীরের কথার মধ্যে, সীতাংশু তা গায়ে মাখল না। ব্রততীর দিকে ঘাড়টা ফিরিয়ে রেখেছিল, রণধীর চুপ করতে সেদিকে চোখ রেখে সে বলল, 'তুমি যদি দেখেশুনে সব রাখতে পার আমার আপত্তি নেই, আমি বলে দিয়েছি ওকে, তা না হলে নিজের খাওয়ার সুখের জন্যে—উঁহুঁ, এত হাঙ্গামা করা বাপু আমার পোষাবে না।'

'সব দেখেশুনে রাখবে!' রণধীর আবার মাথা ঝাঁকাল। 'এতকাল দেখবার শুনবার কেউ ছিল না, তাই তোর কষ্টও চরমে উঠেছিল।'

এবার সীতাংশু চুপ করে রইল।

ব্রততী চোখ আড় করে যুবতীকে দেখল। তার ভয় হলো বণধীরের কথার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটুকু না টের পেয়ে মাধবের দিদি লাল হয়ে ওঠে, অসন্তুষ্ট হয় বা অপ্রস্তুত হয়। যা হোক একটা কিছু কাজের অছিলা দেখিয়ে এখান থেকে সরে গিয়ে তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে ঢোকে। কিন্তু সেরকম কোনো লক্ষণ দেখতে না পেয়ে ব্রততী নিশ্চিন্ত হলো। যেন এই জন্য মনে মনে মেয়েটির বুদ্ধির আর-একটু প্রশংসা করল।

'নাও, তুমি চুপ কর তো এবার।' একটু শাসনের সুর করে স্বামীর দিকে চোখ তুলে সে হাসল। 'এই ঝাড়জঙ্গলের দেশে রেঁধে বেড়ে ছুটো খাওয়াবার মানুষ জোগাড় করা কি মুখের কথা। সীতাংশুবাবুর খাওয়ার কষ্ট এতদিনে ঘুচল দেখে এত ভাল লাগছে। আর কী চমৎকার এই মেয়ের কাজকর্ম!'

'আহা, আমি তো সে-কথাই বলছি।' যেন রণধীর নিজেকে সংশোধন করল। 'এখন আমারই তো ইচ্ছে করছে টিয়াটুলির জঙ্গলে এসে এক পাশে আমিও আর একটা ডেরা বেঁধে এভাবে থাকতে আরম্ভ করি।'

'এভাবে মানে!' ব্রততী হঠাৎ চোখ বড় করল, অবশ্য পরক্ষণেই হাসল। 'তা থাকতে পার, কিন্তু এখানে তোমার ষ্টেথস্কোপ আর ছুঁচ হাতে নিয়ে ডেরায় বসে গাছের পাতা গুণতে হবে শুধু, রুগী পাবে কোথায়।'

'হুঁ, তা-ও কথা বটে।' গম্ভীর হবার ভান করে ডাক্তার বড় করে নিশ্বাস ফেলল। 'এখানে রুগী নেই, গাছগাছালি আছে পাখি আছে খরগোস আছে—আর আছে প্রচুর আলোবাতাস ঝিঁঝির ডাক—কিন্তু এই দিয়ে তো পেট ভরবে না।'

ব্রততী এবারও সন্তুষ্ট হলো না। ভ্রূকুটি করে দেওয়ালের দিকে মুখ ফেরাল। স্ত্রীর ক্রুদ্ধ মূর্তি দেখে রণধীব নিঃশব্দে দাঁত বের করে হাসতে লাগল। তাই তো, শুধু আলোবাতাস গাছগাছালি পাখির ডাক হলেই তো চলে না। আরও কিছু চাই যে। যেন এবাবের ইঙ্গিতটা মাধবের দিদি বুঝতে পারল। পরিবেশন শেষ, খাওয়া শেষ। পাত থেকে সবাই হাত গুটিয়ে নিয়েছে। এবার তারা উঠবে। আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকার অর্থ হয় না। তা ছাড়া হাত মুখ ধোবার জন্য জলের দরকার। মগ ও জলের বালতি এনে বারান্দায় রাখতে হবে। যেন একটা কাজের ছুতো পেয়ে সুখী তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

স্বামী-স্ত্রী দুজনকে এভাবে নীরব হয়ে যেতে দেখে সীতাংশু কথা বলতে সাহস পেল না। ওপাশে বারান্দায় খরগোসের বাচ্চাটা চিঁচিঁ শব্দ করছে। মাধব ধমকাচ্ছে। যেন কিছুতেই ওটা খাঁচায় ঢুকতে চাইছে না। ক্রুদ্ধ মাধবের লম্ফঝম্ফ শোনা গেল। 'তোমায় শালা আমি ঠিক জঙ্গলে রেখে আসব।'

মোটরবাইকের পিছনে ব্রততীকে বড় সুন্দর লাগছিল।

সীতাংশু ডাক্তারকে বার বার সাবধান করে দিল। 'খুব

হুঁসিয়ার হয়ে গাড়ি চালাবি। সাঁকোর কাছে দু'জনেই নেমে পড়বি। না হয় একটু কষ্ট করে জায়গাটা হেঁটে পার হতে হবে।'

'আমাদের জন্যে একটুও চিন্তা করবেন না সীতাংশুবাবু, আমরা ঠিক রাণীরবাগ পৌঁছে যাব। কিন্তু আপনি কথা দিন কবে যাবেন আবার।'

'যাব, ঠিকই যাব, এদিককার কাজ একটু পাতলা হলেই একদিন গিয়ে হাজির হব।' সাদা শাড়ির ওপর কালো ওভারকোট, ডাক্তারগিন্নীকে কেমন যেন অন্যরকম দেখাচ্ছিল। হয়তো পাতার ছায়া ও জ্যোৎস্না পড়ে মুখটা শরীরটা এমন রহস্যময় মনে হচ্ছিল, তার ওপর বেণীটা কেন জানি খুলে দিয়েছে। ব্রততীকে কালো জামার ওপর কালো চুলের ঢেউ, এক সেকেণ্ড স্থির চোখে ছবিটা দেখে সীতাংশু অন্যদিকে তাকাল। 'আমার একেবারেই ইচ্ছে ছিল না এই রাত করে ঠাণ্ডায় ডাক্তার আপনাকে নিয়ে রওনা হয়।'

সাইকেলের হ্যাণ্ডেল ধরে দাঁড়িয়ে ডাক্তার কথাগুলি শুনছিল। এবার সে বলল, 'রাস্তায় যতটা ঠাণ্ডা লাগবে, তোর টিনের চালের ডেরার মধ্যে রাত কাটালেও ততটা ঠাণ্ডাই লাগত। তাছাড়া দু'জনকে শোবার জায়গা দিতিস কোথায়।'

'কেন, একরাত না শুয়ে তুমি পারতে না?' ব্রততী হাল্কা গলায় হাসল। 'না হয় তিনজনে বসে গল্প করে রাত কাটান যেত।'

'ও, তাহলে তোমার থেকে যাওয়ার ইচ্ছে ষোল আনা ছিল। বেশ তো, থাক না, আমাকে কিন্তু যেতেই হবে, জান তো একটা কলেরা রোগী ফেলে এসেছি।'

সীতাংশু ব্রততীর চোখের দিকে তাকাল। ব্রততী ফিক করে হেসে ফেলল।

'শুনলেন তো কথা, তুমি থাক, আমি চলে যাই—কেমন স্বার্থপর এই মানুষ।'

'না, ঠিকই বলছি, আমার একটুও আপত্তি নেই যদি তুমি এখানে

রাত্তিরটা থেকে যাও, বরং—বরং আমি কাল দিনের বেলা একফাঁকে এসে তোমাকে নিয়ে যাব।'

'থাক, আর বলতে হবে না।' ধমক দিয়ে উঠল রণধীরের স্ত্রী। তারপর এক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে কিছু একটা ভাবল, তারপর তার থমথমে অভিযোগের গলা শোনা গেল। 'এটা তুমি ভাল করেই জান, তোমাকে ছেড়ে বাইরে কোথাও রাত কাটানো আমার পক্ষে মরে গেলেও কোনোদিন সম্ভব হবে না।'

রণধীর আর কথা বলল না। সীতাংশু চুপ। চোখের সামনের বিস্তৃত বিশাল শীত-রাত্রির বনভূমির স্তব্ধতা অনুভব করল সে। এতক্ষণ হাসি ও আনন্দের মধ্যে সময় কেটেছে, এখন দু'জনের যাবার মুহূর্তে এমন একটা তিক্ততা সৃষ্টি হবে, সীতাংশু যেন প্রস্তুত ছিল না। যেন এই জন্য সে নিজেকে দায়ী মনে করল। রাত্রে দু'জনের থেকে যাওয়ার প্রস্তাবটা তার মুখ থেকে যদি না বেরোত—

'চলি সীতাংশুবাবু—' সীতাংশু চমকে উঠল। হেসে ঘাড় কাত করে ব্রততীর মুখের দিকে তাকাতে ব্রততীও হাসল। 'আপনি যাবেন কিন্তু একদিন।'

'যাব, নিশ্চয় যাব।' সীতাংশু ঘাড় কাত করল।

'চলি রে জংলী।' রণধীর এক পায়ে প্যাডেল চেপে ধরে তার গাড়িতে স্টার্ট দিল। সীতাংশু কথা না বলে ঘাড়টা শুধু নাড়ল। একটা লাল আলোর বিন্দু পিছনে নিয়ে ডাক্তারের মোটরবাইক জঙ্গলের পথে সরে গেল। লতাপাতার সবুজ ঠাণ্ডা গন্ধ ছড়িয়ে খানিকটা পোড়া তেলের গন্ধ সীতাংশুর নাকে লাগল। মুখের ভিতরটা বিস্বাদ ঠেকছিল, কিন্তু তবু একটা সূক্ষ্ম হাসি ঠোঁটের আগায় ঝুলিয়ে সে দূরের বনপথে যেখানে জ্যোৎস্না ও অন্ধকার মাখামাখি হয়ে একটা অস্পষ্ট কুয়াশার পর্দা তৈরি করে রেখেছে সেখানে চোখটা ধরে রাখল। মোটরবাইকের লাল আলোর ফুটকিটা আর দেখা গেল না।

মাধব ও তার দিদি অনেকক্ষণ ঘরে ফিরে গেছে। বন্ধু ও বন্ধুপত্নীকে বিদায় দিতে সে আমলকীতলা পার হয়ে বড় অশোক-গাছটার কাছে চলে এসেছিল। এখন আস্তে আস্তে ঘরের দিকে ফিরে চলল। শীতের রাত হলেও তেমনি যেন ঠাণ্ডা লাগছিল না, গুমট মনে হচ্ছিল। যেন দু'পাশের প্রত্যেকটা গাছ গরম নিশ্বাস ছড়াচ্ছে। অবশ্য খোলা মাঠে নামলে কতটা ঠাণ্ডা লাগবে, সেখানে কনকনে বাতাস বইছে কি না সীতাংশু চিন্তা করল। তা হলেও দু'জনের গায়ে যখন গরম কোট আছে, জঙ্গল পার হয়ে টিয়াটুলির বড় মাঠ পার হবার সময় ডাক্তার ও ডাক্তারগিন্নীর খুব একটা যে কষ্ট হবে না তাও সে অনুমান করতে পারছিল। কিন্তু কল্পনার চোখে সে আর-একটা ছবি দেখছিল। কেমন করে তারা বাঁশের সাঁকোটা পার হচ্ছে। ডাক্তার তার মোটরসাইকেল হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ব্রততী পিছনে হাঁটছে। স্ত্রীকে সামনে রেখে রণধীরও গাড়িটা নিয়ে পিছনে হাঁটতে পারে। কিছু বলা যায় না। উঁহু, দৃশ্যটা কল্পনা করার সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের মনে ঘাড় নাড়ল, এত রাত্রে নির্জন পথে ডাক্তার কখনও ব্রততীকে পিছনে রেখে আগে আগে সাঁকো পার হতে সাহস পাবে না। নিজের জন্য না, স্ত্রীর জন্য রণধীরের ভয়। ভয় ভাবনা সতর্কতা।

তাই তো নিজে সে বিয়ে করে নি, স্ত্রীর জন্য সারাক্ষণ একটি স্বামীকে কত শত দুশ্চিন্তা পোহাতে হয় সীতাংশু জানে না। এই নিয়ে সে মাথাও ঘামায় না। তবে চোখের ওপর ডাক্তারকে যা দেখে, যতই কাজের দোহাই পাড়ুক রুগীর কথা বলুক, এক সেকেণ্ডের জন্যও সে স্ত্রীকে ভুলে থাকতে পারে না।

এইমাত্র মুখে সে বলছিল বটে, 'সীতাংশুর ডেরায় রাত্রে তুমি থেকে যাও, আমি চললাম।' কিন্তু কিছুতেই ব্রততীকে ফেলে রেখে সে রাণীরবাগ ফিরে যেত না। প্রাণ গেলেও না। তার চোখ দেখে সীতাংশু বুঝেছে, গলার স্বর শুনে বুঝেছে।

তবে কি স্ত্রীকে সে পরীক্ষা করছিল? সীতাংশু মনে মনে হাসল। কাকে পরীক্ষা করত রণধীর? ব্রততীও যে কিছুতেই তাকে রাণীরবাগ পাঠিয়ে দিয়ে এই জঙ্গলে রাত কাটাতো না, রণধীরের চেয়ে একথা আর কার ভাল জানা আছে!

তবু একটু তিক্ততা রেখে গেল তারা টিয়াটুলির এই জঙ্গলে। একটু হেঁয়ালী। কার জন্য? সীতাংশুর জন্য? একটু দেখুক সে, ভাবুক? আমাদের মধুর ভাণ্ড পূর্ণ আছে, ভালবাসার সুধায় এতটুকু টান ধরে নি। কিন্তু সীতাংশুকে সবটা বুঝতে দেওয়া কেন, এতটা আদর-আপ্যায়ন করল সে দুজনকে, সুতরাং সামান্য একটু হেঁয়ালীর কুয়াশা তার চোখের সামনে ছড়িয়ে দিয়ে রসিকতা না করে গেলে বন্ধুকৃত্য সম্পন্ন হতো কি করে।—এই?

এছাড়া এর অন্য কোনো অর্থ সীতাংশু হাতের কাছে খুঁজে পাচ্ছিল কি। যেমন তখন। খেতে বসে রণধীর এমন একটা ভান করছিল, যেন রাণীরবাগের সাজান-গোছান ঝকঝকে বাংলোর জীবনে তার অরুচি ধরে গেছে। এখন তার জঙ্গল ভাল লাগবে, সীতাংশুর মতন একটা টিনের চালের ডেরা। আলো থাকবে বাতাস থাকবে, আর থাকবে পাতার ঝরঝর শব্দ পাখির কাকলী।

কিন্তু তার এই সদিচ্ছা কতক্ষণ ছিল? কতক্ষণ ধরে রাখত? ডাক্তারগিন্নীর মাত্র একটা ভ্রূকুটির আঘাতে তা ছিঁড়ে তছনছ হয়ে গেল। তারপরেও যতক্ষণ এখানে ছিল দু'জন, ভুল করেও রণধীর আর জঙ্গলে এসে থাকার কথা উচ্চারণ করে নি।

তাই তো, মুখে আলো বাতাস পাখির গান ঝিঁঝির ডাকের কথা বলছিল সে, আর চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মাধবের দিদিকে দেখছিল। কাজেই হঠাৎ তার জঙ্গলে এসে থাকার ইচ্ছা হচ্ছে শুনে ব্রততী যে ভয় পাবে চমকে উঠবে এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বামীকে সংশোধন করতে ভুরু কুঁচকে শাসন করতে লেগে যাবে, রণধীর বুঝি নিজেও তা জানত।

না কি স্ত্রীর এই শাসনটুকুও সীতাংশু দেখুক, দেখে তাদের

দাম্পত্য প্রেমের গভীরতা আর একবার অনুভব করুক—হুঁ, রণধীর যে আজও কত সহজে নিজের ইচ্ছা মর্জি হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে ব্রততীর শাসন নিষেধ ইচ্ছা ও রুচির কাছে আত্মসমর্পণ করছে—জিনিসটা ভাল করে বন্ধুকে দেখাবার জন্য এমন একটা উটকো ইচ্ছা তখন মুখ দিয়ে সে বের করল ?

কিছুই দরকার ছিল না এসবের। সীতাংশু মনে মনে বলল, 'ভালবাসার সফেন সমুদ্র নিয়ে তুমি ঘর করছ ডাক্তার, সেখানে উঁকি দেব হাত বাড়াব সেই সাহস আমার নেই, মাঝে মাঝে লোভ যে না হয়েছে তা নয়, চুরি করে কতদিন তোমার সাজান ঘর দেখতেও গিয়েছি, কিন্তু সমুদ্রের ডাক শুনে তরঙ্গভঙ্গ দেখে ভয় পেয়ে পিছিয়ে এসেছি। এসেই মনে হয়েছে, আমার এই জঙ্গলের জীবন ভাল। এখানে অনেক বেশি শান্তি। এখানে চাকচিক্য নেই, আড়ম্বর নেই, সবই কেমন সরল সহজ সাধারণ। আমার করাতীরা কাঠুরিয়ারা কুলি-মিস্ত্রীরা, অথবা জঙ্গলের এক-একটা গাছ পাখি, অথবা কিশোর মাধব, মাধবের দিদি—এদের দিকে আমি যত সহজে তাকাতে পারি, যত সহজে মিশতে পারি, রাণীরবাগের বাংলোয় গেলে তা হয় না। একটা বাধা একটা যন্ত্রণা আমার নিশ্বাস চেপে ধরে! চিন্তা করি—এমন হয় কেন? উত্তরটাও সহজে পেয়ে যাই। সেখানে শুধু ভালবাসার উদ্গার, ভালবাসা পেয়ে আরও ভালবাসা না-পাবার হাহাকার, অথবা ভালবাসা না পেলে জীবন কেমন হতো, তাই নিয়ে অভিনয়। এই অভিনয়ের মধ্যেও চমৎকার মান-অভিমান আছে ঝগড়া আছে তিক্ততা আছে—যেমন একটু আগে দু'জনে গল্পের অভিনয় করে গেলে!'

এখনও ছবিটা সীতাংশুর চোখের সামনে ভাসছে। নিঃশব্দ গাছেরা তাকিয়ে তাকিয়ে দুটি আশ্চর্য মানুষকে দেখল, সীতাংশু দেখল। যদি মাধব থাকত সেও দেখত, তার দিদি দেখত। দিদি কি অভিনয়টা বুঝত—হয়তো বুঝত, স্বামীর ঘর করে এসেছে যুবতী,

কিশোর মাধব কিছুই বুঝত না, মুখে আঙুল গুঁজে চেয়ে থাকত। সবটাই তার কাছে জটিল দুর্বোধ ঠেকত। তাই তো, এখানে কেউ অভিনয় জানে না। মাধবের মতন সীতাংশুর নিজেরও এ-বিদ্যায় হাতেখড়ি হয় নি। বা বলা যায় হতে দেয় নি। তার কুলি করাতীরা অভিনয় জানে না। তা হলে শীতের দুপুরেও তাদের কপাল গর্দান ঘামে চকচক করত না, তারা সরল তারা বিশ্বাসী। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা হেমন্ত—সব ঋতুতে তারা এখানে হৈ-হৈ করে কাজ করে, কাজ শেষ করে গান গেয়ে বাড়ি ফেরে। দেখে অভিনয়কুশলী মানুষদের চোখ টাটায়, অবাক হয় কেউ। আর এখানে অভিনয় করবে কে? সুখী? সীতাংশু মাথা ঝাঁকাল। যদি অভিনয় জানত বেচারা, তো বাচ্চা কোলে নিয়ে আসানসোল থেকে কাঁদতে কাঁদতে মুরারির ডেরায় এসে উঠত না। আজও সেখানে থেকে যেত, যেমন অঢেল ভালবাসা পেয়ে কেউ কেউ ভালবাসা না-পাবার অভিনয় করে, কাঁদাকাটা করে মান-অভিমান করে, তেমনি সুখীও এক ফোঁটা ভালবাসা না পেয়ে অনেক পেয়েছি, এক ফোঁটা ভালবাসা না দিয়ে অনেক দিয়েছি—এরকম অভিনয় করে হেসে কেঁদে স্বামীর ঘরে দিনগুলি কাটিয়ে দিত।

ঘরে ঢুকে হ্যারিকেনের সলতেটা বাড়িয়ে দিল সীতাংশু। এতটা সময় দুটি অতিথি এ-ঘরে কাটিয়ে গেছে তার ছিটেফোঁটা চিহ্নও কোথাও নেই। সব কেমন সুন্দর করে আবার সাজিয়ে-গুছিয়ে ঠিক করে রেখে গেছে মাধবের দিদি। তিনজন বসে খাবে বলে টেবিলটা ঘরের মাঝখানে টেনে আনা হয়েছিল, সেই সঙ্গে দুটো চেয়ার একটা বেঞ্চি। সব আগের জায়গায় ফিরে গেছে। ছাইদানীতে এত সিগারেটের টুকরো জমেছিল। সেটাও পরিষ্কার করে ধুয়ে মুছে আবার জায়গামত বসিয়ে রাখা হয়েছে। তারা হাত-মুখ ধোবে বলে জলের জাগ বালতি তোয়ালে সাবান কত কী টেনে টেনে আনা হয়েছিল। এখন একটি জিনিসও এখানে ওখানে

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে নেই। যেখানে যেটা থাকবার ঠিক সেখানে রেখে দেওয়া হয়েছে। মানে এসব জিনিস বাইরের কোনো মানুষ এসে ব্যবহার করেছিল বলে আর যেন মনে হয় না। যেমন ওপাশ থেকে আরাম-কেদারাটা টেনে এনে রণধীর কতক্ষণ ওটার ওপর শুয়ে বসে বিশ্রাম করছিল, গল্প করছিল। যেমন দেওয়ালের হুক থেকে আরশিটা টেনে নামিয়ে রণধীরের স্ত্রী অন্তত কয়েকবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিজের মুখখানা দেখেছিল এবং যাবার আগে ওটা সামনে রেখে আর একবার বেশ জমকালো প্রসাধনটা সেরে নিয়েছিল।

সেই আরশি যেমন দেওয়ালে ঝুলত অবিকল সেরকম আছে। আরাম-কেদারাটা ওদিকের দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে আগের মতন দাঁড়িয়ে আছে। চামচ গেলাস কাপ ডিশ বাটি তাকের ওপর যেমন সাজান থাকে এখনও তাই আছে।

সব দেখে সীতাংশুর একটা কথা মনে হলো। অবশ্য এটা তার মনগড়া কল্পনা। যেন মাধবের দিদি চাইছে না, এঘরে দুটি অতিথি এসে তিন-চার ঘণ্টা কাটিয়ে গেছে তার কোনো রকম চিহ্ন থাক। ওরা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সুখী সব ঘষেমেজে ধুয়েমুছে পরিষ্কার করে দিয়েছে। যেন মানুষ দুটিকে ভাল লাগে নি তার। হেসেছে কথা বলেছে রান্নাবান্না করে খাইয়েছে সত্যি, কিন্তু যেন অন্তর থেকে ডাক্তার ও ডাক্তারগিন্নীকে সে ভালবাসতে পারে নি। কেন? তাদের চালচলন কথাবার্তা বেশভূষা! জঙ্গলের জীবনের সঙ্গে যা মোটেই খাপ খায় না। সীতাংশুর বন্ধু তারা, কিন্তু তবু এই ডেরার মধ্যে যতক্ষণ থেকে গেছে, মনে হয়েছে চোখ মুখ হাত পা কান মাথা নিয়ে দুটো জীবন্ত অহংকার কথা বলে গেছে হেসে গেছে খেয়ে গেছে গল্প করে গেছে—যাবার সময় ভালবাসার মোটা বোয়েমটার ছিপি খুলে কিছু তেতো ফেনা ও বুদবুদ অশোকগাছটার নিচে ছড়িয়ে দিয়ে বোঝাটা একটু হাল্কা করে গেছে—এই?

না, তা হবে কেন, সীতাংশু নিজের মনে মাথা ঝাঁকাল। ঐ

ছুটি মানুষ সম্পর্কে এতসব চিন্তা করার কী দায় পড়েছিল মাধবের দিদির। আসলে চাকরি করতে এসেছে ও। কাজ করতে করতে মনিবের চোখ ছুটো দেখেছে, সেই সঙ্গে তার মনের ভিতরেও উঁকি দিয়েছে, উঁকি দিয়ে যেটুকু বুঝবার তক্ষুনি বুঝে নিয়েছে। তারপর যা যা করবার করছে, ঘষেমেজে সব পরিষ্কার করল, জিনিসপত্র জায়গামতন গুছিয়ে রাখল, ঘরের আগের চেহারা ফিরে এল।

অর্থাৎ সীতাংশু যেমনটি চাইছিল।

তাই তো, যতক্ষণ ডাক্তার ডাক্তারগিন্নী এঘরে ছিল, ভয়ংকর অস্বস্তিবোধ করছিল সে। নিশ্চয় তার মুখ দেখে সুখী টের পেয়েছে। সীতাংশু যেন অন্যরকম আশা করেছিল। ব্রততী একলা আসবে টিয়াটুলির জঙ্গল দেখতে, আঁচলে বেঁধে ডাক্তারকে নিয়ে আসবে এমন তো কথা ছিল না।

তবু ভাল যে ভালয় ভালয় বিদায় হয়েছে। যদি অতিরিক্ত ছুটো মানুষকে তার এই এক ফোঁটা ঘরে থাকতে দিতে হতো তো কী সাংঘাতিক বিপদের কথা ছিল। শীতের রাত, ছুজনে গায়ে দিয়ে শোবে এত কাপড়চোপড়ই বা সে জোগাড় করত কোথা থেকে। একটুখানি একটা তক্তপোষ। একজন কোনোরকমে শুতে পারে, তা না হয় স্বামী-স্ত্রী, ঠাণ্ডা পড়েছে, গাদাগাদি হয়ে শুয়ে রাতটা কাটিয়ে দিত, সীতাংশু কোথায় থাকত? বাইরে গাছতলায়? না কি শোয়ার অসুবিধা দেখে সীতাংশুর সঙ্গে বসে গল্প করে ছুজন রাত কাবার করে দিত! এমন একটা প্রস্তাব ব্রততীর মুখ থেকে বেরিয়ে পড়েছিল না! উঁহুঁ, রণধীর কিছুতেই এভাবে বসে রাতজাগা সমর্থন করত না। ডাক্তার মানুষ, আর তা-ও নিজের দিক থেকে সে যা-ই করত, ব্রততীকে একটুও রাত জাগতে দিত না। ব্রততীর শরীর খারাপ হবে—জেনেশুনে কেমন করে সে এ জিনিস হতে দিত! ওদিকে ব্রততী নিজে থেকে কথাটা মুখ দিয়ে বের করেছিল বটে, কিন্তু তা বলে সে-ও কি রণধীরকে না ঘুমিয়ে বসে বসে গল্প করতে দিত, মরে

গেলেও সীতাংশু একথা বিশ্বাস করবে না। সেদিন তো চোখের ওপর নাটকটা দেখে এল। স্বামীর শরীর খারাপ হয়েছে, কি হবে ভেবে গিন্নীর কী আতঙ্ক! এই নিয়ে তো এক পশলা ঝগড়াই হয়ে গেল তুজনের মধ্যে, গিন্নী বেশ একটু কান্নাকাটিও করল, ম্যানেজারের ছেলের টাইফয়েড হয়েছে, তা বলে ঠাণ্ডার মধ্যে রুগী দেখতে বেরিয়ে স্বামী একটা অসুখ বাধিয়ে আসবে এ কেমন কথা! পরে অবশ্য ঘরে এসে ডাক্তার সীতাংশুর সঙ্গে বসে মুর্গির ঝোল দিয়ে খানকয়েক পরটা সাবাড় করেছিল। তার শরীর খারাপ ছিল বা হবে এমন কোনো লক্ষণ সীতাংশু দেখতে পায় নি।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত যে তারা এখানে রাত কাটাত না, যেমন করে হোক রাণীরবাগ ফিরে যেত, সীতাংশু জানত।

চলে গেছে, ভালই হয়েছে। মনে মনে সে বলল, আর যেন কোনোদিন শখ করে ছুটিতে জোড়া বেঁধে টিয়াটুলির জঙ্গল দেখতে না আসে। এলেই অভিনয় করবে। দাম্পত্য প্রেমের ঢেকুর তুলে মান-অভিমান ঝগড়াঝাঁটি—কত কী রঙ্গ না জঙ্গলটাকে দেখাতে চাইবে। তার মানে সীতাংশু দেখুক মাধবের দিদি দেখুক—দিদির হাতের পাখিটাও দেখুক, খাঁচার ভিতরটা থেকে গলা বাড়িয়ে এ জিনিস দেখবে, মাধবের 'বখাটে ছেলে' কালা দেখবে। কারখানা বন্ধ না থাকলে কুলি মিস্ত্রী করাতী কাঠুরিয়ারা পর্যন্ত দেখত, আর দেখবে বনের এই গাছগুলি। সাজান গোছান ঝকঝকে বাংলোর তুটি মাজাঘষা চেহারার নিখুঁত অভিনয়।

এদের সমস্ত চিহ্ন মুছে দিয়ে সুখী বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে।

তখন প্রসাধন করার সময় ব্রততীর আঙ্গুল থেকে একটুখানি ক্রিম লেগে গিয়ে আরশির একটা কোণা কেমন ঝাপসা হয়েছিল। সেই দাগটুকু এখন আর নেই। যেন মাধবের দিদি নিজের আঁচল দিয়ে আরশিটা ভাল করে মুছে আবার বেড়ার গায়ে টাঙিয়ে রেখেছে। কে বলবে ওটা ডাক্তারগিন্নীর হাতে উঠেছিল। কেমন ঝকঝক করছে এখন।

ভাল করেছে সুখী, এখানে সে উপস্থিত থাকলে সীতাংশু তার কাজের খুব সুখ্যাতি করত। ডাক্তার ও ডাক্তারগিন্নীকে যাতে আর একবারও মনে না পড়ে তার জন্য বেচারাকে এই অতিরিক্ত কাজগুলি করতে হলো তো। খাটুনির ওপর খাটুনি।

আর একটা ভাল কাজ করে গেছে সে। আগের রাত্রে খাঁচাসুদ্ধ পাখিটাকে সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে গেছে। আজ আর তা করে নি। খাঁচাটা বেড়ার গায়ে ঝুলছে। যেন এতক্ষণ পাখিটা ঝিমোচ্ছিল। পায়ের শব্দ পেয়ে জেগে উঠে কালো পুঁতির মতন চোখ দুটো মেলে পিটপিট করে সীতাংশুর মুখটা দেখছে।

চমৎকার দাওয়াই! সীতাংশু হাসল। রাণীরবাগের মানুষ দুটিকে ভুলে থাকতে পাখির মতন আর আছে কী! পাখি মানেই বন। বন মানে পাখি। বনের বাইরে তার মন কোথাও ছুটে যাবে—এ জিনিস সে নিজে যেমন চাইছে না, মাধবের দিদিও চাইছে না। একটি মেয়ে কত সহজে না পুরুষের মন বুঝে ফেলে।

খাঁচার ভিতর হাত ঢুকিয়ে ছানাটাকে তুলে এনে সীতাংশু একটু সময় বুকের কাছে ধরে রাখল, এক ফোঁটা উত্তাপ। ওপাশে কালাও খাঁচার ভিতর থেকে চিঁ চিঁ করে ডাকছিল।

আলো নিবিয়ে শুতে গিয়ে তার মনে হলো, এমন একটা চিন্তা সুখীর মাথায় আসা খুবই স্বাভাবিক। বনের মতন শান্তি আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এখানে ছলচাতুরী নেই বঞ্চনা নেই অভিনয় নেই।

তা ছাড়া নিজে কত দুঃখ ও বঞ্চনা পেয়ে মাধবের দিদি এই জঙ্গলে ছুটে এসেছে তার চোখ দেখলে বোঝা যায়।

আসানসোলের মানুষটা তাকে একদিনের জন্যও ভালবাসে নি। তাতে তার কী এসে যায়। পাখিওয়ালা তাকে ভালবাসে। দেখা হওয়া মাত্র কেমন সুন্দর একটা পাখির ছানা ধরে দিয়েছে। আবার দেবে। যদি এটা মরে যায় কি উড়ে চলে যায় তো আর একটা পাখি

সুখীকে ধরে উপহার দেবে। বনে অনেক সুখ। অনেক বেশি শান্তি।

এক একটা দিন আসে, এক একটা সকাল এমন চেহারা নিয়ে আমাদের চোখের সামনে উপস্থিত হয় যার সঙ্গে অন্য কোনো দিনেব অন্য কোনো প্রভাতের মিল থাকে না।

সীতাংশু তাই ভাবছিল। কেমন করে জানি সেদিন রাত পোহাল।

তখনও সে ঘর থেকে বেরোয় নি। শেষ রাত্রের দিকে ঠাণ্ডাটা খুবই জাঁকিয়ে পড়েছিল। ভোর হতে দেখা গেল আকাশ পৃথিবী কুয়াশায় কুয়াশায় অন্ধকার হয়ে আছে। ঘুম ভাঙার পরও সীতাংশুর কেমন যেন বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছা করছিল না, হাত পা নাড়তে হবে ভয়ে কম্বলের নিচে কান মাথা গুঁজে হাঁটু দুটো মুড়ে পেটের কাছে নিয়ে বেশ কিছুটা সময় কুকুরের মতন কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে ছিল, তারপর অবশ্য এক সময় তাকে উঠতেই হলো। সুখী এসে দবজার কড়া নাড়ছিল। দরজা খুলে দিল সে। সেইসঙ্গে টেবিল থেকে ঘড়িটা তুলে চোখের সামনে তুলে ধরে কেমন হতভম্ব হয়ে গেল। সাতটা বেজে গেছে। তার মানে আধঘণ্টা আগেই সূর্যোদয় হয়েছে। কিন্তু বাইরের চেহারা দেখে কে সে কথা বিশ্বাস করত!

তাড়াহুড়ো করে জামাকাপড় চড়িয়ে বেরোবার জন্য সে তৈরি হল। কাঠ জ্বেলে সুখী অবশ্য তখনি চায়ের জল ফুটোতে লেগে গেল। ওদিকে ওরা কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে—করাতীদের করাত টানার শব্দ কাঠ কাটার শব্দ—কুলিদের ছুটোছুটি হৈ-হল্লা, সব কিছুই তার কানে আসছিল। সুখীর চা হয়ে গিয়েছিল। চা-এ চুমুক দিতে যাবে এমন সময় একজন ছুটে এসে খবরটা দিল। জনার্দন। জঙ্গলে

কাঠ কাটছিল জনার্দন। তার মুখে সব শুনে প্রথমটায় সে খুবই ঘাবড়ে গিয়েছিল, ভয় পেয়েছিল। সুখী পাশে দাঁড়িয়ে শুনছিল। সেও খুব ভয় পেয়েছিল। রক্তটক্ত শুনলে কার না ভয় হয়। তবে কি না ঈশ্বরের ইচ্ছা—সীতাংশু যে খুব একটা ঈশ্বর-বিশ্বাসী তা নয়, তবে সংসারের পাঁচটা জিনিস দেখে, পাঁচ রকম ঘটনার কথা শুনে এক এক সময় তার ভাবতে ইচ্ছা করত, যেন কোনো কোনো ব্যাপারে সত্যি কারো অদৃশ্য হাত রয়েছে, আর সেই হাতের এমন যাদু, আমাদের ভাবনা-চিন্তা ধ্যান-ধারণা চোখের নিমেষে ওলটপালট করে দেবার মতন এক একটা কাণ্ড বাধিয়ে তোলে। হুঁ, ঈশ্বরের হাত, জনার্দনের সঙ্গে অশোকতলায় ছুটে গিয়েছিল সীতাংশু, সুখীও পিছনে পিছনে গিয়েছিল, ছোটখাট একটা ভিড় জমে গিয়েছিল সেখানে, করাতী কুলি এবং জঙ্গলে যারা কাঠ কাটছিল তারা সকলেই পীতাম্বরকে দেখতে এসেছিল। ঘাসের ওপর শুইয়ে রাখা হয়েছিল মানুষটাকে। শিয়রের কাছে মুরারি ও সনাতন বসে রয়েছে দেখা গেল। যেন পীতাম্বরের জ্ঞান ছিল না, চোখ দুটো আধবোজা হয়ে ছিল। সীতাংশু ভিড় ঠেলে কাছে গিয়ে দাঁড়াতে মুরারি ও লক্ষ্মীচরণ একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল। মুরারির মুখে ব্যাপারটা ভাল করে শুনল সীতাংশু।

সকালে পীতাম্বর কাজে আসছিল। হাজিরা দিতে পাছে দেরি হয়ে যাবে ভয়ে সোজা পথ ধরে না এসে ছুটতে ছুটতে সে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে আসছিল। ওদিকে সনাতন কুড়াল দিয়ে কেটে একটা গাছ নামাচ্ছিল তখন। আগের দিন বিকালে গাছের অর্ধেকটা কাটা হয়ে গিয়েছিল। বাকী কাজটুকু আজ সকালের মধ্যে শেষ করবে ভেবে বেশ একটু হাত চালিয়ে সে কুড়াল মারছিল। না, কুয়াশার জন্য পীতাম্বরকে সে দেখতে পায় নি। ওপাশ দিয়ে একটা মানুষ আসছে দেখলে সে তখনি হাতের কুড়াল হাতে ধরে রাখত। কেননা সবটা গুঁড়ি কাটা হয়ে গিয়েছিল, গাছটা তখন একদিকে হেলে গিয়ে মাটিতে পড়ি পড়ি করছিল। আর ঠিক তখন পীতাম্বর

সেখানে এসে পড়ে। ঠাণ্ডার দরুণ কানে মাথায় চাদর জড়িয়ে আসছিল। কুয়াশার জন্য যেমন সে কিছু দেখতে পাচ্ছিল না, তেমনি ধারে কাছে গাছ কাটা হচ্ছে সেই শব্দও সে শুনতে পায় নি।

তারপর যা ঘটার ঘটল। কিন্তু এখানেও যে ঈশ্বরের হাত ছিল বিশ্বাস না করে উপায় কি। পীতাম্বর মরে যেত। যদি গাছটা মাথায় পড়ত রক্ষা ছিল না। একটা পায়ের ওপর দিয়ে চোট গেছে। পা ভাঙে নি মচকায় নি। তবে বেশ জখম হয়েছে। ছুটো আঙুল থেঁতলে গিয়ে প্রচুর রক্তস্রাব হচ্ছিল। করাতঘরে একটা বাক্সে খানিকটা আইডিন তুলো সব সময়ই রাখা হয়। মুরারি সঙ্গে সঙ্গে তুলোয় আইডিন মাখিয়ে পীতাম্বরের জখমের জায়গাগুলিতে লাগিয়ে দিয়েছে। আনাড়ি হাত, তা হলেও সে যতটা পেরেছে প্রাথমিক শুশ্রূষার ত্রুটি করে নি।

‘কিন্তু এভাবে তো এখানে ওকে শুইয়ে রাখলে চলবে না, ডাক্তার ডাকতে হবে।’ যেন কথাটা বলতে গিয়ে বাণীরবাগের ডাক্তারের কথাটাই মনে হয়েছিল সীতাংশুর।

সনাতন তৎক্ষণাৎ ঘাড় কাত করল।

‘আজ্ঞে রাখহরি ট্রাক নিয়ে ইস্টিশনে রওনা হয়ে গেছে, সঙ্গে ইয়াসিন গেছে।’

লজ্জা পেল সীতাংশু। তাই তো, তার আগেই তার কর্মচারীরা ডাক্তারের কথা শুধু চিন্তা করে নি, রেলস্টেশনের পাশ করা ডাক্তার হরিসাধনবাবুকে আনবার জন্য ইয়াসিনকে দিয়ে ট্রাক পাঠিয়ে দিয়েছে। উঁহুঁ, বাণীরবাগের ডাক্তারকে তারা আনতে যাবে কোন্ ছুঃখে, এখান থেকে কম করে হলেও তিন মাইলের পথ, আর দেড়-ছু মাইলের মধ্যে আকবরপুরের রেলস্টেশন, স্টেশনের গায়েই হরিসাধনবাবুর ডিসপেনসারী। এই তল্লাটের মানুষের অসুখ-বিসুখ হলে কি আঘাত পেয়ে জখম-টখম হলে হরিসাধন ডাক্তারের কাছেই তো তারা চলে যায়। হরিসাধনের কথা ভুলে গিয়ে সীতাংশুর কি না

রণধীর ডাক্তারকে মনে পড়ল। যেন এই জন্যও কিছুটা লজ্জা পেল সে।

'কুয়াশার দরুণ যদি গাড়ি চালাতে এট্টু অসুবিধে হয়, তা না হলে ডাক্তারবাবু এখনই ছুট করে এসে যাবেন।' মুরারির মুখের দিকে তাকাল সনাতন। তার কথা শুনে মুরারি বুঝি চারদিকের ধোঁয়াটে অবস্থাটা আর একবার দেখতে ঘাড় তুলে এদিক ওদিক তাকাল। ভিড়ের একপাশে সুখীকেও দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল সে। মেয়ের সঙ্গে চোখাচোখি হতে বুড়ো তৎক্ষণাৎ ঘাড় নিচু করে আবার মনোযোগ দিয়ে পীতাম্বরের মুখটা দেখতে লাগল।

আড়চোখে সুখীকে একবার দেখে নিয়ে সীতাংশু একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে, সকলেই যাতে শুনতে পায়, চড়াসুরে বলল, 'কাঠ কাটা আজ বন্ধ থাকবে, কারখানার কাজও বন্ধ থাক, মিস্ত্রীরাও বাড়ি চলে যেতে পারে।'

তার মানে কারখানা ছুটি হয়ে গেল। একটা অস্ফুট গুঞ্জন শোনা গেল। কর্মচারীরা খুশি হয়েছে বোঝা গেল। কিন্তু তা বলে ভিড় ভেঙে যে তখনি সকলে বাড়ির দিকে ছুটল তা-ও না। যেমন ছিল, দাঁড়িয়ে রইল সব। তারা ইয়াসিনের জন্য অপেক্ষা করবে বোঝা গেল। ডাক্তারবাবুকে সঙ্গে নিয়ে ইয়াসিন এখনি ফিরে আসবে। অর্থাৎ ছুটি পাওয়ার আনন্দ অপেক্ষা তাদের চোখে-মুখে একটা আশঙ্কা, অনিশ্চয়তা—মাটিতে শোয়ান মানুষের জন্য দুঃখ ও সমবেদনার ভাবটাই বেশি ফুটে উঠছে লক্ষ্য করে সীতাংশু ভিতরে ভিতরে খুশি হলো। তার কর্মচারীরা কেউ স্বার্থপর নয়। তারা সরল সহানুভূতিপরায়ণ। অশিক্ষিত মানুষগুলির আন্তরিকতার পরিচয় পেয়ে সে অভিভূত হলো।

দূরে ট্রাকের 'হর্ন' শোনা গেল। শব্দটা সকলেরই পরিচিত। 'ইয়াসিন ফিরে এসেছে।' অশোকতলায় আবার গুঞ্জন উঠল। 'ডাক্তারবাবু এসে গেছে।' ভিড় ঠেলে বেরিয়ে সীতাংশু

আমলকীগাছটার দিকে এগোতে লাগল, ট্রাক এসে ওখানেই দাঁড়াবে।

যেন একটা ঝড়ের লক্ষণ দেখা গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত আর ঝড়টা এল না। একটু হাওয়া উঠল, দু'ফোঁটা বৃষ্টি পড়ল কি পড়ল না। মেঘটা উড়ে গেল, গাছের পাতাগুলি নড়ে উঠে আবার স্থির হয়ে গেল। অর্থাৎ পীতাম্বরের গাছচাপা পড়া নিয়ে এমন একটা দুর্যোগ টিয়াটুলির জঙ্গলের মাথার ওপর থমথম করছিল। কিন্তু হরিসাধন ডাক্তার পীতাম্বরকে দেখে যাবার পর সকলের ভয়টা কাটল। তখন মুরারি যা বলছিল, পা ভাঙে নি মচকায় নি। তবে পায়ে চোট লেগেছে, আর পায়ের দুটো আঙুল থেঁতলে যাবার দরুণ সামান্য যা রক্তপাত। ডাক্তার পর পর দুটো ইন্‌জেকশন দিতে পীতাম্বরের জ্ঞান ফিরে এল। পা ব্যাণ্ডেজ করে দিয়ে এবং দুটো মিক্‌শ্চার লিখে 'আর ভয় নেই' বলে হরিসাধন যখন ট্রাকে উঠে আবার ইয়াসিনের পাশে গিয়ে বসল তখন সকলের মুখে হাসি ফুটল। যেন দম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল কারখানার মানুষগুলির, ডাক্তারবাবুর কথা শুনে এবং পীতাম্বর চোখ মেলে তাকিয়েছে দেখে তারা ভাল করে নিশ্বাস ফেলতে পারল। না, হরিসাধন যা বলে গেল, পীতাম্বরকে হাসপাতালে দেবার দরকার নেই, বাড়িতে থেকে ক'দিন একটু বিশ্রাম নেবে, মিক্‌শ্চার দুটো খেয়ে যাবে, এবং পরশু আর একবার এসে ডাক্তার তার পায়ের ব্যাণ্ডেজটা খুলে নতুন ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়ে যাবে। ডাক্তারকে স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে ফেরার সময় ইয়াসিন ওষুধ নিয়ে আসবে। ট্রাক চলে গেল।

মুরারি সনাতন লক্ষ্মীচরণ ও মকবুল—এই চারজন ধরাধরি করে পীতাম্বরকে বাড়ি নিয়ে চলল, সঙ্গে আরও দু-চারজন গেল। বাকি মানুষ যে যার বাড়ির পথে ফিরে গেল। জায়গাটা হঠাৎ কেমন ফাঁকা স্তব্ধ হয়ে গেল।

হুঁ, তখন বেলা দশটা। কুয়াশা কেটে গিয়ে চমৎকার ঝলমলে রোদে আকাশ বন হেসে উঠল। দূরে একটা চিল ডাকছিল।

কারখানা বন্ধ, যেন এদিকের কাজকর্মেও সুখী হাত লাগাতে পারছিল না। যেন এই জন্য সীতাংশুই দায়ী। যেন সে চাইছিল না সুখী এখনি ঘরে গিয়ে বাটনা বাটুক, কুয়ো থেকে টেনে টেনে জল তুলুক, উনুন ধরিয়ে রান্নার কাজে লেগে যাক।

সুখী দু-একবার কথাটা বলেও ছিল। সীতাংশু গ্রাহ্য করে নি। 'এই তো সবে চা খাওয়া হলো, তেমন আর কী বেলা হয়েছে—ওসব পরে হবে।' আমলকীতলার রৌদ্রে দাঁড়িয়ে সুখীর সঙ্গে কথা বলছিল সে। অধিকাংশ কথাই পীতাম্বরকে নিয়ে। যদি লোকটা সত্যি গাছচাপা পড়ে মরে যেত তো কী উপায় হতো, ঘরে বৌ আছে, দুটো বাচ্চা আছে। আর বুড়ো বাবা। সারাদিন বিছানায় শুয়ে খকখক কাশে আর হাজার রকম ফরমাস করে বৌটাকে কেবল খাটিয়ে মারে। বৌটা বড় সরল, দেখতেও সুন্দর। সীতাংশুকে একবার একটা কাজে ওদিকে যেতে হয়েছিল। পীতাম্বর তখন তাকে ডেকে নিয়ে তার ছোট্ট খড়ের ঘরে বসায়। বাতাসা ও জল দিয়ে সমাদর করে। এক গেলাস জল ও একটা পিতলের রেকাবিতে চার-ছ'টা বাতাসা সাজিয়ে পীতাম্বরের বৌ তার পায়ের কাছে রেখে তার পা ছুঁয়ে প্রণাম করেছিল। তাই মেয়েটিকে সামনাসামনি ভাল করে দেখার সুযোগ হয়েছিল সীতাংশুর।

'রাখে কৃষ্ণ মারে কে।' কথাটা বলে সুখী লম্বা নিশ্বাস ফেলল।

সীতাংশু মাথা নাড়ল। 'তা ছাড়া আর কি—ঈশ্বর না বাঁচালে কেউ বাঁচতে পারে? আসলে মূল গাছটা তার গায়ে পড়ে নি। পড়লে সঙ্গে সঙ্গে চেপ্টা হয়ে যেত। সনাতন যা বলল। ডালপালার ধাক্কা লেগে এক পাশে ছিটকে পড়েছিল পীতাম্বর, তাই রক্ষে, কেবল পা-টাই একটা মোটা ডালের নিচে চাপা পড়ে যায়, ফলে দুটো আঙুল থেঁতলে গেল।'

'জনার্দন যেভাবে এসে তখন বলল!' ভুরু দুটো কপালে তুলে সেই সঙ্গে একটু হাসির ভাব ফুটিয়ে সুখী বলল, 'আমি তো ভাবলাম, অশোকতলায় গিয়ে বুঝি মরা মানুষটাকেই দেখব।'

'আমিও সেই ভয়ে মরছিলাম, আমার কর্মচারী, আমার এখানে কাজ করতে এসে এভাবে প্রাণ হারাল, দু' চোখে হঠাৎ অন্ধকার দেখলাম—' বলতে বলতে সীতাংশু থেমে গেল। সুখী হঠাৎ ওদিকের ছাতিমগাছটার দিকে ঘাড় ফেরাতে সে সেদিকে ঘাড় ফেরাল। মাধব আসছে। তাই তো, এতক্ষণ পর সীতাংশুর খেয়াল হলো, এতবড় একটা ব্যাপার ঘটে গেল এখানে, অশোকতলায় কত বড় ভিড় হলো, কিন্তু মাধবকে তো একবারও সেখানে চোখে পড়ে নি; অশোকতলা কেন, আশে-পাশে কোথাও সারা সকালের মধ্যে ওই ছোঁড়ার মুখ দেখা গেছে বলে সীতাংশু মনে করতে পারল না।

'কোথায় ছিলি এতক্ষণ, কোথায় গিছলি—' ভাই এসে সামনে দাঁড়াতে সুখী ভুরু কুঁচকে তার চোখের দিকে তাকাল।

মাধব তৎক্ষণাৎ চোখ নামিয়ে পায়ের কাছের ঘাস দেখতে লাগল।

সুখী সীতাংশুর দিকে তাকাল।

'আমি বাড়ি থেকে বেরোবার আগে, সেই কখন অন্ধকার থাকতে ও ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে, ভাবলাম, এখানে এসে দেখতে পাব—কিন্তু এখানে তো সারা সকাল ছিল না!'

'না।' সীতাংশু মাথা নাড়ল। 'মাধব! কোথায় গিয়েছিলি।'

মাধব এবারেও শব্দ করল না। চোখ তুলল না।

'কালা কোথায়?' ভাইয়ের কাঁধে হাত রাখল সুখী। কাঁধ ধরে আস্তে ঝাঁকুনি দিল।

যেন এবার ভয় পেয়ে পর পর দুটো ঢোক গিলল কিশোর। দিদির চোখে চোখ রেখে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল।

'কি হলো, কথা বলছে না কেন ও!' সুখী আবার সীতাংশুর দিকে

তাকাল। 'অশোকতলা থেকে ফিরে এসেই কিন্তু ভেতরে ঢুকে আমি এক নজরে খাঁচাটা দেখে এসেছি। কালাকে দেখতে পাই নি।'

এবার সীতাংশু মাধবের কাঁধে হাত রাখল।

'এত বেলা পর্যন্ত কোথায় ছিলি—কালাকেও তো দেখছি না।'

'ওটাকে রেখে এলাম।'

'কোথায় রেখে এলি?' আর্তনাদের মতন গলার স্বর করল তার দিদি। মাধব দিদির চোখ দেখল না সীতাংশুর দিকে চেয়ে বড় করে একটা ঢোক গিলল।

'কোথায় রেখে এলি বাচ্চাটাকে?' সীতাংশু সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করল।

'হেই খেজুর ঢিবিতে।'

সুখী ও সীতাংশু স্তব্ধ হয়ে গেল। চোখের পলক না ফেলে কিশোরের মুখটা দেখতে লাগল।

যেন একসঙ্গে দু'জনের চাউনি সহ্য করতে না পেরে মাধব আবার পায়ের কাছের ঘাস দেখতে লাগল।

'অ্যাঁ, কাউকে বলা নেই কওয়া নেই—বাচ্চাটাকে ছেড়ে দিয়ে এলি!' কান্নার মতন গলার স্বর করল সুখী।

'কিন্তু ওটাকে যে রেখে এলি, তোর পিছু পিছু আবার ছুটে আসতে চাইছিল না?'

মাধব ঘাড় কাত করল। সীতাংশুর মুখের দিকে তাকাল না।

একটু চুপ করে থেকে সীতাংশু আবার বলল, 'তাই তো দেখছিলাম ক'দিন ধরে, জঙ্গলের ভেতর কোথাও কালাকে ছেড়ে দিয়ে চলে আসার উপায় ছিল না, সঙ্গে সঙ্গে তোর পিছু নিয়েছে।'

'এত ভালবাসত তোকে, আর তুই ওকে ওই ঢিবটার ওপর একলা ফেলে এলি?'

'একলা থাকবে কেন।' এবার মাধব সরাসরি দিদির চোখের দিকে তাকাল। 'ওখানে কালার বাপ-মা ভাই-বোন সবাই আছে, ওর বাড়ি ওটা।'

সীতাংশু অল্প হাসল।

'কিন্তু ওরা তো গর্তের মধ্যে থাকে—কালা কি কাউকে খুঁজে বার করতে পারবে?'

কি ভেবে মাধবও একটু হাসল।

'কালাকে গর্তের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে এসেছি।'

'দেখুন, দেখুন, ভেতরে ভেতরে কতখানি শয়তানি বুদ্ধি রাখে,' সুখী চিৎকার করে উঠল। 'পাছে কালা তার পিছু নেয় তাই ওকে গর্তের অন্ধকারে ঢুকিয়ে দিয়ে পাজি পালিয়ে এসেছে।'

মাধব ঘাড় গুঁজে হাতের নখ খুঁটতে লাগল। অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠে সুখী ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলছিল। তার থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে সীতাংশুর হঠাৎ কেমন ভয় করল।

'তোর ভেতরে কি এক ফোঁটা মায়ামমতা নেই, এত নিষ্ঠুর এত পাষাণ তুই!' ভাইয়েব মাথার চুল ধরে সুখী ঝাঁকাতে আরম্ভ করল।

'থাক থাক।' সীতাংশু বাধা দিতে গেল।

'আমায় ভালবাসত না কালা, আমি ওটাকে দু'চোখে দেখতে পারতাম না।' মাধব কেঁদে ফেলল।

এক সেকেণ্ড স্থির হয়ে শুনল সুখী। তারপর সীতাংশুর দিকে চোখ ফেরাল।

'আমি বলে রাখছি, দেখবেন, বড় হলে হতভাগা কতখানি শয়তান হয়, পাষণ্ড হয়—'

সীতাংশু বিমূঢ় হয়ে গেল। যুবতীর দুই চোখে জল টলটল করছিল।

'এই যে পাখির ছানাটাকে আমি পুষছি, নিজের হাতে চান করাই খাওয়াই আদর করি, ও যদি আমায় নাও ভালবাসে, আমি কি কোনোদিন ওকে বনে ছেড়ে দিয়ে আসতে পারব!'

সুখী আর দাঁড়াল না, আর কারো দিকে তাকাল না, আঁচলে চোখ মুছে সীতাংশুর ডেরার দিকে চলে গেল।

'তারপর? এখন কী পুষবি? আর একটা খরগোসের ছানা ধরা হবে রাত্রে?'

মাধব চোখ মুছল না। চোখে জল নিয়ে সজোরে মাথা নাড়ল। 'ন্‌নাঃ, আর খরগোস ধরব না, ধলার মতন বাচ্চা আর ওখানে নেই, সব ক'টা বদমাস।'

সেই ধলা, ধলার স্মৃতি এখনও তা হলে কিশোরের মন থেকে একেবারে মুছে যায় নি। সীতাংশুর ভাল লাগল। 'তা হলে এখন কী পোষা যায়?' মাধবের চোখ দুটো দেখল সে। দখিনের বাদামগাছটার ওপিঠে বেঁকে গিয়েছে সূর্যটা, কত তাড়াতাড়ি পশ্চিমদিকে এগোচ্ছে। শীতের বেলা, কতটুকু তার পরমায়ু। শুকনো খরখরে হাওয়ায় গলগল করে শীত নেমে আসছে।

দুবার ঢোক গিলে গলার ভিতরটা পরিষ্কার করে নিয়ে মাধব বলল, 'এবার একটা উদ ধরে পুষব।'

তার মানে ভোঁদড়। সীতাংশু অবাক হয়ে কিশোরের মুখটা দেখতে লাগল, হাসি পেল তার। কিন্তু হাসল না। ছেলেমানুষ, কী অদ্ভুত এক-একটা ঝোঁক চেপে বসে মাথায়।

যেন হাসি লুকোতে সীতাংশু ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে তাকাল। একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী ঝাউগাছের পেছন দিয়ে দ্রুত আকাশে উঠে হাওয়ায় চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। সুখী উনুন ধরাচ্ছে, সীতাংশু বুঝল।

'উদ কোথায় পাওয়া যাবে শুনি?' গম্ভীর হয়ে মাধবের দিকে তাকাল সে।

'হেই নালার ধারে,' মাধব আঙুল দিয়ে দূরের একটা ছাতিমগাছ দেখাল। 'ওখানে বেতজঙ্গলে উদের বাসা আছে, আমি কাল দেখে এসেছি।'

কত ঝাড়জঙ্গলে না ছেলেটা ঘুরে বেড়ায়। সীতাংশু চিন্তা করল। পাহাড়ি নালার ধারে বেতঝোপ আছে কি না সে মনে

করতে পারল না। তবে সেই নালার ওপর বাঁশের সাঁকোর ছবিটা তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। ঐ সাঁকো পার হয়ে কতবার সে রাণীরবাগ গেছে। রাণীরবাগের ডাক্তার যখন মোটরবাইক চেপে এদিকে আসে তখন মাঝপথে ঐ নালার জন্য গাড়ি থেকে নেমে যায়। দু'চাকার গাড়িটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে সাঁকো পার হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না।

'তবে ছাতিমগাছের কাছে তো নালা নয়। ওই রাস্তা ধরেই অবশ্য এগোতে হবে।' সীতাংশু বিড়বিড় করে বলল, 'ছাতিমগাছ পেছনে রেখে আরও এক মাইল হেঁটে গেলে তবে সেই পাহাড়ি খাত।'

সীতাংশু মাধবের দিকে ঘাড় ফেরাল।

'কখন যাবি সেখানে?'

'আমি এখনি চলে যাব।' উৎসাহে কিশোরের চোখ দুটো জ্বলে উঠল।

'দূর পাগ্‌লা!' সীতাংশু শব্দ করে হাসল। 'আমিও যে যাচ্ছি তোর সঙ্গে। খাওয়াদাওয়া করে দু'জন একসঙ্গে বেরিয়ে পড়ব।'

উৎসাহ বেড়ে গেল মাধবের। এবার দাঁত ছড়িয়ে হেসে সে ঘাড়টা কাত করল। দু'গালে তখনও জলের দাগ চিকচিক করছে।

সীতাংশু আর একজনের চোখের জলের কথা ভাবল। এই মাত্র আঁচল দিয়ে চোখ মুছে সে ঘরে চলে গেল। তার ভয়ানক হাসি পাচ্ছিল ছবিটা মনে পড়ে। মাধবের দিদি হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেছে। ভালবাসার ধারে-কাছেও আমি নেই, ভাল লাগতে পারে—এই পর্যন্ত, দেখবেন, যখন ভাল লাগবে না খাঁচা খুলে পাখিটাকে একদিন জঙ্গলে উড়িয়ে দেব, কালা কোলে উঠতে চাইলে কান ধরে কোল থেকে নামিয়ে দেব।' কবে বলেছিল কথাটা সে, কাল? পরশু? যেন সীতাংশু এর মধ্যেই ভুলে গেছে। কিন্তু কথাটা মনে গেঁথে আছে।

'তাই বলো,' সীতাংশু আবার মনে মনে বলল, 'তোমার সবটাই মরুভূমি না, ভালবাসার ফল্গুধারা হৃদয়ের গভীরে লুকানো রয়েছে, মাথাচাড়া দিয়ে ওপরে উঠতে চাইলেই জোর করে চাপা দিতে চাইছ, তাই নিষ্ঠুরতার ভান, তোমার অমন দীঘির মতন কালো ঠাণ্ডা চোখ আচমকা ইস্পাতের মতন কঠিন হয়ে ওঠে।'

আজ? পোষা খরগোসের বাচ্চাটাকে ভাই বনে ছেড়ে দিয়ে এসেছে শুনে যুবতী চোখের জল লুকোতে পারল না। কেঁদে ফেলল।

সীতাংশু বড় তৃপ্তিবোধ করছিল।

দূরে পাশাপাশি দুটো দেবদারুগাছ দাঁড়িয়ে আছে, দুটো গাছের মাঝখান দিয়ে সূর্যটা নেমে যাচ্ছে। এখন আর তেজ থাকবে কী। তা-ও শীতের সূর্য। বেলা বারোটা পর্যন্ত যা একটু ঝলমল করে, খানিকটা জ্বালাপোড়া থাকে—তারপর থেকে কেমন একটা ফ্যাকাশে কমলা রং ধরে। যেন তাপ কমে যায়, ভিতরের আগুন মিইয়ে আসে। এখন তো কথাই নেই। অস্ত যাবার মুখে। তবে কি না যাবার সময় মিষ্টিমতন যে লাল আভাটুকু ছড়িয়ে যাচ্ছিল তাকিয়ে দেখবার মতন। আর সেই নরম আলোয় ঘাস লতাপাতা গাছের ডাল—সব কিছুই যেন লাল হয়ে উঠেছিল।

বাঁশের সাঁকোটাকেও লাল করে দিয়েছিল।

দেবদারুগাছ দুটোর দিকে মুখ করে তিনজন একটা ছোট ঢিবির ওপর বসে বিশ্রাম করছিল। কাজেই মাধবের দিদির মুখের অত্যধিক ফরসা চামড়া সেই লাল আভা লেগে কেমন রং ধরেছিল সেটা বোঝা যায়। তেমনি মাধবের মাথার লালচে চুল। যেন আর এক পোঁছ লাল রং লেগে মাথাটা হোলি খেলার দিনের মাথা হয়ে গিয়েছিল।

সীতাংশু নিজের হাতের দিকে তাকাল আঙুলগুলি দেখল।

তার চামড়া ফরসা না। তা হলেও বিকেলের চমৎকার আলো লেগে আঙুলের নখগুলি বেশ একটু লাল রং ধরেছে।

কিন্তু কতক্ষণ থাকল এই আবির ছড়ানো খেলা! টুপ করে সূর্যটা ডুবে গেল। দেখতে দেখতে আকাশ পৃথিবী কালো হয়ে গেল। ভাল করে না তাকালে সাঁকোটা যেন আর চোখেই পড়ছিল না। দেবদারুগাছের ওপারে আকাশের সিঁদুরে রংটুকু যখন একেবারে মুছে গেল তখন গাছপালা সব কেমন ঝাপসা হয়ে গেল।

একটু আগে সুখী, তখনও বেশ আলো ছিল, একা একা সাঁকোটা দুবার এ-পার ও-পার হয়েছে। এমনি। ছেলেবেলায় না কি তার সাঁকো পার হতে খুব ভাল লাগত। বাবার হাত ধরে সাঁকো পার হয়েছে, বাবার সঙ্গে পিয়ালীছড়াব মেলায় গেছে, রাণীরবাগের চা বাগানও দেখে এসেছে একবার। বড় হয়ে আর সাঁকো পার হয় নি।

সাঁকো দেখতেই ভাইয়ের সঙ্গে এসেছিল সে। সকালে ভাইয়ের চুল ধরে টেনেছিল। কালাকে খেজুর ঢিবিতে ছেড়ে দিয়ে এসেছিল বলে তার খুব দুঃখ হয়েছিল। রাগও হয়েছিল, এইজন্য ভাইকে মারতে গিয়েছিল। কিন্তু তারপর অবশ্য রাগটা আর থাকে নি। শত হোক ছোট ভাই। বরং সীতাংশুকে নিয়ে নালার ধারের বেতজঙ্গলে উদ ধরতে যাবে শুনে দুপুরে সে খুব হেসেছিল। হঠাৎ তার এই হাসি দেখেই সীতাংশু বুঝতে পেরেছিল মাধবের দিদি রাগ করে খুব বেশি সময় থাকতে পারে না, রাগটা আপনা থেকে এক সময় জুড়িয়ে জল হয়ে যায়। তাই তো হবে, মনে মনে বলেছিল সীতাংশু, মানুষটার ভিতরটা মায়া-মমতায় ভরা, কিন্তু মমতা দেখাবার মতন তেমন কাউকে পেল না বলে আজ সীতাংশুর এখানে চাকরি করতে এসেছে।

হুঁ, উদ ধরবার কথা শুনে হেসে গড়াগড়ি যাবার মতন অবস্থা তখন মাধবের দিদির। উদ যে পোষ মানে এই কথাটাই মাধব তার

দিদিকে বিশ্বাস করাতে পারছিল না। নালার কাছে বেতজঙ্গলে উদের বাসা আছে। মাধব নিজের চোখে দেখে এসেছে। ফাঁক পেলেই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে নালার মধ্যে নেমে পড়ে ওরা। সেখানে মাছ ধরে খায়। দিদিকে সে অনেক কিছু বোঝাচ্ছিল। কাজেই যদি একটা উদের ছানা ধরে এনে ওটাকে রোজ একটু একটু করে মাছ খেতে দেওয়া হয় তো সেই ছানা পোষ না মেনে যাবে কোথায়। মাধব আরও বলছিল, যদি বাঘ সিংহের বাচ্চাকে বন থেকে ধরে এনে লোকে পোষ মানাতে পারে তো উদের বাচ্চাকেও পোষ মানান যাবে, বরং সেটা সহজ হবে, বাঘ সিংহের মতন ওরা মানুষ ধরে খায় না ইত্যাদি।

যাই হোক, হয়তো ভাইয়ের কথা শেষ পর্যন্ত সুখী বিশ্বাস করেছিল, কিন্তু মুখে বলছিল, সাঁকো দেখতে সে তাদের সঙ্গে যাবে। কথাটা বলার সময় সীতাংশুর দিকে মুখ ঘুরিয়ে সে সুন্দর করে হেসেছিল। পাহাড়ি খাতের ওপর সেই সাঁকোটা কতদিন সে দেখে নি। শুনে সীতাংশু খুশি হয়েছিল।

দুপুরে আজ মাধব ও তার দিদি সীতাংশুর এখানেই ভাত খেয়েছে। সীতাংশু দুজনকে বাড়ি যেতে দেয় নি। কেননা পীতাম্বরের সেই ঘটনার পর সীতাংশুর জন্য রান্না চাপাতে যখন অনেক বেলা হয়ে গেল তখন সীতাংশু মাধবের দিদিকে ও মাধবকেও তার এখানে খেতে বলল এবং সেভাবেই মাধবের দিদিকে রান্না করতে বলল। এত বেলায় বাড়ি ফিরে গিয়ে তারা কখন খেত। তাতে অবশ্য মাধবের দিদি আপত্তি করে নি, কিন্তু প্রথমটায় খুবই সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিল, তারপর সঙ্কোচটা আস্তে আস্তে কাটিয়ে ওঠে। সীতাংশুর এখানে ভাত খাবে শুনে মাধব অবশ্য খুবই খুশি হয়েছিল।

যাই হোক, খেতে বসেই সুখী মাধবের উদ শিকারে বেরোতে যাবার কথাটা প্রথম শোনে। শুনে সে হেসেছিল যেমন, অবাকও কম হয় নি। মাধব ছেলেমানুষ, শেয়াল বানর কাঠবিড়াল···কত

কী ধরে পুষবার পরিকল্পনা রাতদিন তার মাথায় ঘুরে বেড়ায়, সুতরাং উদের চিন্তাটাও যদি সেই সঙ্গে এসে জোটে তো তাকে দোষ দেওয়া যেত কি ? কিন্তু এই ব্যাপারে যে সীতাংশুর মতন একটি বয়স্ক মানুষের পুরো সমর্থন রয়েছে সেটাই মাধবের দিদির কাছে অদ্ভুত ঠেকছিল। সীতাংশুকে এই নিয়ে সরাসরি কোন প্রশ্ন করছিল না, কিন্তু তার তাকানো দেখে সীতাংশু মনের ভাবটি বুঝতে পেরেছিল। এবং সাঁকো দেখার নাম করে যুবতী যে শেষ পর্যন্ত তাদের সঙ্গে চলে এল, নিশ্চয় সীতাংশু সম্পর্কে কৌতূহলটা দমন করতে পারছিল না সে। হুঁ, মাধবের সঙ্গে বেতঝোপের ভিতর ঢুকে পড়ে এতবড় মানুষটা কেমন করে উদ ধরে একবার দেখতে দোষ কি—এই জন্য সীতাংশুও ভিতরে ভিতরে কম কৌতুকবোধ করছিল না।

কিন্তু কোথায় উদ, এতটা সময় মাধব জঙ্গলের ভিতর উঁকিঝুঁকি মারছিল, অর্থাৎ কোথাও একটু ফাঁক, কোথাও ঝোপটা একটু পাতলা আছে দেখলে খানিকটা খানিকটা ভিতরেও ঢুকে পড়ছিল সে, কিন্তু জঙ্গল এত গভীর এবং কাঁটার দাঁত মেলে বেতগাছগুলি এমনভাবে গলা বাড়িয়ে আছে—একটু অসাবধানে পা বাড়াও কি ঘাড় ফেরাও, চারদিক থেকে বেতকাঁটা বিঁধে গায়ের চামড়া ঝাঁঝরা করে দেবে। কাজেই মাধবের পিছন থেকে সীতাংশু অবিরাম তাকে সাবধান করে দিচ্ছিল, 'এই আর না, আর ভেতরে ঢুকতে হবে না—উঁহু ওখানে সাপ আছে বিছা আছে, ওদিকে গেলে পাগলা শেয়ালে কামড়ে দেবে...' কিশোরের দুরন্ত সাহস খর্ব করে দিতে যতরকম ভয়ের জিনিস আছে সীতাংশু ক্রমাগত সেগুলি উল্লেখ করছিল। কিন্তু তাতেও কি মাধবকে নিবৃত্ত করা যেত, আরও খানিকটা ভিতরে ঢুকে পড়ত সে, কিন্তু কাঁটার জন্য শেষ পর্যন্ত পিছনে হটে এসেছে। নাকে কপালে হাতে পায়ে কাঁটার আঁচড়ও কম লাগল না। 'তবে কি না, মস্ত একটা ভুল হয়ে গেছে বাবু।' জঙ্গলের বাইরে এসে সে বলছিল, 'তখন মোটেই খেয়াল করি নি।' 'কি আবার মস্ত ভুল হলো ?'

একটু থমকে গিয়ে সীতাংশু মাধবের চোখের দিকে তাকিয়েছিল। গম্ভীর হয়ে কিশোর মাথাটা একপাশে হেলিয়ে দিয়েছিল। 'আঃ, একবার যদি কথাটা মনে পড়ত—' বিড়বিড় করে উঠল সে। 'আমার কাছে বল না, যদি এখন ব্যবস্থা করা যায় কিছু।' সীতাংশু ঠিক হাসতে গিয়েও হাসতে পারছিল না। পাতার ওঁপর তখনও কিছু কিছু রোদের ছিটা লেগে আছে, কিন্তু জঙ্গলের ভিতর চাপ চাপ অন্ধকার জমে উঠেছে। শীতের শুকনো হাওয়ায় বেতঝোপ সরসর করে কাঁপছিল।

'একটা কাটারি সঙ্গে আনলে আর ভাবনা ছিল না। আপদ কেটে সাফ করে দিতাম।' মাধব ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলল।

'হুঁ, তা হলে খুবই সুবিধে হতো, ভেতর ঢুকে পড়া যেত।' মাধবের আক্ষেপের কারণটা সীতাংশু বুঝতে পারল। 'তা এক কাজ করলে হয় না!'

তার কৌতুকটা কিশোর হঠাৎ বুঝতে পারল না, ফ্যালফ্যাল করে সীতাংশুর মুখটা দেখল। বস্তুত এই ভয়ঙ্কর কাঁটাঝোপের ভিতর ঢুকে একটা উদের বাচ্চা ধরে ফেলার আশা নিয়ে তখনও যে সে জ্বলছিল তার চোখ দেখে সীতাংশু বুঝতে পারল। আস্তে আস্তে বলল, 'এক কাজ করলে হয়, ছুটে গিয়ে ঘর থেকে আমার কাটারিটা নিয়ে এলে হয়।'

'আমি চলে যাব!' কিশোর লাফিয়ে উঠল।

'পাগল!' সীতাংশু তার কাঁধ চেপে ধরল। 'এখন গিয়ে কাটারি নিয়ে ফিরে আসতে আসতে রাত হয়ে যাবে যে।'

এবার কিশোর দমে গেল। চোখ তুলে আকাশ দেখল। ঘাড় ঘুরিয়ে দেবদারুগাছ দুটো দেখল। রোদের শেষ ঝিকিমিকিটুকু মুছে দিয়ে সূর্যটা কত তাড়াতাড়ি ডুবে যাচ্ছে।

'ঠিক আছে।' ঠোঁট দুটো হঠাৎ শক্ত করে চেপে ধরল বালক। মাটির দিকে চোখ নামিয়ে এক সেকেণ্ড ভাবল। তারপর মাথা

ঝাঁকিয়ে সীতাংশুর মুখের ওপর জ্বলজ্বলে চোখ দুটো মেলে ধরল। 'আজ আর হলো না—কাল, কাল কাটারিটা সঙ্গে করে আনব, তারপর দেখা যাবে বেত-কাঁটা কেমন আমার পথ আটকায়।'

স্তব্ধ হয়ে রইল সীতাংশু। যেন ঐটুকুন ছেলের কানে কানে কেউ বলে দিয়েছে, আশা ছাড়তে নেই, আশা নিয়ে বাঁচতে হবে, আজ যদি না পার কাল আবার দেখো।

'হুঁ, তাই হবে।' আর কৌতুক করল না সে। গাঢ় গলায় বলল, 'কাল কাটারি নিয়ে আসব, একটা মশালও সঙ্গে আনব। অন্ধকার হলেও আমরা ঠিক ভেতরে ঢুকে পড়ব।'

সেই মুহূর্তে সুখী সাঁকো থেকে নেমে এসে দুজনের পিছনে দাঁড়ায়। যেন সে আশা করেছিল একটা উদের বাচ্চা ধরে তারা তার জন্য অপেক্ষা করবে। কিন্তু দুজনকে শূন্য হাতে জঙ্গলের কিনারে শুকনো মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ব্যাপারটা চট করে বুঝে ফেলল। হয়তো হতাশই হলো সে, বলা যায় না, বুদ্ধিমতী মনের ভাবটা পুরুষ দুটিকে বুঝতে না দিয়ে খুক করে হাসল।

হাসি শুনে মাধব ও সীতাংশু চমকে উঠে ঘাড় ফেরাল। যুবতী এভাবে তাদের দিকে তাকিয়ে হাসছে কেন সঙ্গে সঙ্গে তারা ধরে ফেলল বৈকি। কিন্তু মাধব বেপরোয়া ছেলে, লজ্জাটজ্জা জানে না। সীতাংশুর কান দুটো লাল হয়ে উঠল।

'পারলেন না একটাও ধরতে?' সুখী সরাসরি তার চোখের দিকেই প্রথম তাকাল।

'হুঁ, খুবই চেষ্টা করা হয়েছে।' রীতিমত থতমত খেয়ে বড় করে একটা ঢোক গিলল সীতাংশু, যেন তারপর কী বলতে হবে বুঝতে না পেরে চোখ আড় করে মাধবের দিকে তাকাল।

মাধবের মুখে উত্তর তৈরি ছিল। আকাশের দিকে মুখ করে বেশ গম্ভীর গলায় বলল, 'না পারার আছে কী, ভুল করে কাটারিটা আনা হয় নি। তা না হলে, একটা কেন, তিনটে বাচ্চা ধরে আনা যেত।'

'কি রকম?' এবার সুখী থতমত খেল। ঢোক গিলল। 'কাটারি দিয়ে কী হতো!'

'জঙ্গল কেটে আরো খানিকটা ভেতরে ঢোকা যেত।' সীতাংশু এবার অনেকটা সহজ গলায় বলল, 'কাঁটার জন্যে এগোনো যাচ্ছিল না।'

'তাই বলুন!' সুখী আবার একটু হাসল। 'আমি ভাবলাম কাটারি দিয়ে বুঝি ধাড়িগুলোকে কেটে ফেলে বাচ্চাগুলোকে ধরে আনতেন। মানে হাতে অস্ত্র থাকলে ওদের ধরা সহজ হতো।'

দিদি ঠাট্টা করছে। এবার মাধব চট করে বুঝল। কিন্তু গায়ে মাখল না, যেন মেয়েছেলে এসব শিকার-টিকারের কিছু বোঝে না, তাদের দিয়ে তো কোনো সাহায্যই হয় না, বরং সঙ্গে থাকলে তারা আবোল-তাবোল বকে—চোখে-মুখে একটা উপেক্ষার ভাব ফুটিয়ে দিদির দিকে সে সম্পূর্ণ পিছন ফিরে দাঁড়াল।

'এক কাজ করলে হয় বাবু!'

'কী কাজ।' সীতাংশু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করল।

'এটা উত্তর, কাল আমরা আর ইদিক দিয়ে জঙ্গলে ঢুকবো না, পূব দিক দিয়ে ঢুকতে চেষ্টা করব।'

'ওদিকে ঝোপঝাড় কম বুঝি?'

'আমার যেন তাই মনে হলো।'

'তবে তাই করব।' এক সেকেণ্ড থেমে থেকে গলায় আর একটু বেশি জোর দিয়ে সীতাংশু বলল, 'হুঁ, তাই আমাদের করতে হবে।'

এবার মাধব বীরদর্পে দিদির দিকে ঘুরে দাঁড়াল, চোখ বড় করে দিদিকে দেখল, দিদির হাসি ও ঠাট্টা সীতাংশু যে গায়ে মাখল না বরং একটি ছোট ছেলের উৎসাহ দেখে তার মতন একটি বয়স্ক মানুষের মধ্যেও উৎসাহ জেগে উঠেছে, কাল আবার মাধবকে নিয়ে সে উদ শিকার করতে আসবে—চিন্তাটা কিশোরকে গর্বিত করে তুলল। হয়তো এই গর্ব নিয়ে সে হেসে উঠে দিদিকে বলল, 'আমরা আমাদের

কাজ ঠিক করে যাব, এখন সাঁকোর ওপর তোর কেমন লাগল শুনি, অনেকক্ষণ তো ছিলি ?'

অন্য সময় হলে ভাইয়ের পাকামি দেখে সুখী হাসত। কিন্তু বেতঝোপের ভিতর থেকে উদ খুঁজে বার করার ব্যাপারটা হঠাৎ কেমন যেন জব্দ করে দিল তাকে। যেন সে আশা করতে পারছিল না একটা বাচ্চা ছেলের খেয়ালখুশির সঙ্গে তাল রেখে সীতাংশু তার সুরে সুর মিলিয়ে এভাবে হুঁ হ্যাঁ করবে। আজকের এই শিকার পর্বটা প্রথম থেকে সুখীর কাছে কৌতুকের মতন ঠেকছিল, নিশ্চয় সীতাংশুর মনের ভাবও অনেকটা তাই হবে ধরে নিয়েছিল সে, কেবল মাধবের মন রাখতে সীতাংশু তার সঙ্গে নালার ধারে চলে এসেছে হয়তো, যেমন সুখী এসেছে, বেড়ানো হবে সাঁকো দেখা হবে —কিন্তু মাধবের মতন উদ ধরার চিন্তা নিয়ে এত বড় মানুষটাও যে মেতে উঠবে, সুখীর ধারণা ছিল না। কাজেই অপ্রস্তুত হলো সে, লজ্জা পেল এবং ছোটভাইয়ের প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ করে দুটো দেবদারুগাছের ফাঁকে সূর্যাস্তের ছবিটা দেখতে লাগল।

যুবতীর এই স্তিমিত ভাবটা সীতাংশু লক্ষ্য করল। একটু কষ্ট হলো তার মেয়েটির জন্য। তাই তো, হাসিখুশি মানুষ যদি হঠাৎ বিষণ্ণ হয়ে ওঠে, চুপ করে থাকে তো যারা ধারেকাছে থাকে তাদের খুব খারাপ লাগে। একটু জোর করে হেসে মাধবের দিদির মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করল সীতাংশু।

'কই, দুবার সাঁকো পার হলে, কেমন লাগল বললে না তো!'

সুখী সামান্য হাসল, কিন্তু বড় শুকনো দেখাল তার হাসি। 'মন্দ না।' সংক্ষেপে উত্তর সেরে পায়ের কাছের ঢিবিটার ওপর আস্তে আস্তে বসে পড়ল সে। বেশ একটু ক্লান্তি এসেছে তার বোঝা যাচ্ছিল। দেখাদেখি সীতাংশু ঢিবির একপাশে বসল। মাধবও বসল।

না, তারপর আর উদ শিকারের বিষয় নিয়ে একটা কথাও বলল না তারা। সীতাংশু ইচ্ছা করেই প্রসঙ্গটা উঠতে দিল না। কাজেই মাধবও চুপ করে রইল তারপর, যতক্ষণ না সূর্য ডুবে আকাশ বন অন্ধকার হয়ে গেল, সীতাংশু ও সুখী শুধু এই নালার গল্পই করল। বড় গভীর এই পাহাড়ি খাদ। তুধারে আশস্যাওড়া ও বাবলার জঙ্গল নিয়ে পাড় তুটো এত খাড়া হয়ে নেমে গেছে—সাঁকোর ওপর থেকে নিচের দিকে তাকালে, একমাত্র সাঁকোর ওপর থেকেই ভিতরটা যা হোক তবু কিছু চোখে পড়ে, তা-ও দিনের বেলা, তাছাড়া সব সময়ই সেখানটা অন্ধকার, কান পাতলে জলের একটা ক্ষীণ শব্দ শোনা যায় শুধু—হুঁ, সাঁকোর ওপর দাঁড়িয়ে নিচের দিকে তাকালে রীতিমত ভয় করে, মাথা ঝিমঝিম করে—লোকে পাতালের কথা বলে, মনে হয় ঐ বুঝি পাতাল, পাতালের দিকে চেয়ে আছি, জলটাকে জল মনে হয় না, কেমন একটা চাপা গভীর কলকল শব্দ করে কিসের একটা কালো স্রোত যেন কোন্ জগৎ থেকে ছুটে এসে আবার কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে।

'ছেলেবেলায় যখন সাঁকো পার হতে তখন ভয় করত না?'

'না।' মাধবের দিদি মাথা নাড়ল।

সীতাংশু একটু অবাক হলো উত্তরটা শুনে। তেমনি সুখী। হঠাৎ ছেলেবেলার প্রশ্ন কেন বুঝতে না পেরে ঘাড় ফিরিয়ে সীতাংশুকে দেখল। সঙ্গে সঙ্গে সীতাংশুও সুখীর মুখটা দেখল। এভাবে হঠাৎ চোখ চোখে পড়তে তুজন নিঃশব্দে হাসল। হাসিটা মাধব দেখল না। একটা ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে কেন জানি অন্ধকার জঙ্গলের দিকে সে হঠাৎ ছুঁড়ে মারল। দূরে গাছের পাতার অস্পষ্ট শব্দ হলো। শব্দটা সুখী শুনল, সীতাংশুও শুনল।

'তাই হয়।' সীতাংশুর চোখে চোখ রেখে মাধবের দিদি ছোট করে একটা নিশ্বাস ফেলল। যেন ইতিমধ্যে চিন্তা করে উত্তরটা সে খুঁজে পেয়েছে। 'কতগুলো ভয় আছে যা ছোটবেলায় আমাদের

পায় না, কিন্তু বড় হলে মাথায় ঢোকে। বুকের ভেতর তখন কেমন গুরগুর করে।'

'পাতালের ভয়?'

'হুঁ', সুখী অল্প শব্দ করে হাসল। 'নরকের ভয়, পাতাল বলতে আমরা নরককেই বুঝি—কথায় বলে নরকযন্ত্রণা।'

'তাই তো।' কথাটা শুনে সীতাংশু খুশি হলো।

'যখন বড় হই, যখন আমাদের বয়স বাড়ে তখন আমরা নরকের কথা ভাবি, কেননা তখনই পাপচিন্তা আমাদের মাথায় ঢুকতে থাকে, পাপ কাজও সময় সময় করে ফেলি।'

সুখী আর শব্দ করল না। হাসল না।

আর একজন মনোযোগ দিয়ে কথাটা শুনল। সীতাংশু চুপ করতে মাধব বলল, 'যেমন দিদির বর, ও বেটা ঠিক নরকভোগ করবে।'

সীতাংশু ও সুখী একসঙ্গে চমকে উঠে তার দিকে তাকাল।

'কেন, নরকভোগ করবে কেন?' ভাইয়ের মুখ থেকে কথাটা না শুনে যেন পারছিল না সুখী। 'কি করেছে ও শুনি?'

'তোকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে।' গম্ভীর হয়ে মাধব উত্তর করল।

শুনে সুখী একঝলক হেসে সীতাংশুর দিকে ঘাড় ফেরাল।

'বাবা রোজই একবার করে কথাটা বলছে কি না, মাধবও এখন তাই বলছে। আসানসোলের ওই মানুষটার পাপের তুলনা নেই, তাকে নরকভোগ করতে হবে।'

'তা তো বটেই। অন্যায় করেছে, তার শাস্তিভোগ তাকে করতে হবে।' অন্ধকারে সাঁকোটা ঝাপসা দেখাচ্ছিল। সীতাংশু সেদিকে চোখ ফেরাল।

'কিন্তু আমার ভয় করছিল কেন ওটার ওপর দাঁড়িয়ে? আমি কি কোনো পাপ করেছি!'

যুবতীর এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারল না সীতাংশু।
অন্ধকার বন লক্ষ্য করে মাধব আর একটা ঢিল ছুঁড়ল

টেবিলের ওপর হ্যারিকেনটা বসান। দপদপ করে সলতেটা জ্বলছে। যাবার সময় আলোটা একটু বেশি চড়িয়ে দিয়ে গেছে সুখী। আর ঠিক টেবিলের ওপাশে দেওয়ালের হুকে খাঁচাটা ঝুলছে। সীতাংশু একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে রইল। বাতির আলো সরাসরি খাঁচার ওপর গিয়ে পড়েছে। তাই যেন পাখির ছানাটা ঘুমোতে পারছে না। ঘাড় উঁচু করে টলটল করে সীতাংশুর দিকে চেয়ে আছে। কালো পুঁতির মতন খুদে চোখ দুটো কী অসম্ভব চিকচিক করছে!

কিন্তু সীতাংশু ভাবছিল, আজও সুখী ঘরে ফেরার সময় খাঁচাটা সঙ্গে নিয়ে গেল না, রেখে গেল। যেমন কাল রাত্রে রেখে গিয়েছিল।

কাল তবু একটা কারণ ছিল। রাণীরবাগের মানুষ দুটি বেড়াতে এসেছিল। পাছে তারা চলে যাবার পরও সীতাংশু একলা ঘরে বসে ঐ দুটি মানুষের কথা ভাবে তাই বুদ্ধি করে সুখী পাখিটা রেখে গিয়েছিল। পাখি দেখলে মাজাঘষা মুখ দুটো সীতাংশু ভুলে থাকবে। তখন শুধু বনের কথা এই জঙ্গলের কথা ভাববে সে। পাখি মানেই বন।

সেটা অবশ্য একটা কথা নয়, সীতাংশু পরে চিন্তা করেছে, খাঁচাসুদ্ধ পাখিটা ঘরে না থাকলেও একলা বসে বসে সে এই জঙ্গলের কথাই চিন্তা করত, জঙ্গলের গভীর নৈঃশব্দ্য কান পেতে অনুভব করত। এই জঙ্গল ছেড়ে তার মন তার আত্মা কখনই ডাক্তারের লাল মোটর-বাইকটার পিছু পিছু ছুটত না।

যা হোক, কাল মাধবের দিদি যা করেছিল ভালই করেছিল, মনে মনে তার কাজের প্রশংসা করেছিল।

কিন্তু আজ খাঁচাটা এখানে কেন ?

ভুরুর মাঝখানে চুলের মতন একটা সূক্ষ্ম রেখা নিয়ে সীতাংশু পাখির ছানাটাকে দেখছিল। যেন বাচ্চা পাখিটার চোখের মধ্যে সুখীর মনের কথা লেখা রয়েছে। কিন্তু তা আর কেমন করে সম্ভব, বরং কালো কুচকুচে চোখ ছুটোর মধ্যে সীতাংশু গাছের পাতার ছবি দেখছিল, খড়কুটো দেখছিল, ফলমূল পোকামাকড় শস্যকণা—কত কিছু মনে পড়ছিল তার। রৌদ্র আকাশ রাত্রির ঘুটঘুটে অন্ধকার অথবা গোলাপের মতো রক্তিম ঊষা—এসব ছাড়া সীতাংশু আর কিছু ভাবতেই পারছিল না।

খাঁচা থেকে চোখটা তুলে সে অন্যদিকে তাকাল। আর একদিকের বেড়ার গায়ে চোখ ছুটো ধরে রাখল। যেন সেখানে একটা স্থির বিন্দু খুঁজে পেল সে। বিন্দুটাকে কেন্দ্র করে তার চিন্তা এবার ক্রমাগত পাক খেতে লাগল। বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করছিল না, তবু যেন বিশ্বাস না করে সে পারছিল না। পাখিটাকে সুখীর ভাল লাগছে না। হুঁ, কাল থেকে ভাল লাগছে না, তাই এখানে ফেলে রেখে গেছে, কাল যা করেছিল ও।

আশ্চর্য, হুট করে মাধব যদি সীতাংশুর কানে কথাটা না তুলত তখন। তারা ছুজনে বেতঝোপের ভেতর উদ খুঁজছিল তখন। সুখী একা সাঁকোর ওপর থেকে নুয়ে পাতালের অন্ধকার দেখছিল।

অথচ কাল কোন ফাঁকে যে রণধীর মাধবের দিদিকে কথাটা বুঝিয়েছিল। পাকা চুল খোঁজার মতন সেই সময়টার মিনিট সেকেণ্ডগুলি তন্নতন্ন করে নেড়েচেড়ে দেখতে লাগল সে। অর্থাৎ যতক্ষণ গিন্নীকে নিয়ে ডাক্তার এ ঘরে ছিল। সুখী রান্না করছিল, পরিবেশন করছিল, একটা সময় তাদের সামনে এসেছিল, এতটা সময় বারান্দায় গিয়ে সে ধোয়ামোছা করছিল। এবং সীতাংশু নিজে কতক্ষণ ঘরে ছিল, কখন বা ঘরের বাইরে গেল। সময়ের চুলচেরা হিসাব করল সে। এমন একটা সময় সে মনে করতে পারছিল

না, যখন সে সামনে ছিল না, অথচ সুখী ছিল রণধীর ছিল। আর তখন রণধীর সুখীকে তার খাঁচার পাখিটা নিয়ে এত সব কথা বলে গেল। বড় হলে মোটেই এটা দেখতে ভাল পাখি হবে না। গলার স্বর মোটা হবে কর্কশ হবে, চোখ দুটো গাঁজাখোরের চোখের মতন লাল টকটকে হয়ে যাবে, একটা পালকও নীল সবুজ কি সোনালি রং ধরবে না, এখন যেমন আছে তার চেয়েও খারাপ রং হয়ে যাবে তখন, পোড়া মাটির মতন কটকট করবে পাখা ঠোঁট পায়ের নখ। মানে যতটা হতকুচ্ছিত হয় তাই হবে দেখতে এই পাখি। সেই জাতের পাখির ছানা এটা। হয় পাখিওয়ালা চেনে নি, নয়তো ইচ্ছে করে ভাল জাতের পাখি বলে সুখীকে ঠকিয়ে দিয়ে গেছে।

কেবল কি এই!

ডাক্তার আরও বলে গেছে, যদি সুখীর পাখি পোষার শখ থাকে তো আবার যেদিন টিয়াটুলির জঙ্গলে বন্ধুর ডেরায় সে বেড়াতে আসবে, সুখীর জন্য একটা ময়না, টিয়া, চন্দনা বা ঐ জাতের ভাল পাখির ছানা নিয়ে আসবে।

সঙ্গোপনে বলার মতন কথা, নিবিড় করে বলার মতন বিষয় সন্দেহ কি। তখন ব্রততী সামনে ছিল কি না, সীতাংশু জানে না। সেই সম্পর্কে মাধব কিছু বলল না। কাল রাত্রে এখান থেকে ঘরে ফিরে গিয়ে দিদি তাকে পাখির কথাটা বলছিল। পাখিটা তার পছন্দ হচ্ছে না, ডাক্তারবাবু আর একটা ভাল পাখি নিয়ে আসবে।

হয়তো মাধবও কথাটা ভুলে থাকত। একটা পাখি একজনের ভাল লাগতে পারে, না-ও পারে। যেমন কালাকেও মাধবের ভাল লাগে নি। কিন্তু কালাকে জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে এসে দিদির হাতের মার খেয়েই যেন মাধব পাখির কথাটা মনে রেখেছিল। উদের বাচ্চা ধরতে গিয়ে সীতাংশুর কানে কথাটা না তুলে সে পারল না, যেন মাধবের গলায় একটা অভিযোগের সুর ছিল। শুনে সীতাংশু

বেতঝোপের ভেতর দাঁড়িয়ে শব্দ করে হেসেছিল এবং মাধবকে বুঝিয়েছিল, তা পাখিটাকে ভাল না লাগলেও তার দিদি ওটাকে বনে ছেড়ে দিয়ে আসত না, তখন নিজের মুখে সুখী বলেছিল, মাধবের নিশ্চয় মনে আছে। কালাকে সে ঢিবির গর্তে রেখে এসেছে বলে না তার দিদির রাগ দুঃখ।

শুনে মাধব চুপ করে ছিল।

হয়তো তারপর কথাটা আর সে মনে রাখে নি। সীতাংশুও ভুলে গিয়েছিল। উদের চিন্তা ছাড়া দুজনের মাথায় তখন আর কিছু ছিল না যে।

এখন ঘরে এসে খাঁচাটা দেখে সীতাংশুর মনে পড়ল। তা-ও যেন মনে পড়ত না। পাখি ঘরেই আছে, ভাল না লাগলেও বনে ছেড়ে দিয়ে আসে নি সুখী। কেবল রাত্রে শোবার সময় নিজের কাছে না রেখে সীতাংশুর ঘরে ওটাকে রেখে গেছে এই যা।

কিন্তু রাণীরবাগের ডাক্তার? তার মুখটা মনে পড়ছে কেন। ডাক্তারগিন্নীকেও বড় বেশি মনে পড়ছে। এই জন্যই কি সীতাংশু বিব্রতবোধ করছিল। বেড়ার গায়ের স্থির বিন্দুটার ওপর চোখ রেখে সে গাঢ় নিশ্বাস ফেলল। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে হঠাৎ নিজের মনে হাসল। দেশলাইয়ের কাঠিটা যেমন ফস্ করে জ্বলে উঠল, তেমনি, তখন বেতঝোপের পাশে ঢিবির ওপর বসে সূর্যাস্তের লাল রং ছিটানো বাঁশের সাঁকোটা দেখতে দেখতে সুখী যত কথা বলেছিল, তার একটা কথা তার চোখের সামনে জ্বলে উঠল।

'এই সাঁকোর ওপর দিয়ে ডাক্তারবাবু বৌকে নিয়ে রাণীরবাগ ফিরে গেছে।'

'হুঁ, তাই তো।' চমকে উঠেছিল সীতাংশু কথাটা শুনে। সুখীর চোখের দিকে তাকিয়েছিল। সেই চোখের ভেতর কিছু খুঁজেছিল কি সে? মনে নেই, কিছু মনে করতে পারল না সে এখন, কিন্তু হেসেছিল। হেসে মাথা নেড়ে বলেছিল, 'রাণীরবাগ যাবার শর্টকাট

রাস্তা এটা, এখান দিয়ে তাড়াতাড়ি পৌঁছান যায়, অন্য রাস্তাও আছে, ঘুরে যেতে হয়, অনেক সময় নেয়, অবশ্য বড় সড়ক সেটা—ট্রাক, লরী চলে।' একটু থেমে থেকে সীতাংশু আবার বলেছিল, 'এই রাস্তা ধরেই তো ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে তুমি পিয়ালিছড়ার মেলায় যেতে, রাণীরবাগও গিয়েছিলে, তাই না? হেঁটে সাঁকো পার হয়েছিলে।'

সুখী কথা না বলে মাথা নেড়েছিল। কিন্তু তবু এমন স্থির বিহ্বল চোখে সাঁকোটা দেখছিল, যেন জীবনে আর কোনোদিন সে এই জিনিস দেখে নি, এই প্রথম দেখছে, নতুন দেখছে।

ঠিক এমন সময় বুঝি মাধব দূরের একটা গাছ তাক করে ঢিল ছুঁড়েছিল। পাতার অস্পষ্ট শব্দ হয়েছিল।

আর সীতাংশু দেখছিল, সুখী তখনও চুপ করে আছে, চুপ করে কিছু ভাবছে। সীতাংশু অস্বস্তিবোধ করছিল। 'হঠাৎ এত ভাবনা উপস্থিত হলো কেন তোমার, না কি ছেলেবেলার কথা সাঁকোটার গায়ে লেখা আছে।' যুবতীর হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে প্রশ্ন করতে ইচ্ছা হয়েছিল তার। কিন্তু তা সে করে নি, একটু জোরে শব্দ করে কেশেছিল। তাতে কাজ হয়েছিল। সুখী এদিকে ঘাড় ফিরিয়েছিল।

'আমি ভাবছি—' যেন ভাবনাটা সীতাংশুকে না শুনিয়ে মাধবের দিদি শান্তি পাচ্ছিল না। 'আমি চিন্তা করছি, ডাক্তারবাবুর গিন্নী সাঁকোটা পার হবার সময় না জানি কত ভয় পেয়েছিল।'

'নিশ্চয়ই পেয়েছিল।' যেন চোখ বুজে পড়া মুখস্থ বলেছিল সীতাংশু। 'সাঁকোর নিচে পাতালের অন্ধকার, যদি ভদ্রমহিলার মনে পাপ থেকে থাকে তো সাঁকো পার হবার সময় ভয়ে তিনি কাঠ হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর হৃৎপিণ্ড হিম হয়ে গিয়েছিল।'

আকাশ ও চতুর্দিকের বনভূমি তখন কালো হয়ে গিয়েছিল। পশ্চিমের লাল আলোটা কখন জানি নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গিয়েছিল। কিন্তু সেই অস্পষ্ট আলোয়, সীতাংশু লক্ষ্য করল, সুখীর মুখটা হঠাৎ

কেমন ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছে। খুব অল্প সময়ের জন্য যদিও। তা হলেও সীতাংশুর চোখে তা এড়াল না। হতে পারে, তখন সে চিন্তা করল, এই মাত্র সাঁকো থেকে নেমে এসে সুখী বলেছিল সাঁকোর ওপর তার খুব ভয় করছিল, আর সেই ভয়ের কথাটাই ব্রততীকে দিয়ে আবার কি না তাকে শুনিয়ে দিল সীতাংশু। তা না হয় শোনাল, কিন্তু পাপের কথাটা সে উল্লেখ করতে গেল কেন। এই জন্য সীতাংশুর অনুতাপও কম হলো না।

তাই কতকটা নিজের দোষ স্খালনের জন্য, অথবা মাধবের দিদি প্রফুল্ল হয়ে উঠুক, তার মুখের স্বাভাবিক রং ফিরে আসুক—ভেতরে ভেতরে এমন একটা ইচ্ছা নিয়ে সীতাংশু তৎক্ষণাৎ হেসে উঠেছিল।

'আসলে এটা হলো গিয়ে বাঘ-নেই-বনে বাঘের ভয় পাওয়ার মতন। আমি কোনো পাপ কাজ করলাম না, অথচ পাপের ভয়ে মরে যাচ্ছি—মনের দুর্বলতা ছাড়া আর কী বলা যায় একে। আমি নিষ্পাপ, আমি পবিত্র—এই মন নিয়ে এই সাহস নিয়ে ডাক্তারগিন্নী যদি সাঁকো পার হয়ে থাকে তো নিশ্চয়ই সে ভয় পায় নি, বরং যতক্ষণ সাঁকোর ওপর ছিল, তার ভালই লেগেছিল, চারদিকের গাছপালা আকাশ মাটির দৃশ্যটা উপভোগ করেছিল, হয়তো সাঁকোর কিনারে ঝুঁকে খাতের ভেতরের চমৎকার অন্ধকার ছবিটা দেখার লোভ তার হয়েছিল এবং দেখেওছিল।'

ব্রততীকে দিয়েই কথাটা বুঝিয়েছিল সীতাংশু। শুনে সুখীর মন হাল্কা হয়েছিল কি-না বোঝা যায় নি। কেননা তার পরও কিছুক্ষণ চুপ থেকে সাঁকোটার দিকেই তাকিয়ে ছিল সে। মাধব আর একটা ঢিল ছুঁড়েছিল তখন।

তারপর তিনজন ঢিবি ছেড়ে উঠে আসে। সারা আকাশে যুঁই ফুলের মতন তারা ফুটে উঠেছিল। সাঁকোটা পিছনে রেখে তিনজন টিয়াটুলির রাস্তা ধরল। রাস্তায় কেউ বড় একটা কথা বলে নি।

একটা একটা করে সব এখন মনে পড়ছিল সীতাংশুর।

বাতির সলতেটা দপদপ করছিল। হয়তো তেল ফুরিয়ে এসেছে, খানিকটা তেল ভরে নিল সে। আলো আবার উজ্জ্বল হলো স্থির হলো।

না, নতুন করে আর নারীর দিকে চোখ ফেরাতে তার ইচ্ছা করল না। পাখার পটপট শব্দ শোনা গেল। বোঝা গেল পাখিটা ছটফট করছে। সম্ভবত সুখীকে দেখছে না বলে।

যদি এ জিনিস কাল হতো, খাঁচা খুলে পাখিটাকে ভেতর থেকে টেনে এনে সীতাংশু বুকের কাছে নিয়ে আদর করত চুমু খেত। অর্থাৎ মাধবের দিদি সারা দিন যেভাবে ওকে আদর করে গেছে, সীতাংশু এখন তাই করত।

কিন্তু আর যেন আদর দেখিয়ে ওইটুকুন বাচ্চা পাখির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে তার ইচ্ছা হলো না। যার পাখি সে যদি অন্তর থেকে ওকে ভাল না বাসল, সঙ্গে করে বাড়ি বয়ে নিয়ে যাবার অসুবিধা ভেবে এখানে ওকে ফেলে রেখে গেল, তো সীতাংশু এখন কোলে নিয়ে আদর করলেই কি পাখির বুকের যন্ত্রণা কমবে, মোটেই না। একজনের ভালবাসার ক্ষতিপূরণ আর একজনকে দিয়ে হয় না। বনের পশু-পাখিরাও এ জিনিস বোঝে।

খাঁচার দিকে সম্পূর্ণ পিছন ফিরে সে আস্তে আস্তে দরজার কাছে সরে গেল। ঠাণ্ডার জন্য কপাট ভেজিয়ে রেখেছিল। একটা কপাট টেনে খুলে ধরতে কনকনে হাওয়ার সুঁচ এসে চোখে-মুখে বিঁধল। তাড়াতাড়ি আবার সেটা বন্ধ করে দিয়ে ঘরের মাঝখানে ফিরে এল সে।

বস্তুত এই মুহূর্তে কী করা যায় সীতাংশু ভেবে ঠিক করতে পারছিল না। সিগারেট খেতেও আর ইচ্ছা করছে না। মুখের ভেতরটা কেমন বিস্বাদ ঠেকছিল। এখন শুয়ে পড়লেও যে চোখে ঘুম আসবে তাতে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। বিছানায় শুয়ে ছটফট করা কোনোদিনই সে পছন্দ করত না। তবু তার চেয়ে জেগে বসে থাকা

ঢের ভাল। তার মধ্যে একটা সান্ত্বনা আছে বলে সীতাংশুর বিশ্বাস। কাজেই চেয়ারটা টেনে সে বসে পড়ল।

বলতে কি, তার যেন তখনই জানতে ইচ্ছা করছিল রাণীরবাগের ডাক্তার কবে থেকে আবার পাখিবিশারদ হয়ে গেল। যেন এই মুহূর্তে ডাক্তারকে পেলে কথাটা সে জিজ্ঞেস করে।

এবং এ-ও সে চিন্তা করল, সত্যি রণধীর মাধবের দিদির জন্য একটা পাখি নিয়ে উপস্থিত হবে কি না। সেদিন কি ডাক্তার একলা আসবে, না কি ব্রততীও সঙ্গে আসবে। নিশ্চয় আবার একটা খাঁচার মধ্যে পুরে পাখিটাকে এখানে আনতে হবে। ডাক্তার মোটরবাইক চালিয়ে আসছে। গাড়ির পিছনে ব্রততী বসে আছে। ব্রততীর চুল উড়ছে আঁচল উড়ছে। কিন্তু হাত দিয়ে সেসব সামলাবার উপায় নেই। কেননা পাখির খাঁচাটা কোলের ওপর রেখে দু'হাতে সাবধানে সেটা চেপে ধরেছে। তা না হলে মোটরবাইক যখন ঝাঁকুনি দিয়ে ছুটবে, খাঁচাটা কোল থেকে ছিটকে পড়ে যেতে পারে।

চেয়ারের পিঠে মাথা রেখে চোখ দুটো মুদ্রিত করে সীতাংশু সেই চমৎকার ছবিটা কল্পনা করল। সুখীর জন্য খাঁচায় করে একটা পাখি বয়ে আনছে রাণীরবাগের মাজাঘষা গিন্নী।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই সীতাংশু সকলের আগে লোক পাঠিয়ে পীতাম্বরের খবর নিল। মোটামুটি ভাল আছে সে। রাত্রে ঘুমিয়েছিল। পীতাম্বরকে ফলটল কিনে দেবার জন্য লোক মারফৎ তার বৌয়ের কাছে ক'টা টাকা পাঠিয়ে দিয়ে সীতাংশু অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পারল।

বেলা দশটা সাড়ে-দশটা পর্যন্ত করাতঘরে ঘুরে করাতীদের কাজ দেখল সে, মিস্ত্রীদের কাজ দেখল, জঙ্গলের দিকেও একবার যেতে হলো তাকে। গাছ কাটা হচ্ছিল। কুড়ালের ঘা লেগে শাল-সেগুন থরথর করে কাঁপছিল। ঠিক এই সময়টায় সীতাংশু চিবুক তুলে গাছের

বিস্তৃত শাখা-প্রশাখা ও পাতার দিকে চোখ দুটো ধরে রাখে। যেন প্রকাণ্ড গাছটার সমস্ত আকুতি-মিনতি বেদনা ও শিহরণ ওদিকে তাকালে সহজেই তার চোখে ধরা পড়ে। তাই তো গাছতলায় দাঁড়িয়ে তখন সে চিন্তা করে কত দীর্ঘদিনের আলো বাতাস রৌদ্র শিশির বর্ষার জল মাথায় নিয়ে একটা গাছ বড় হয়, বনস্পতি আখ্যা পায়। আর মানুষ কত সহজে কুড়াল চালিয়ে একে ভূতলশায়ী করে। সবটা গুঁড়ি কাটা হয়ে যাবার পর গাছটা যখন শব্দ করে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ে সীতাংশুর তখন মনে হয়, গাছটা তো লুটিয়ে পড়ল না, দীর্ঘদিনের সঞ্চিত সাধ স্বপ্ন আশা ও বিশ্বাসের মূলোচ্ছেদ করা হলো। বেশি সময় দাঁড়িয়ে সীতাংশু এ জিনিস দেখতে পারে না, কেমন কষ্ট হয় তার। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসে।

আজ জনার্দনকে দেখে তার কিন্তু খুবই হাসি পেয়েছিল। কুড়ালের একটা কোপ বসিয়ে পাঁচবার সে ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছনে তাকিয়েছে, মানুষ গরু ছাগল এমন কি শালিক চড়ুইটিকেও দেখতে পেলে যতক্ষণ না সেটি দূরে সরে যাচ্ছে হাতের কুড়াল তুলে দ্বিতীয় আর একটি গাছ হয়ে চুপটি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তারপর আবার কোপ বসিয়েছে, এবং কোপ বসিয়েই চোখ তুলে আবার চারদিকে তাকিয়েছে। আজ কিন্তু কুয়াশা ছিল না। পরিষ্কার রৌদ্র নিয়ে বনের ভেতর ঝলমল করছিল। তা হলেও জনার্দনের সতর্কতার শেষ ছিল না। আগের দিন পীতাম্বর তার কাটা গাছের নিচে চাপা পড়েছিল। এই জন্য জনার্দন আজ অত্যধিক ভয়ে ভয়ে গাছ কাটছিল। তার চেহারাটা সত্যি দেখবার মতন ছিল তখন। একটু সময় দাঁড়িয়ে দেখে সীতাংশু সেখান থেকে সরে এসেছে।

মাধব সেই ভোর থেকে তার পিছনে ঘুর ঘুর করছিল। হয়তো রাত্রে ছেলেটা ভাল করে ঘুমোতে পারে নি। আজ আবার কখন নালার ধারে বেতঝোপে ঢুকে উদের বাচ্চা ধরতে যাবে সেই চিন্তা তাকে অস্থির করে তুলেছে। একটু আগে সীতাংশুর বড় কাটারিটা

ঘর থেকে বের করে নিয়ে আমলকীতলায় বসে একটা পাথরের ওপর ঘষে ঘষে আচ্ছা করে শাণ দিচ্ছে। আজ আর বেতকাঁটা তার পথরোধ করতে পারবে না, কাটারি দিয়ে কেটে সব সাফ করে দেবে—কিশোরের চোখে-মুখে একটা দৃঢ় সংকল্প একটা প্রত্যয় ঝিলিক দিয়ে উঠতে দেখেছে সীতাংশু, রোদ লেগে তার হাতের কাটারিটাও বুঝি এত ঝকঝক করছিল না।

হুঁ, তারপর থেকে সে সীতাংশুর পিছনে ঘুরছে। বাঁশের মাথায় কেরোসিন মাখান ন্যাকড়া জড়িয়ে একটা মশালও তৈার করে ফেলেছে। সময়মতন ওটা জ্বালান হবে।

'কখন রওনা হব আমরা?'

'এই তো খাওয়াদাওয়ার পর।'

'বেশি দেরি করলে ওদিকে আবার অন্ধকার হয়ে যাবে।' অধৈর্য হয়ে মাধব বলে ফেলেছিল।

সীতাংশু তার চোখে চোখ রেখে হেসেছিল।

'হুঁ, তা বটে, শীতের বেলা। দেখি রান্নাবান্নার কদ্দূর হলো।'

ঘরে ঢুকে সীতাংশু বড় সুন্দর একটা দৃশ্য দেখল। যেন রান্না করতে করতে মাঝখানে উঠে এসেছে মাধবের দিদি। উনুনের আঁচ লেগে রাঙা টুকটুকে হয়ে অছে মুখখানা। কাঁধের আঁচল কোমরে জড়ান। খোঁপার আধখানা ঘাড়ের ওপর ভেঙে পড়েছে; কপালটা ঈষৎ ঘেমে উঠে চকচক করছে। দরজার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছিল যুবতী। বুকের কাছে পাখিটাকে নিয়ে আদর করছে। খাঁচাটা পায়ের কাছে খোলা অবস্থায় পড়ে আছে। বোঝা গেল এই মাত্র পাখিটাকে বের করে আনা হয়েছে। বুকের কাছে মুখ নুইয়ে পাখির ঠোঁটে চুমু খাচ্ছিল বলে সীতাংশু মাধবের দিদির কপাল ও মাথার পিছন এক সঙ্গে দেখতে পেল। কপালের ঘাম ও ভাঙা খোঁপা একই সময়ে তার চোখে পড়ল। কিন্তু কথা সেটা নয়।

সীতাংশু অবাক হলো অন্য জিনিস দেখে।

সুখীর চোখের কোণায় জলের ফোঁটা। আর কেমন একটা আবেগ নিয়ে পাখিটাকে বার বার চুমু খাচ্ছে। তার শ্বাস-প্রশ্বাস যে কত দ্রুত বইছিল বুকের ওঠানামা দেখে সীতাংশু বুঝতে পারল।

চমৎকার একটা ছবি। তাকিয়ে দেখার মতন দৃশ্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সীতাংশুর হৃৎপিণ্ড মোচড় দিয়ে উঠল। এটা সত্য, পাখিটাকে বুকে নিয়ে এমন মত্ত হয়ে উঠেছিল যুবতী—সীতাংশুর পায়ের শব্দ সে শুনল না। এই জন্য সীতাংশু পুরো একটা মিনিট দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছিল। হুঁ, তার হৃৎপিণ্ডে মোচড় লাগল এই ভেবে, হয়তো শেষবারের মতন আদর করে চুমুটুমু খেয়ে মাধবের দিদি পাখিটাকে এখন জঙ্গলে উড়িয়ে দেবে। আর খামকা খাঁচায় পুরে রাখবে না। ভাল করে এখনও পোষ মানে নি, একবার উড়ে গেলে এই পাখি আর ফিরে আসবে না। তাই চাইছে সুখী। রাণীরবাগের ডাক্তারবাবু নতুন পাখি নিয়ে আসছে, ভাল পাখি।

কিন্তু চোখে জল?

তবে কি সবটাই ছলনা নয়, মায়াকান্না নয়। হতে পারে। সীতাংশু একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল। ক'দিন নিজের হাতে সেবাযত্ন করেছে, বুকে নিয়ে আদর করেছে। একটু কষ্ট তো লাগবেই ছেড়ে দিতে। মানুষটির বুকের ভেতরটা একেবারে মরুভূমি হয়ে যায় নি। মুখে যা-ই বলুক, ভালবাসার ফল্গু এখনও ঝিরঝির করে বইছে।

তা হলেও, আদরটা যেন একটু বাড়াবাড়ি মনে হলো।

সীতাংশু আর চুপ থাকতে পারল না। ইচ্ছা করে গলা ঝেড়ে কেশে শব্দ করল।

সুখী চোখ তুলে প্রথম একটু থতমত খেল, তারপর সামলে নিয়ে হাসল।

চোখে জল মুখে হাসি। এ-ও এক ছবি।

'খুব আদর খাওয়ান হচ্ছে ছোট্ট পাখিকে?' সীতাংশুও হাসল।

'জানেন কাল সারারাত আমার কী কান্না পাচ্ছিল।' গালের কাছে পাখির ঠোঁট ঠেকিয়ে সুখী ঈষৎ বেঁকে দাঁড়াল।

'কেন, কান্না কেন।' একটু অবাক হবার ভান করে সীতাংশু বলল, 'পাখি তো এখানেই ছিল। খাঁচার ভেতর দিব্যি ঘুমোচ্ছিল।' ছটফট করছিল কথাটা সে আর বলল না।

'কি জানি, সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে যাই নি বলে হয়তো এত কষ্ট পেয়েছি। শোবার সময় বুকটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছিল।'

'পরশু রাত্রেও খাঁচাটা রেখে গিয়েছিলে।' সীতাংশু মনে করিয়ে দিল।

'পরশু ইচ্ছে করে রেখে গেছি, কাল ভুলে গিয়েছিলাম।'

'আজ নিয়ে যেও, আজ আবার ভুল করে ফেলে যেও না।' পরশু যদি সীতাংশুর মনের দিকে তাকিয়ে খাঁচা রেখে গিয়েছিল, কাল ভুল করল কেন? অপলক চোখে সীতাংশু মাধবের দিদির মুখ দেখল, যেন মুখের রং পরীক্ষা করল।

'না, না, আর ভুল করব না, আর কখনো ভুল করি! তার জন্য সারারাত শাস্তিও পেয়েছি খুব। আমার মণি, আমার ছোট্ট পাখি।' টুকটুকে লাল ঠোঁট পাখির ঠোঁটে ঠেকিয়ে মাধবের দিদির কেমন দিশেহারা হয়ে যাবার মতন অবস্থা।

মাধব ধারেকাছে নেই। যেন তখনও আমলকীতলায় বসে কাটারি শাণ দিচ্ছিল। সীতাংশু চোখ ঘুরিয়ে পিছনটা দেখল।

কতকটা নিশ্চিন্ত হলো সে। রাগ করে মাধব কাল বেতঝোপে দাঁড়িয়ে দিদির নামে মিছে কথা বলছিল বোঝা গেল। অথবা আগের দিন রাত্রে নিশ্চয় ভাইয়ের মন পরীক্ষা করেছে সুখী। এটা ভাল পাখি নয়। খাঁচা খুলে বনে উড়িয়ে দেবে। কালাকে যদি মাধবের ভাল না লাগে, একশবার জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে আসার কথা বলে, তো খাঁচা খুলে পাখিটাকেই বা তার দিদির ছেড়ে দিতে দোষ কি।

'পীতাম্বর এখন সেরে উঠবে, আর ভয় নেই।' হাল্কা গলায়

সীতাংশু বলল, 'তার বাড়িতে লোক পাঠিয়েছিলাম। একটু আগে খবর নিয়ে এসেছে।'

'খুব ভাল।' আনন্দে যুবতীর চোখ ঝলমল করে উঠল। 'ঐ মানুষটার জন্যেও রাত্রে আমার দুশ্চিন্তার শেষ ছিল না, কতবার যে মনে মনে ঈশ্বরকে ডেকেছি।'

'তাই।' সীতাংশু ঘাড় নাড়ল। 'একটা ভয়ংকর দুশ্চিন্তার হাত থেকে এবারের মতন রেহাই পেলাম।' একটু থেমে থেকে আবার বলল, 'আজ আমরা নালার ধারে যাচ্ছি।'

সুখী হাসল।

'হুঁ, উদ্যোগ-আয়োজন দেখে বুঝতে পারছি, সকাল থেকে ভাইটি আমার কাটারি শাণ দিচ্ছে; মশাল তৈরি করছে।'

সীতাংশু হাসল।

'মনে হয় ছোঁড়া সারারাত কেবল উদের বাচ্চার স্বপ্ন দেখেছে।'

এ কথার পর দু'জন বুঝি এক সঙ্গে শব্দ করে হেসে উঠত, থমকে গেল। দরজায় জুতোর শব্দ হলো, একটি মানুষের ছায়া পড়ল। সেদিকে চোখ পড়তে দু'জন স্তম্ভিত হয়ে গেল।

সুখী তাড়াতাড়ি ইজিচেয়ারটা টেনে এনে বিছিয়ে দিল।

'তুমি বসো, তুমি বসে পড় রণধীর।' সীতাংশু হাত ধরে ডাক্তারকে বসিয়ে দিল। 'তুমি কি অসুস্থ, তোমার চেহারা এত খারাপ হয়েছে কেন!' বন্ধুর মুখের সামনে ঝুঁকে দাঁড়াল সীতাংশু।

রণধীর কথা বলছিল না। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে সে ধুঁকছিল। যেন ভেতরে ঢুকে বসতে পেরে একটু স্বস্তি পেল, আরাম বোধ করল।

সীতাংশু আর একবার বাইরে চোখ ফেরাল। 'কই, তোমার গাড়ি কোথায়, তোমার লাল মোটরবাইকটা তো দেখছি না!'

মাথাটা মাটির দিকে নামিয়ে দু হাতে চোখ ঢাকল রণধীর।

'তা হলে তুমি এতটা পথ হেঁটে এসেছ!'

সীতাংশু ঘাড় ঘুরিয়ে বন্ধুকে দেখল। মাথার চুল উস্কখুস্ক, পোষাকটা মলিন হয়ে গেছে, জুতোয় ধুলো লেগে আছে, মোজায় শুকনো কাদার দাগও দেখা যাচ্ছে। এই জন্যও সীতাংশু কম বিস্মিত হলো না। পোষাক-পরিচ্ছদে যে মানুষ সর্বদা নিখুঁত পরিপাটি থাকে, মাথার একটি চুল এদিক থেকে ওদিকে যে নড়তে দেয় না।

ব্যাপার কি! সীতাংশু ঢোক গিলল।

'একটু চা খাবে রণধীর?'

'বরং একটু গরম দুধ এনে দিই ডাক্তারবাবুকে।' সুখী এই প্রথম কথা বলল। 'খুব পরিশ্রম করে এসেছেন যেন।'

'তাই তো দেখছি।' বিড়বিড় করে সীতাংশু বন্ধুর কাঁধে হাত রেখে আস্তে ঝাঁকুনি দিল। 'রণধীর, কথা বলছ না কেন।'

রণধীর মুখ তুলল না। তাকাল না। চোখ থেকে হাতটা সরিয়ে নিল শুধু। তেমনি ঘাড় গুঁজে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'বরং চা করেই নিয়ে এসো।' সীতাংশু সুখীর দিকে তাকাল। 'একটু গরম চা খেয়ে নিক, তারপর কথা বলবে।'

সুখী চা তৈরি করতে রান্নাঘরের দিকে ছুটে গেল। তা ছাড়া তার রান্নারও কিছু বাকি পড়ে আছে। রান্না ফেলে রেখে এসে পাখিকে আদর করছিল, তারপর সীতাংশুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে ওদিকে দেরি করে ফেলেছে।

কিন্তু সীতাংশু যেন অন্য কারণে মাধবের দিদিকে সরিয়ে দিল। ডাক্তার যে চা খাবে তার স্থিরতা ছিল না। কিন্তু তা হলেও, বলা যায় কি, হয়তো মেয়েটি সামনে আছে বলে ডাক্তার কিছু বলতে পারছে না। বা বলতে চাইছে না।

'এই, রণধীর, কী হয়েছে শুনি?' আর কোনোরকম দ্বিধা বা সঙ্কোচ করার কারণ দেখল না সীতাংশু, গলার স্বরটাও একটু রুক্ষ

করে তুলল। 'তুই কি রাণীরবাগ থেকে সোজা এখানে চলে এসেছিস, না অন্য কোথাও গিয়েছিলি? খুব টায়ার্ড দেখাচ্ছে তোকে, মাথা ধরেছে?'

এবার ডাক্তার মুখ তুলল। ফ্যালফ্যাল করে সীতাংশুকে দেখল। সীতাংশু অস্বস্তি বোধ করল। অন্যদিকে চোখ সরিয়ে নিল। রণধীরের তাকানোর মধ্যে একটু যেন অস্বাভাবিকতার গন্ধ খুঁজে পেল সে।

'ব্রততী কেমন আছে?' সীতাংশু হঠাৎ প্রশ্ন না করে পারল না। প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ চোখে ডাক্তারের মুখ দেখল। চোখ দেখল। ডাক্তার তৎক্ষণাৎ যেমন আগে ছিল মাথাটা হেঁট করে রইল। মাটি দেখতে লাগল।

সীতাংশু ভুরু কুঁচকাল। দরজাটা একবার দেখল। তারপর আগের চেয়েও একটু বেশি ঝুঁকে দাঁড়িয়ে প্রায় রণধীরের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে উঠল, 'তুই নাকি ওকে একটা নতুন পাখি এনে দিবি বলে গেছিস? ওর এই পাখিটা ভাল না?'

রণধীর ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সুখী খাঁচাসুদ্ধ পাখিটাকে বেড়ার গায়ে ঝুলিয়ে রেখেছিল। সীতাংশু আঙুল দিয়ে দেখাল। রণধীর চোখ তুলে খাঁচাটা দেখল, চুপ করে রইল।

'আমি কাল শুনলাম।' সীতাংশু আস্তে বলল।

'বলেছিলাম কি? হয়তো বলেছিলাম।' সীতাংশুর চোখের দিকে চোখ রেখে ডাক্তার একটা চাপা নিশ্বাস ফেলল। মুখ থেকে তার এই প্রথম কথা বেরোল। 'এখন আর তেমন কিছু ভাল মনে করতে পারছি না।'

'কেন, কী হয়েছে তোর? গাড়ি ছাড়া হঠাৎ অসময়ে এভাবে চলে এসেছিস কেন, এত খারাপ লাগছে কেন চেহারা? ব্রততী সুস্থ আছে?' সীতাংশু নতুন করে বন্ধুর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল।

রণধীর একটু সময় দরজার বাইরে চোখ রেখে চুপ করে রইল।

আর একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল। তারপর সীতাংশুর চোখে চোখ রাখল।

'কি হলো, কথা বল!' সীতাংশু তার কাঁধে ঝাঁকুনি দিল।

'ও নেই। অনেক চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু বাঁচাতে পারলাম না। দুটো কলারবোন ভেঙে গিয়েছিল। মাথায়ও শক্ত চোট লেগেছিল।'

'কি করে এমন হলো!' কথাটা সীতাংশু বলল বটে, কিন্তু তার মুখ দিয়ে একটা হিসহিস শব্দ ছাড়া কিছুই প্রায় বেরোল না। শ্বাস বন্ধ করে রণধীরের মুখটা দেখতে লাগল।

সুখী চা নিয়ে এল। একটা টিপয় টেনে এনে কাপ দুটো বসিয়ে দিল।

'সিগারেট দে, তোর কাছে সিগারেট আছে?' রণধীর হাত বাড়াল। সীতাংশু তার হাতে সিগারেট ও দেশলাই তুলে দিল।

'তোমার রান্না হয়েছে?' সীতাংশু সুখীর দিকে চোখ তুলল।

'সামান্য একটু বাকি আছে।' চা দিয়ে সুখী দরজার পাশে সরে গিয়েছিল। আবার এক পা এদিকে সরে এল।

সীতাংশু আর তার দিকে তাকাল না। আস্তে আস্তে বলল, 'তা হলে বাকি রান্নাটুকু সেরে ফেল, ডাক্তারবাবু এখানে খাবেন।'

সুখী আর দাঁড়াল না। ঘাড় কাত করে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। যেন এবার সে বুঝতে পারল তার সামনে বাবুরা কিছু বলতে চাইছেন না তাই কি? সীতাংশু এই নিয়ে অবশ্য মাথা ঘামাল না। তৎক্ষণাৎ রণধীরের দিকে চোখ ফেরাল। রণধীর সিগারেট ধরিয়ে চায়ে চুমুক দিয়েছে। সীতাংশু কিছু প্রশ্ন করার আগেই অবশ্য সে চোখ তুলল।

'পিয়ালীছড়ার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। কিন্তু আর সেন্স ফিরে আসে নি। আধ ঘণ্টার মধ্যে এক্সপায়ার করল। হুঁ, হসপিটালে নিয়ে যাবার পর ঠিক উনত্রিশ মিনিট ছিল—'

'কিন্তু কি করে এমন হলো!' সীতাংশু এবার স্পষ্ট গলায় প্রশ্ন

করল। 'আঘাত পেয়েছিল? কোথায়? ওকে মোটরবাইকে তুলে নিয়ে রাস্তায় কোথাও তুই অ্যাকসিডেন্ট বাধিয়েছিলি না তো?'

রণধীর নিঃশব্দে মাথা নাড়ল।

'তবে কী হয়েছিল? বলছিস মাথায় চোট লেগেছিল, কলারবোন ভেঙে গিয়েছিল—' সীতাংশু হঠাৎ থেমে গেল। যেন আর এসব বলে কাজ নেই এমন ভঙ্গিতে ডান হাতটা নেড়ে রণধীরই সীতাংশুকে থামিয়ে দিল। কিন্তু তারপর রণধীরও চুপ। জোরে জোরে সিগারেট ফুঁকল এবং নিঃশব্দে পেয়ালার বাকি চাটুকু শেষ করল। সীতাংশুর চা যেমন ছিল পড়ে রইল। স্পর্শও করল না সে।

চা শেষ করে রণধীর জামার হাতা দিয়ে ঠোঁট মুছল। যেন তার পকেটে আজ রুমালটিও নেই, অথবা রুমাল দিয়ে মুখ মোছা সে ভুলে গেছে। সীতাংশুর চোখে জিনিসটা অদ্ভুত ঠেকল। তাড়াতাড়ি সে অন্যদিকে চোখ সরিয়ে নিল।

'তুই হঠাৎ আমার খাওয়ার কথা বললি কেন?' রণধীর বিড়বিড় করে উঠল। 'মেয়েটির কষ্ট হবে, নতুন করে রাঁধতে হবে।'

'আর রাঁধতে হবে না, যা রেঁধেছে তাতে তুজনের হয়ে যাবে।' পাখির খাঁচাটার দিকে চোখ রেখে সীতাংশু উত্তর করল। রণধীরের মুখের দিকে তাকাল না।

'নিয়তি অদৃষ্ট—এসব তুই বিশ্বাস করিস সীতাংশু?'

'করি বৈকি। সময় সময় বিশ্বাস করতে হয়।' ইজিচেয়ারে পিঠ এলিয়ে দিয়ে রণধীর শুয়ে পড়েছিল। তুদিন দাড়ি কামাচ্ছে না বলে তার মুখটা কত নোংরা দেখাচ্ছে। দৃষ্টি আড় করে সীতাংশু বুঝি তাই লক্ষ্য করছিল, রণধীরের চোখের সঙ্গে চোখ আটকে গেল। অগত্যা ভাল করে ডাক্তারের দিকে তাকে তাকাতে হলো। 'কেন, হঠাৎ নিয়তির কথা যে!'

সরাসরি একথার জবাব দিল না রণধীর। ঘরের চালের দিকে চোখ তুটো তুলে দিয়ে অল্প হাসল, যেন নিজের মনে হাসল, একটা

লম্বা নিশ্বাস ফেলল সেই সঙ্গে। একজন বড় দার্শনিকের মতন দেখাচ্ছিল তাকে হঠাৎ। যেন কেমন করে সে হাসল, নিশ্বাস ফেলল।

সীতাংশুর অস্বস্তি লাগল।

'ব্রততীর অকালমৃত্যু নিয়ে তুই এসব বলছিস নিশ্চয় ?'

'হ্যাঁ, তাই, শোন।' রণধীর সোজা হয়ে বসল। 'ঘটনাটা যে শুনবে সে তাই বলবে, যারা শুনেছে তারা তাই বলছিল। একশ বছরের পরমায়ু নিয়ে ব্রততী এই পৃথিবীতে এসেছিল, তারপর তার নিয়তি তাকে এখান থেকে তুলে নিয়ে গেল।'

সীতাংশু কথা বলল না।

'আমি ডাক্তার, বিজ্ঞানের ছাত্র', রণধীর বলল, 'নিয়তি-টিয়তি আমি বিশ্বাস করব কেন। বলব, ব্রততীর অসতর্কতা তার ছেলেমানুষী তার এই শোচনীয় পরিণতি ডেকে নিয়ে এল। অথবা বলব, যেহেতু অত্যধিক রোমান্টিক মন নিয়ে সে সর্বদা বেঁচে থাকতে চেয়েছিল, শেষ পর্যন্ত তার মনের সেই রং সেই স্বপ্নই তাকে মৃত্যুর পথে টেনে নিয়ে গেছে।'

চোখ বড় করে সীতাংশু তাকিয়ে রইল। যেন শ্বাস ফেলতে ভুলে গেল সে।

রণধীর সময় দেখতে হাতের কব্জি তুলে চোখের সামনে ধরল। কিন্তু দেখা গেল সেখানে ঘড়ি নেই, ঘড়ি ফেলে এসেছে। নিজের এই ভুলের জন্য ডাক্তার অপ্রস্তুত হলো না বা সীতাংশুকেও কিছু বলল না। একটা ছোট নিশ্বাস ফেলে হাতটা নামিয়ে রাখল।

'দশটা বেজে গেছে।' সীতাংশু বিড়বিড় করে সময় বলে দিল।

'হুঁ, রোমান্টিক মন, ব্রততীকে আমার চেয়ে কে আর বেশি চিনেছিল।' রণধীর আবার বলল, 'তোর এখান থেকে পরশু রাত্রে যখন রওনা হলাম, এত বড় একটা তামাটে রঙের চাঁদ উঠল শেষটায়, মনে আছে নিশ্চয় ? একটু বেশি রাত করে ব্রততীকে নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লাম।'

'হুঁ, তারপর ?' সীতাংশু বলল, 'কুয়াশাও খুব পড়ছিল তখন।'

'তাই তো!' রণধীর চোখ বড় করে চিবুকটা ঈষৎ নাড়ল। 'এদিকে কুয়াশা ওদিকে চাঁদের আলো, তা বলে রাস্তায় চলতে কিন্তু আমাদের মোটেই কষ্ট হচ্ছিল না, কুয়াশাটা যেন দূরে দূরে ছিল, চাঁদের আলোয় দুধের রং ধরেছিল চারদিক।'

'তারপর ?' সীতাংশু ধৈর্য রাখতে পারছিল না। 'রাস্তার কোন্ খানাটায় অ্যাকসিডেন্ট বাধিয়েছিলি ?'

'শোন শোন, বলছি।' রণধীর আবার দার্শনিকের মতন হাসল। 'আমি অ্যাকসিডেন্ট করি নি। আমি ঠিকই বাইক চালিয়ে যেতে পেরেছিলাম। তারপর সাঁকোর কাছে গিয়ে বাইক থেকে নেমে পড়লাম, ব্রততীকে নামিয়ে দিলাম।'

'ওখানটা হেঁটে পার হওয়া ছাড়া উপায় নেই।'

'হেঁটে আমরা সাঁকোর ওপর উঠলাম। আমি গাড়ি নিয়ে পেছনে হাঁটছিলাম, ব্রততী আগে আগে হাঁটছিল। সাঁকোর ওপর উঠে দুজন দাঁড়ালাম।'

'কেন!' সীতাংশু ভুরু কুঁচকাল।

'ব্রততী আর হাঁটছিল না, কাজেই আমাকে দাঁড়াতে হলো। দৃশ্যটা সত্যি সুন্দর ছিল, গাছপালা দূরের বাড়িঘর কিছুই আর দেখা যাচ্ছিল না, আমাদের ডাইনে বাঁয়ে সামনে পেছনে, মনে হচ্ছিল, একটা দুধের সমুদ্র টলমল করছে, তামাটে রং কেটে গিয়ে একটা রূপোর ডেলা হয়ে চাঁদটা মাথার ওপর ঝুলছিল। আর আমাদের পায়ের তলায় সাঁকোর নিচের সেই দৃশ্য! মনে হচ্ছিল একটা ধোঁয়ার রঙের ধূসর নীল পর্দা পাতালের দিকে নেমে গেছে। কুয়াশা মেশানো খানিকটা খানিকটা জ্যোৎস্না কিছুদূর পর্যন্ত পৌঁছোতে পেরেছিল বলে খাদের ভেতরটা এমন চমৎকার দেখাচ্ছিল। এই জন্যই সাঁকোর নিচে অন্ধকার এত ভয়ঙ্কর লাগছিল না। বরং মিটমিট করে এখানে ওখানে জোনাকি উড়ছিল বলে অন্ধকারটাকে মনে হচ্ছিল সোনালি চুমকি

বসান একটা রহস্যের নীল পর্দা। যেন পর্দাটা সরিয়ে দিলে আমরা আরো কত কী দেখতে পেতাম।'

এক দমে কথাগুলি বলে রণধীর একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল। সীতাংশু মাথা নাড়ল।

'মনে হয় সেই রাত্রে সাঁকোর ওপর উঠে তুইও অতিমাত্রায় রোমান্টিক হয়ে উঠেছিলি।'

'তা একটু হয়েছিলাম', সীতাংশুর কুঁচকানো চোখের দিকে চেয়ে রণধীর ঘাড় নাড়ল। 'শীতের জ্যোৎস্না ও চাঁদের আলো আমার মনেও রং ধরিয়েছিল, কিন্তু কতটা ধরিয়েছিল, কতখানি রোমান্টিক হতে পারতাম আমি! ব্রততীর তুলনায় এই ব্যাপারে আমাকে শিশু বলতে পারিস। দৃশ্যটা আমার ভাল লেগেছিল—এই পর্যন্ত, কিন্তু ও কী করছিল, যেন পাগল হয়ে গেল সাঁকোর ওপর উঠে। বলছিল, এতকাল ভালবাসার সমুদ্রে আমরা সাঁতার কেটেছি, এখন মনে হচ্ছে ভালবাসার দ্বীপে পৌছে গেলাম দুজন।'

'তুলনাটা মন্দ দেয় নি, তারপর?' ভুরু দুটো তেমনি কুঁচকে রাখল সীতাংশু। 'এসব তোদের স্বামী-স্ত্রীর সেন্টিমেন্টের কথা, এসব আমায় শুনিয়ে কী হবে, আমি জিজ্ঞেস করছি তোকে—অ্যাকসিডেণ্ট কিভাবে হয়েছিল, কখন হলো?'

'আহা, শোন, সব বলব।'

রণধীর চোখ বুজে মাথা ঝাঁকাল। 'হুঁ, সেন্টিমেন্ট, তোকে শোনাব বলে বলছি না, বলছিলাম শীতেব কুয়াশা ও জ্যোৎস্না আমার সহধর্মিণীকে কেমন আকুল করে তুলেছিল সেই রাত্রে, হঠাৎ আমার কানের কাছে মুখ এনে বলল, এখন তোমাকে কথাটা বলব, ক'দিন থেকে বলব বলব করছিলাম, কিন্তু, কোথায় বললে জিনিসটা সব চেয়ে সুন্দর হয়, কখন বললে তোমার আমার দুজনেরই ভাল লাগবে ঠিক করতে পারছিলাম না।"

'তারপর? কিছু বলেছিল কি তোর কানে কানে?'

'হুঁ, এবার তিনি মা হবেন।'

এক সেকেণ্ড স্তব্ধ হয়ে রইল সীতাংশু। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে চাপা গলায় বলল, 'তা তোকে, এমন দামী কথাটা শোনাবার উপযুক্ত জায়গাই খুঁজে পেয়েছিল বটে তোর স্ত্রী, সময়টাও চমৎকার ছিল, তাই না ?'

'আমার ঘড়িতে বারোটা বেজে গিয়েছিল তখন। নিশুতি রাত খাঁ খাঁ করছিল। ব্রততী আমার দু কাঁধে দুটো হাত তুলে দিয়ে বলছিল; কাজেই এখন বুঝে নাও, এতকাল ভালবাসার সমুদ্রে সাঁতার কেটে এখন আমরা বিশ্বাসের, বন্ধনের শক্ত মাটিতে এসে দাঁড়ালাম কিনা, সত্যিকার প্রেমের দ্বীপে পৌঁছে গেছি কিনা দুটিতে।' কথা শেষ করে রণধীর দাঁত ছড়িয়ে হাসতে লাগল।

সীতাংশু জ্বলে উঠল।

'এসব পারিবারিক কথা, তোদের স্বামী-স্ত্রীর জীবনের ভেতরের কথা, এখন এগুলো আমাকে না শোনালে কি তোর চলছিল না ? আমি জানতে চাইছি কখন অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছিল, কেমন করে ব্রততীর মাথায় চোট লাগল, কলারবোন—'

'শোন শোন, ভয়ানক অধৈর্য হয়ে উঠেছিস তুই।' সীতাংশুর ডান হাতটা চেপে ধরল ডাক্তার। 'সাঁকোর ওপর উঠে ও যে কতটা ছেলেমানুষ হয়ে গিয়েছিল, না বললে তুই বুঝবি কেমন করে। দামী খবরটা আমার কানে তুলে দিয়ে ও গুন্‌গুন্ করে গান গাইতে লাগল। হাবভাব দেখে বুঝলাম ভেতরের অসহ্য সুখটা বেচারা কিছুতেই যেন ধরে রাখতে পারছে না। পাখনা মেলে দেওয়া পাখির মতন কাঁধের আঁচলটা ছড়িয়ে দিয়ে সাঁকোর কিনারে রেলিংটার ওপর ঝুঁকে দাঁড়াল।'

'তারপর!' সীতাংশু একটা চাপা নিশ্বাস ফেলল।

'বললাম, অত কিনারে যাবে না, বাঁশটা নরম হয়ে গেছে, পুরনো হয়ে গেছে।'

চোখ দুটো ছোট করে ফেলল সীতাংশু।

'রেলিং-এর গায়ে ঝুঁকে কী দেখছিল ও?'

'বলল, দ্বীপে পৌঁছে এখন আবার সমুদ্রকে দেখছি সুখের মাটিতে দাঁড়িয়ে, আমাদের এই ক'বছরের ভালবাসায় কত ঢেউ উঠেছিল পড়েছিল নতুন করে তার হিসাব নিচ্ছি। বলে খিলখিল করে হাসতে আরম্ভ করল।'

'পাগলের মতন কথা!' সীতাংশু বিড়বিড় করে উঠল। 'তারপব!'

'আর একটু ঝুঁকে দাঁড়াল সে। বললাম ও কি হচ্ছে? বলল, রূপোর চুমকি বসান নীল পর্দাটা দেখছি।'

'আশ্চর্য!' সীতাংশুর মুখের চামড়া দলা পাকিয়ে গেল। 'তবু তুই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলি, ও যে খাদের ভেতরটা দেখতে চাইছিল।'

'তাই। মোটববাইকটা আমার হাতে ধরা। চেঁচিয়ে বললাম, এভাবে ঝুঁকতে আরম্ভ করলে—একটা বিপদ ঘটিয়ে তুমি ছাড়বে দেখছি।'

'কি বলল তার উত্তরে?'

'বলল, তুমি কাছে থাকতে আমার কোনো বিপদ নেই। বলল, সুখের দ্বীপে দাঁড়িয়ে আমরা আমাদের ভালবাসার গভীরতা দেখছি, পরস্পরকে এতদিন কত ভালবেসেছি আজ এই সাঁকোর ওপর দাঁড়িয়ে তা বুঝতে পারছি।'

'কী বিচ্ছিরি আদিখ্যেতা।' নাকের ডগাটা কুঁচকে উঠল সীতাংশুর। 'যেন এর আগে পৃথিবীতে কোনো মেয়ে কোনো স্ত্রী মা হয় নি, তারপর?'

'আমি বুঝতে পারছিলাম, আনন্দে ও দিশেহারা হয়ে গেছে, কোথায় দাঁড়াচ্ছে কতটা ঝুঁকছে খেয়াল নেই। গাড়িটা দাঁড় করিয়ে রেখে পেছন থেকে ওর হাত টেনে ধরব কিনা তখনি, ভাবতে আরম্ভ করলাম—'

'ও, তখনো তুই ভাবছিলি', যেন একটা বিদ্রূপের হাসি সীতাংশুর গলার ভিতর মোচড় দিয়ে উঠল। 'তারপর ?'

'হঠাৎ একটা শব্দ করে রেলিং-এর বাঁশটা ভেঙে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার খাদের ভেতর—'

'চুপ কর, থাম রাস্কেল—' সীতাংশু গর্জন করে উঠল। রণধীর দু-হাতে মুখ ঢাকল।

সীতাংশু অন্যদিকে মুখটা ফিরিয়ে নিল।

প্রায় পনেরো মিনিট এভাবে কাটল। ইতিমধ্যে মাধব দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল। তার হাতে শাণ দেওয়া কাটারিটা ঝকঝক করছিল। দুটি মানুষকে এমন গম্ভীর চেহারা করে বসে থাকতে দেখে ভিতরে ঢুকতে সে সাহস পায় নি। এক মিনিট দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে সেখান থেকে সরে পড়েছে। তারপর এসেছিল মাধবের দিদি। রান্না হয়ে গেছে, বাবুরা স্নান করবেন খাবেন। যেন এই কথাই বলতে এসেছিল যুবতী। কিন্তু এমন চুপ করে আছে মানুষ দুটি—নিশ্চয় গুরুতর কোনো ব্যাপার ঘটেছে—অনুমান করে তখুনি সে আবার রান্নাঘরের দিকে ফিরে গেছে।

'এই রণধীর!' সীতাংশু ডাকল। তেমনি চাপা গর্জনের মতন শোনাল গলার স্বর। 'আমার দিকে তাকা।'

রণধীর চোখ থেকে হাত সরাল, সীতাংশুকে দেখল। সঙ্গে সঙ্গে মুখটা ফ্যাকাশে করে ফেলল। যেন তৎক্ষণাৎ আবার ঘাড় গুঁজে দু'হাতে মুখটা ঢাকতে চেষ্টা করল সে।

'উঁহু, এদিকে তাকা।' সীতাংশু ফের ধমক দিয়ে উঠল।

রণধীর ভয়ে ভয়ে বন্ধুকে দেখল।

'কি হয়েছে, এমন করছিস কেন!' সীতাংশু ঝুঁকে বসল। কটমট করে ডাক্তারের চোখের দিকে তাকাল।

রণধীর বিড়বিড় করে বলল, 'আমার মনে হয়, আমার মনে হচ্ছে তুই আমার একটা কথাও বিশ্বাস করছিস না।'

'কেন!' সীতাংশু প্রায় হেসে উঠল। চোখ দুটো ঝকঝকে হয়ে গেল তার। 'হঠাৎ তোর এমন ধারণা হলো কেন শুনি?'

'তোর চোখ দেখে মনে হচ্ছে, তাকানো দেখে মনে হচ্ছে।'

'ও, আমার চোখ দেখে!' এবার সীতাংশু শব্দ করে হাসল। বস্তুত সেই মুহূর্তে তার হাসিটা যে কত ভয়ংকর হয়ে উঠেছিল তার মুখের দিকে তাকালে ডাক্তার বুঝত। কিন্তু তখনি ডাক্তার ঘাড় ঘুরিয়ে নিয়েছে। সীতাংশু বুঝল, তার তাকানো তার হাসি রণধীর সহ্য করতে পারছে না। ঘাড় ঘুরিয়ে পাখির খাঁচা দেখছে।

একটু চিন্তা করল সীতাংশু। তারপর মুখের হাসি মুছে ফেলে গম্ভীর হয়ে বলল, 'তোর কথা বিশ্বাস করছি না, সবটাই বানানো গল্প, যদি এমন একটা সন্দেহ আমাব মনে হয়েই থাকে তো অন্তত এই মুহূর্তে সেটা যে আমি তোকে বুঝতে দেব না, তোর কাছে গোপন করব, ততটা বুদ্ধি আমার আছে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করিস?'

সঙ্গে সঙ্গে রণধীর কোনো উত্তর করল না।

সীতাংশু আবার বলল, 'তা ছাড়া, তোদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে ভালবাসা ছিল, সেটা ভালবাসা না, নেহাত একটা অভিনয় ছিল—কই, কোনোদিন কি আমি এ ধরনের কিছু ইঙ্গিত করেছিলাম, না আমার মুখ থেকে এই জাতের কোনো কথা এক-আধদিন শুনেছিলি তুই?'

যেন এর পর কী বলতে হবে ডাক্তার বুঝতে পারছিল না। মাথা ধরলে লোকে যেভাবে মাথা ঝাঁকায় সেভাবে দু'বার জোরে সে মাথাটা ঝাঁকাল।

'না, বলছি এই *জন্য*', ধীর গম্ভীর গলায় সে বলল, 'কেউ সাক্ষী ছিল না, চতুর্দিকে বনজঙ্গল, এমনি তো ভয়ংকর নির্জন জায়গাটা, তার ওপর নিশুতি রাত, আমার ঘড়িতে তখন বারোটা বেজে দশ—'

'তুই থাম, চুপ কর।' সীতাংশু মুখ বাঁকাল। 'নিশুতি রাত, তোরা দুজন ছাড়া সেখানে আর কেউ ছিল না, কাজেই তোর স্ত্রী কেমন করে হঠাৎ সাঁকো থেকে পড়ে গিয়ে গলার হাড় ভাঙল মাথায় চোট পেল তাই নিয়ে আমি তোকে চুলচেরা জেরা করতে লেগে গেছি—তাই না?'

'না, আমি কেন আগে তোর কাছে ছুটে এলাম না, মোটরবাইকটা সঙ্গেই ছিল, এসে তোকে খবর দিতে পারতাম, তোর লোকজন ছিল, একা আমার পক্ষে খাদের ভেতর নেমে একটা মানুষকে খুঁজে বার করা কি সেখান থেকে তাকে টেনে তোলা যখন সম্ভব ছিল না, তা ছাড়া কুয়াশার অন্ধকারে কোথায় ও ছিটকে পড়েছে—খাদের কতটা নিচে চলে গেছে বোঝা মুস্কিল ছিল, আমার সঙ্গে আলো ছিল না। ভাবলাম, যদি লোকজন ডাকতেই হয় সাঁকো পার হয়ে খানিকটা এগিয়ে যাওয়াই ভাল, কেননা ওদিকে আমার এক পেশেণ্ট থাকে সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল। পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে তার বাড়ি পৌঁছে যেতে পারব, তোর কাছে এসে তোকে খবর দিয়ে লোকজন জোগাড় করে নিয়ে যেতে দেরি হয়ে যেত।'

'তারপর?' সীতাংশু আবার একটা চাপা নিশ্বাস ফেলল। 'লোকজন এসেছিল?'

'হুঁ, অনুকূল তার দু' ভাই এবং এক ভাগ্নেকে আমার সঙ্গে দিল। অনুকূল মণ্ডল। আমার অনেকদিনের পেশেণ্ট। জাতে ছুতোর। জাতব্যবসা করে না এখন তারা। সবাই আজ প্রায় চা-বাগানের কাজে লেগে গেছে। সেখান থেকে দুটো মশাল জ্বেলে নিয়ে চারজন ঊর্ধ্বশ্বাসে সাঁকোর কাছে ফিরে এলাম। গাড়িটা অনুকূলের বাড়িতে রেখে এলাম। অনুকূলের দু' ভাই একটা মশাল নিয়ে খাদের ভেতর নেমে গেল। ভাগ্নে ও আমি আর একটা আলো নিয়ে পাড়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমার ধারণা ছিল ঢালু বেয়ে তারা অনেকটা নিচে নেমে যাবে, কিন্তু দেখলাম,

খানিকটা নেমে তারা যেন থেমে গেল। কেননা তাদের হাতের মশালটা এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে। কুয়াশার জন্য ওপর থেকে মানুষজন কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছিল না, কেবল আলোটাই চোখে পড়ছিল। হঠাৎ যেন তারা তাদের ভাগ্নের নাম ধরে চিৎকার করে ডাকছিল। হুঁ নারান। নারানের সঙ্গে আমিও ঢালু বেয়ে নালার ভেতর নেমে গেলাম। তুই তো কতবার সাঁকোটা পার হয়েছিস। নিশ্চয় লক্ষ্য করে থাকবি দুটো পাড়ই খাড়া হয়ে নিচের দিকে নেমে যায় নি, তোদের দিকে মানে টিয়াটুলির দিকের পাড়টা খুব খাড়া, যেন হঠাৎ নিচের দিকে চলে গেছে, কিন্তু ওধারটা বেশ গড়ানে, এবং ঢালুর সবটাই মাদার ও আশস্যাওড়ার ঝোপঝাড়ে ভরতি।'

'একটু সংক্ষেপ কর রণধীর, একটু ছোট করে বল।' সীতাংশুর ভিতরটা যে কত উত্তেজিত অসহিষ্ণু হয়ে আছে তার চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল। ঐ অবস্থায় নূতন করে সে হাসল। 'অতশত বর্ণনা না দিলেও আমি তোর কথা বিশ্বাস করতাম, তোদের স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপার, আমি বিশ্বাস না করার কে বল্ তো?'

শিশুর মতন ফ্যালফ্যাল করে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে রইল ডাক্তার। মুখটা আবার পাংশু হয়ে গেল।

'মানে ঝোপঝাড়ের ভেতর আটকে রইল মানুষটা, গড়িয়ে খাদের একেবারে তলায় চলে যায় নি, এই বলতে চাইছিস তো?' সীতাংশু তীক্ষ্ণ চোখে রণধীরকে দেখছিল।

রণধীর ঘাড় নেড়ে আস্তে আস্তে বলল, 'তা হলেও ওখানটায় কিছু পাথরটাথর পড়ে ছিল, এই জন্যই ঘাড়ে মাথায় এতটা চোট লাগল। 'তা না হলে, শুধু ঘাস মাটির ওপর পড়লে—'

'বুঝলাম, বুঝলাম, তারপর?'

'চারজন ধরাধরি করে ওকে সেখান থেকে তুলে আনলাম, সেন্স ছিল না, অনুকূলের ভাইয়েরা তখনি আবার ছুটে গিয়ে ওদের ওদিক থেকে একটা ট্রাক জোগাড় করে নিয়ে এল। তখন রাত দুটো।

ব্রততীকে গাড়িতে তুলে নিয়ে চারজনই পিয়ালীছড়া রওনা হয়ে গেলাম। ছোট হাসপাতাল, এসব অঞ্চলের ব্যাপার কিছু কিছু জানিস তুই, ডাক্তারও সব আমার মতন। কেস্‌টা অত সিরিয়াস না হলে ব্রততীকে আমি রাণীরবাগ নিয়ে যেতাম, বাড়িতে রেখে শুশ্রূষাটুশ্রূষা করে নিজেই চেষ্টা করে দেখতাম, কতটা কী করা যায়, কিন্তু সাহস পেলাম না।'

'হুঁ, তারপর?'

'ঐ তো বললাম, হাসপাতালে নিয়ে যাবার পর মাত্র আধঘণ্টা প্রাণটা ছিল, ঠিক উনত্রিশ মিনিট, জ্ঞান আর ফিরে আসে নি যদিও, ঘড়িটা চোখের সামনেই ধরে রেখেছিলাম। হুঁ, ও এক্সপায়ার করল আর সেই মুহূর্তে পূর্ব দিকটা লাল হয়ে উঠল।'

'চমৎকার!' যেন পূব আকাশের মতন উজ্জ্বল হাসির ছটায় সীতাংশুর চোখ মুখও লাল হয়ে উঠল। 'ঠিক উষালগ্নে ব্রততী স্বর্গে চলে গেল, তাই না?'

হঠাৎ এই হাসি দেখে চোখ বড় করে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে রইল রণধীর। এই হাসির মধ্যে কতটা আনন্দ কতটা ক্রোধ ছিল বুঝতে না পারার মতন শিশু ছিল না সে। আস্তে আস্তে আবার মাটির দিকে চোখ নামিয়ে একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল। যেন কপালের রগ টিপে ধরতে হাতটা তুলতে চেয়েছিল, কিন্তু কি ভেবে নিরস্ত হলো।

'শোন্ শোন্!' সীতাংশু ডাকল। 'এদিকে তাকা।'

রণধীর চোখ তুলল না। কাঠের মতন শরীরটা শক্ত করে রেখে পায়ের কাছের মাটি দেখতে লাগল।

'দুঃখ করে লাভ নেই।' সীতাংশু সোজা হয়ে বসল। দরজার দিকে চোখ ফিরিয়ে বেশ দরাজ গলায় বলল, 'নিয়তি, নিয়তি ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে একে, হুঁ, ব্রততীর এই মৃত্যু! বলছিস, বেচারা সাংঘাতিকরকম রোমান্টিক ছিল, ওদিকে আবার অসতর্কও ছিল, সাঁকোর ওপর উঠে জ্যোৎস্না আর কুয়াশা দেখে ছেলেমানুষ

হয়ে গিয়েছিল ; আমি বলব ওর নিয়তি ওকে এমন করে দিয়েছিল, তা না হলে পচা বাঁশের ওপর ঝুঁকতে যাবে কেন। কাজেই, আমি যা মনে করি, এখন আর শোক করে দুঃখ করে লাভ নেই—একুশ বছরের পরমায়ু নিয়ে বেচারা আমাদের মধ্যে এসেছিল, দুদিন হেসে-খেলে তারপর যেখানে যাবার—'

যেন ডাক্তারকে প্রবোধ দিতে, তার মনে সান্ত্বনা দিতে সীতাংশু বিশেষ যত্নবান হয়ে উঠল। সেরকম শোনাল তার গলার স্বর।

কিন্তু ডাক্তার তৎক্ষণাৎ দু' হাত দিয়ে মুখ ঢাকল।

সীতাংশু খুব একটা বিস্মিত হলো না।

দরজার বাইরে মাধব আবার ঘুরঘুর করছিল। তার দিদিও রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে আর একবার এখানে উঁকি দিয়েছিল। কিন্তু দু'টি মানুষকে ঠিক একভাবে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে ফিরে গেছে। অগ্রাণের সূর্য ইতিমধ্যে ঢলে পড়েছে। চৌকাঠের কাছে রোদের রেখা দেখে সীতাংশু বুঝতে পারল।

'এই রণধীর!' ডাক্তারের কাঁধে হাত রাখতে গিয়ে চমকে উঠল সে। 'কী আশ্চর্য। তুই কাঁদছিস ? শোন্, আমার দিকে তাকা।' সীতাংশু তার মুখের সামনে ঝুঁকে পড়ল।

রণধীর তাকাল না। মুখ থেকে হাত সরাল না।

'তুই সত্যি আমায় অবাক করলি।' গলা দিয়ে আক্ষেপের মতন একটা সুর বার করল সীতাংশু। 'বৌ মরে গেলে পুরুষমানুষ এভাবে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে আমি জানতাম না।' একটু থেমে থেকে চৌকাঠের হলদে রোদের রেখাটা দেখতে দেখতে অনেকটা স্বগতোক্তির মতন করে আবার বলল, 'আরে, কথায় আছে, ভাগ্যবানের বৌ মরে, শুনিস নি ?'

'ও, তা হলে তুই বলতে চাস ব্রততী মরে যাওয়াতে আমি সুখী হয়েছি, তোর কথার ধরনে মনে হয়, যেন তার সঙ্গে এতকাল আমার এমন সম্পর্কই ছিল, রাতদিন কেবল তার মৃত্যু কামনা করেছি—'

'আহা-হা তা কেন হবে, এমন কথা আমি বলব কেন।' রণধীর এভাবে রুখে উঠবে, কান্নায় তার গলার স্বর এমন বিকৃত হয়ে উঠবে, সীতাংশু ঠিক আশা করে নি, কিছুটা অপ্রস্তুত হলো সে, লজ্জা পেল না,—তা হলেও খুব যেন লজ্জা পেয়েছে এমন ভান করে ডাক্তারের হাত দুটো তাড়াতাড়ি জড়িয়ে ধরল। 'ছি, তোর ও ব্রততীর সম্পর্কে এমন ধারণা আমার কোনোদিনই ছিল না, আদর্শ স্বামী-স্ত্রী বলতে তোদের দুজনকেই আমি জানতাম, জেনেছি। না, বলছি এই জন্য, যে মানুষ চলে গেল—এখন কেঁদে খুন হলেও সে আর ফিরে আসবে না, এসেছে কি কেউ কোনোদিন? এখন কথা হচ্ছে, তুই এবার নিজের দিকে তাকা, নিজেকে ছ্যাখ্, চেহারাটা কী করেছিস। পোষাক-আসাকের এই অবস্থা, আমি তো দেখে প্রথম চিনতেই পারি নি, যেন কতকাল চান নেই, খাওয়া নেই, ঘুম নেই, সারা মুখে দাড়ি—'

'আমার যে কিছুই করতে ইচ্ছে করছে না সীতাংশু।' রণধীর এবার শিশুর মতন হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। 'খেতে ইচ্ছে করছে না, মাথায় চিরুনি চালাতে ভুলে গেছি, দু'দিন দাড়ি কামাই নি। আমি যে সব সময় চোখের সামনে ওর মুখটা দেখতে পাচ্ছি, ওর হাত—আমার জুতোর লেস্ বেঁধে দিচ্ছে, গায়ের কোট এগিয়ে দিচ্ছে, আমার খাবার নিয়ে বসে আছে, চোখে ঘুম না এলে কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। কতদিন ইচ্ছে করে মাথা এলোমেলো করে রেখেছি, সঙ্গে সঙ্গে ও ধমক দিয়েছে, চিরুনি তুলে নিয়ে নিজের হাতে চুল পাট করে দিয়েছে, যেন আমি একটি শিশু, ও ছাড়া আমাকে কেউ দেখার ছিল না। শিয়রের জানালার কোন পাল্লাটা খুলে রাখতে হবে কোনটা বন্ধ করতে হবে ও ঠিক করে দিয়েছে, টিনের সিগারেট ফুরিয়ে গেলে নতুন করে সিগারেট ভরে দিয়েছে—'

'হুঁ, তাই তো!' এই পর্যন্ত শুনে সীতাংশু একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল। 'তোদের দাম্পত্য প্রেমের তুলনা ছিল না।'

'কিন্তু আজ? আমার ঘর শূন্য আমার সংসার মরুভূমি, আমি

নিঃসঙ্গ, কেউ আমাকে দেখবার নেই।' হাতের মুঠো দিয়ে রণধীর কপাল ঠুকল। 'আর আমার বাঁচতে ইচ্ছে করছে না, ইচ্ছে করছে, ইচ্ছে করছে—' কপাল ছেড়ে বুক চাপড়াতে লাগল সে।

'কী আশ্চর্য! তুই এমন আরম্ভ করলি!'

সীতাংশু তার হাত চেপে ধরল। 'এতটা উতলা হলে তো চলবে না রণধীর, শোন্ আমার কথা—'

'আমার ইচ্ছে করছে ওই সাঁকোর ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ে নিজেকে শেষ করে দিই—আমার আর বেঁচে থাকার কোনো অর্থ হয় না। কী নিয়ে আমি বাঁচব, কাকে দেখে বাঁচব—'

'তবু তোকে বাঁচতে হবে। ছেলে মরে গেলে মানুষ শোক করে, ভাই মরে গেলে শোক করে, স্বামী মরে গেলে শোক করে—' সীতাংশু বোঝাল। 'কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবাইকে বেঁচে থাকতে হয়, কাজকর্মও করতে হয়, খাওয়া-পরা ঘুম বিশ্রাম—পৃথিবীর নিয়মগুলো আবার আগের মতন না মেনে চলে তার উপায় থাকে না। হয়তো শোক ভুলতে সময় লাগে, বিচ্ছেদের ক্ষত শুকোতে দেরি হয়। কিন্তু—'

ঠিক সেই সময় মাধবের দিদি এসে ঘরে ঢুকল।

মাধব এসে দরজায় দাঁড়াল। তারা অধৈর্য হয়ে উঠেছিল। মাধব তেমন কিছু আঁচ করতে না পারুক, তার দিদি ঠিক বুঝতে পেরেছিল, একটা বিপদ ঘটেছে ডাক্তারবাবুর; যেন কেউ মারা গেছে। ইতিমধ্যে একবার একটু সময় দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে কান পেতে থেকে একটা দুটো কথা সে শুনেও ফেলেছে। যেন এই জন্যই একটা অস্বস্তি ও উদ্বেগ নিয়ে শেষ পর্যন্ত সুখী দুজনের সামনে এসে দাঁড়াল। সীতাংশু তাকে দেখে আর চুপ করে থাকল না। এবং মাধবের দিদিকে দেখে রণধীর, এটা সীতাংশু লক্ষ্য করল, যেন আরও বেশি অস্থির শোকাকুল হয়ে উঠল। 'আমায় মরতে দে, এখনি আমি ছুটে গিয়ে ওখান থেকে লাফিয়ে পড়ি—'

যেন সীতাংশুর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বাইরে ছুটে যাবার জন্য সে ধ্বস্তাধ্বস্তি আরম্ভ করে।

'এবার আমি মারব কিন্তু রণধীর।' সীতাংশু এবার চোখ লাল করে। 'আমার এখানে যখন এসে গেছিস—এভাবে কিছুতেই তোকে মরতে দেব না, এটা তুই ভাল করে জানিস।'

মাধবের দিদিকে দেখে সীতাংশু একটু স্বস্তিবোধ করে।

'ডাক্তারবাবুর স্ত্রী মারা গেছেন। পরশু রাত্রে সেই বাঁশের সাঁকোটা পার হতে গিয়ে বিপদ ঘটে। ডাক্তারবাবুর স্ত্রী সাঁকো থেকে নিচে পড়ে যান। মাথায় শক্ত চোট লাগে। রাত্রেই পিয়ালীছড়ার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভদ্রমহিলাকে বাঁচান গেল না।'

মাধবের দিদিকে হেঁয়ালীর মধ্যে রাখল না সীতাংশু। খুঁটিয়ে সব বলল।

'এ্যাঁ, কী বলছেন, কেমন করে পড়ে গেল!' অস্ফুট আর্তনাদের মতন একটা শব্দ করে সুখী পরমুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল। যেন আর কিছু সে বলতে পারছিল না, মুখ দিয়ে কথা সরছিল না।

বিমূঢ় ভাবটা কাটিয়ে উঠতে একটু সময় লাগল তার। তারপর আঁচলের কোণা দিয়ে সে চোখ মুছল এবং সীতাংশুর দেখাদেখি, অস্থির শোকার্ত মানুষটাকে সান্ত্বনা দিতে প্রবোধ দিতে রণধীরের সামনে ঝুঁকে দাঁড়াল।

'না, এমন করবেন না, এতটা উতলা হলে তো আপনাকে চলবে না ডাক্তারবাবু! একটু শক্ত হোন, একটু ধৈর্য ধরুন।'

সীতাংশু অবাক হলো, সঙ্গে সঙ্গে রণধীর যেন ধৈর্য ধরল, চুপ থেকে মাধবের দিদির মুখটা দেখল।

সুখী আর একবার আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে অনেকটা নিজের মনে বলল, 'আহা, সোনার মানুষ ছিলেন, এমন অকালে সোনার সংসার অন্ধকার করে দিয়ে চলে গেলেন!'

তার কথা শুনে দুজন পুরুষ এক সঙ্গে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এতক্ষণ যেন থেকে থেকে এ-ঘরে শোকের ঘূর্ণি হাওয়া উঠছিল, হঠাৎ হাওয়াটা বন্ধ হয়ে গিয়ে ঘরের ভিতরটা কেমন থমথম করতে লাগল। আর একটি পুরুষ এসে পা টিপে টিপে তিনজনের পিছনে দাঁড়ায়। মাধব। কিন্তু তাকে দেখেও তার সঙ্গে কেউ কথা বলল না।

'উনি সতী ছিলেন, তাই সিঁথির সিন্দুর নিয়ে স্বর্গে চলে গেলেন।' সুখী এবার আঁচল দিয়ে নাকের ডগাটা মুছল। রণধীরের দিকে চোখ রেখে বলল, 'কিন্তু আপনাকে তো বুক বাঁধতে হবে, উনি আর ফিরে আসবেন না ঠিকই, কিন্তু আপনাকে তো এভাবে শরীরমন নষ্ট করলে চলবে না।'

'আমার আর একবিন্দু ইচ্ছে নেই বেঁচে থাকার।' রণধীর এবার সোজা হয়ে বসল। ক্লান্ত চোখ দুটো সুখীর মুখের ওপর মেলে ধরে আস্তে আস্তে বলল, 'আমার গায়ের পোষাকের অবস্থা দেখছ, কাল থেকে আমার স্নান নেই, খাওয়া নেই, ঘুম নেই, আর—আর আমার ঘরে গিয়ে যদি দেখ, আমার সেই সাজান ঘর—আমার সেই তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে গোছান ঘর দু'দিনের মধ্যে কেমন এলোমেলো ছত্রখান হয়ে গেল—' এই পর্যন্ত বলে রণধীর আর বলতে পারল না। নূতন করে তার শোক উথলে উঠল। চোখে হাত চাপা দিয়ে ঘাড় গুঁজে কাঁদতে আরম্ভ করল।

যেন ঠিক সেই মুহূর্তে ডাক্তারবাবুর মাথায় হাত রেখে সান্ত্বনা দিতে পারলে সুখীর ভাল লাগত। তা অবশ্য সে আর করল না, তা হলেও যতটা সম্ভব নুয়ে মুখের কাছে মুখ নিয়ে করুণ সুরে বলল, 'আপনি চান করে দুটি ভাত খান, তারপর বিশ্রাম করুন। আমার রান্না হয়ে গেছে। আর আপনার ঐ পোষাকটা ছেড়ে ফেলুন। আমি জামাকাপড় দিচ্ছি।'

'হুঁ, তাই তো।' সীতাংশু ঘাড় নাড়ল। 'বাক্সে অতিরিক্ত জামাকাপড় তোলা আছে। মাধবের দিদি ধুয়ে ভাঁজ করে আমার জন্য

সব সময় রেডি রাখে। স্নান করে সেসব পরতে পারবি। আর তোর গায়ের ময়লা জিনিসগুলো ছেড়ে দে—এ-বেলা কিছু রাণীরবাগ ফিরে যাচ্ছিস না, মাধবের দিদি সাবান দিয়ে কেচে আবার ইস্ত্রিটিস্ত্রি করে দেবে।'

'এবেলা কেন, আমার তো মনে হয় এখানে ডাক্তারবাবুর অন্তত ছুটো দিন থেকে যাওয়াই ভাল। ওখানে কে তাঁর দেখাশোনা করে, যত্ন নেয়। চেহারাটা কী ভীষণ খারাপ হয়েছে।' সরাসরি ডাক্তারবাবুকে প্রস্তাবটা না দিয়ে সীতাংশুর মুখের দিকে মুখ ফিরিয়ে সুখী কথাটা বলল।

'তাই তো!' সীতাংশু খুশি হল। 'খুব ভাল কথা।' ডাক্তারের দিকে ঘাড় ফেরাল সে। 'সেখানে কে তোর দেখাশোনা করবে, কে নিয়মিত রেঁধে খাওয়াবে। এখানে তুই ছুদিন তিনদিন কেন—যে ক'দিন ভাল লাগে থেকে যা।'

'আমার তো মনে হয় বনজঙ্গল হলেও আপনার খারাপ লাগবে না এখানে।' সুখী সঙ্গে সঙ্গে বলল।

'খারাপ লাগবে কেন।' সীতাংশু সামান্য হাসল। 'নতুন জায়গা না, ক'বারই তো আমার ডেরায় এসেছিস।' বন্ধুর হাত ধরে আস্তে ঝাঁকুনি দিল সে। 'নে, এইবেলা উঠে চানটান কর্, হুঁ, আগে মুখটা কামিয়ে নে, টেবিলে সাবান রেজার আয়না সব রয়েছে।'

কিন্তু তাতে কি রণধীর সন্তুষ্ট হলো, তার মনে সান্ত্বনা ফিরে এল? কাতর চোখ মেলে সীতাংশুকে একটু সময় দেখল সুখীকে দেখল, তারপরে ছু' হাতে চোখ ঢেকে মাথাটা ঝাঁকাতে আরম্ভ করল, কাঁদতে আরম্ভ করল।

'কী হলো! আবার এমন করছিস!' সীতাংশু রুষ্ট হলো।

'আমার ঘর, আমার রাণীরবাগের সাজান বাংলো।'

'হুঁ, ছু'দিন এখানে বিশ্রাম কর্, তারপর বাংলোয় ফিরে যাবি। এত অস্থির হচ্ছিস কেন।'

'কিন্তু আমার ঘর যে আজ কাঁটাবন হয়ে আছে সীতাংশু, সেখানে কেমন করে আমি ফিরে যাব।'

'আশ্চর্য।' এবার সুখী কথা বলল। 'এই নিয়ে এখন আপনি মাথা ঘামাচ্ছেন! ঘর আবার গোছানো হবে সাজান হবে, কাঁটাবন আবার বাগান হবে; আগে নিজের শরীর দেখুন, স্বাস্থ্যের কথা ভাবুন।'

সীতাংশু আর কিছু বলল না। খাঁচার পাখিটাকে দেখতে লাগল। বড় বেশি ছটফট করছে, যেন বনে উড়ে যেতে চাইছে। অথচ একটু আগে সুখী আদর করল বুকে নিয়ে চুমু খেল।

'আমি একদিন গিয়ে ঘরটা গুছিয়ে দিয়ে আসব, হয়তো ওঁর মতন পারব না, আপনার স্ত্রী যেমন করে গুছোত, তা হলেও আমার কাজ আপনার খারাপ লাগবে না।' ডাক্তারকে বোঝাচ্ছিল, প্রবোধ দিচ্ছিল মাধবের দিদি।

একদিন দুদিন করে অঘ্রাণ কাটল, পৌষ গেল, মাঘও যায় যায়। আর পাঁচটা দিন মোটে বাকি। তারপর ফাল্গুন। তার মানে চৈত্রের দোসর, মধু মাস। কাজেই এর মধ্যেই টিয়াটুলির জঙ্গলে একটা সোরগোল পড়ে গেছে। যেন কেউ আসছে, দু-একদিনের মধ্যেই এসে যাবে। পাখিদের কিচিরমিচির বেড়ে গেছে। পাখির সংখ্যাই তো কত বেড়ে গেল ক'দিনে দেখতে দেখতে। নিত্য-নতুন পাখি দেখা যাচ্ছে।

'কোথায় ছিল এরা এ্যাদ্দিন লুকিয়ে।' মাধব চুপ করে এক-একটা গাছের ডালের দিকে বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে। কিন্তু সীতাংশুর যেন মনে হয়, ছোঁড়া কেবল পাখিই দেখছে না, আরও কিছু দেখছে। পাতাটাতা ঝরে গিয়ে মাদারগাছটা কেমন ন্যাড়া হয়েছিল, আর এই একটা-দুটো দিনের মধ্যে রাজ্যের কুঁড়ি এসে গেছে ডালে ডালে, কুঁড়ির সঙ্গে মেয়েলী নখের মতন সরু ছুঁচলো সব কলি। উঁহুঁ,

কেবল কলি আসবে কেন। গাছের আগায়, একেবারে মগডালে রক্তের ছিটার মতন টুকটুকে দুটো মাদারফুল ফুটে রয়েছে। পাতা বেরোবার আগেই ফুল। তেমনি ওদিকের শিমুলগাছ দুটো। পাতার দেখা নেই, তার আগেই ডবকা ডবকা কলি এসে গাছ ছেয়ে গেছে। ওদিকে অশোক শাল অর্জুন পলাশ, এদিকে আম আমড়া লিচু জাম নিম যেদিকে তাকাও, কচি পাতার সঙ্গে আড়াআড়ি করে ফুল কলি মঞ্জরীরা ছুটে এসেছে।

আর এসেছে ভোমরা মৌমাছির ঝাঁক, শালিক বুলবুলি চড়ুই ও নরুন পাখির দল। হুঁ, মধুর গন্ধ পেয়ে তারা কী ভীষণ চঞ্চল উৎসুক হয়ে উঠেছে, তাকিয়ে দেখবার মতন। তাই সারাক্ষণ এত কূজন এত গুঞ্জন জঙ্গলে। কান পাতা যায় না এমন। একটা উৎসব শুরু হয়ে গেছে এই বাড়িতে—বোঝা যায়।

'পাখিঅলা কিন্তু আর এল না।'

'নাঃ।' একটা নতুন পাখি দেখতে সীতাংশু বকুলগাছটার দিকে চোখ ফিরিয়েছিল, মাধবের কথা শুনে চমকে উঠে ঘাড় নামিয়ে কিশোরের মুখটা দেখল। ঢোক গিলে আস্তে আস্তে বলল, 'আমার মনে হয় অন্য কোথাও চলে গেছে পাখিঅলা, অন্য বনে।'

মাধব আর কিছু বলল না। যেন অনেক কিছু বলবার ছিল কিন্তু তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে, তাই বেচারা হঠাৎ চুপ করে রইল। তার মুখটা দেখে সীতাংশুর কষ্ট হলো।

'একটা কাজ করলে হতো।' খানিকটা চিন্তা করার পর সীতাংশু বলল, 'কাঠবিড়ালের কিছু অভাব নেই এখানে। আমরা একটা কাঠবিড়ালের বাচ্চা পুষতে পারি।'

'নাঃ।' মাধব মাথা নাড়ল। এই জিনিসে তার যে কোনোদিনই উৎসাহ নেই সীতাংশু জানত, তবু যেন পাখির প্রসঙ্গটা চাপা দিতে সে কথাটা তুলল। কিন্তু প্রস্তাব শোনামাত্র কিশোর যেভাবে মাথা নাড়ল, সীতাংশু এই নিয়ে আর কথা বলা সঙ্গত মনে করল না।

হাঁটতে হাঁটতে দুজন জঙ্গলের ভিতর সেই অন্ধকার মতন জায়গাটায় চলে এল। শীতকালে যেখানে কাঁটাঝোপ ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ত না। আর কাঁটাগাছের সেই বিষে ভরা নীল নীল ফুল। আর প্রজাপতির মতন সাদা ডানার অফুরন্ত ছোট ছোট পতঙ্গ। এখন জায়গাটার চেহারা একেবারে বদলে গেছে। মোটেই অন্ধকার লাগছে না। অবশ্য বেলাও এখন বেশ বড়। সূর্য ওপরে উঠেছে। কারখানা ছুটি হয়ে যাবার পরও গাছের মাথায় সোনালী রোদ থিরথির করে কাঁপছিল। পাতার ফাঁক দিয়ে কিছু সোনা নিচেও ঝরে পড়ছিল। নিচের ঘাসগুল্ম সবুজ মখমলের মতন উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। কিন্তু কাঁটাবন কোথায়। ভাঁটের জঙ্গলে জায়গাটা ভরে গেছে। এখনও কলির ভাগ বেশি। তা হলেও এর মধ্যেই কম ফুল ফুটেছে কি! সাদা ভাঁটফুলের মধু খেতে বোলতা মৌমাছি ও ভোমরার আনাগোনা শুরু হয়েছে।

মাধব ও সীতাংশু চুপ করে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখল। প্রায় দক্ষিণ-ঘেঁষা একটা হাওয়া থেকে থেকে বইছিল। ভাঁটবন কাঁপছিল, এখানে ওখানে থোকা থোকা ভাঁটফুল বাতাসে দুলছিল। ফুলের গন্ধে জায়গাটা ভরে গেছে।

ফুলের গন্ধ, পাখির কলরব, ভোমরা মৌমাছির গুঞ্জন, গাছে গাছে নতুন পাতা কুঁড়ি কলি মঞ্জরী, বিকেলের সোনাঝরা রোদ—টিয়াটুলির জঙ্গলের এই উৎসবকে অস্বীকার করত কে?

কিন্তু তবু মনে হচ্ছিল, কী যেন নেই, কিসের একটা অভাব। মাধবের চোখ দেখে সীতাংশু বুঝতে পারে মাধব ঠিক সুখী হতে পারছে না, জঙ্গলের এই উৎসবের দিনেও কেমন নিস্তেজ মনমরা হয়ে আছে সে। তেমনি সীতাংশুকে দেখেও ছোট ছেলেটি বুঝতে পারছিল, টিয়াটুলির আকাশ মাটি গাছপালায় রং ধরছে, কিন্তু বয়স্ক মানুষটির মনে এক ফোঁটা রং লাগছে না। অথচ কেউ কারো মনের কথা প্রকাশ করছে না, যেন ভিতরের দুঃখটা, একটা কিছু না

থাকার অভাব দুজনেই চেপে রাখতে চাইছে।

হয়তো এই জন্যই এমন চমৎকার ভাঁটের সামনে দাঁড়িয়ে দু'টি অসমান বয়সের মানুষ দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

আর এগোতে ইচ্ছা করছিল না তাদের।

'চল্, ফিরে যাই।' সীতাংশু আস্তে বলল।

মাধব ঘুরে দাঁড়াল। দুজন হাঁটতে আরম্ভ করল। কারো মুখে কথা ছিল না।

ডেরার কাছে পৌঁছে সীতাংশু থমকে দাঁড়ায়। দেখাদেখি মাধবও দাঁড়িয়ে পড়ে।

'লোকটাকে চেনাচেনা মনে হচ্ছে না!' সীতাংশু ফিসফিস করে উঠল।

'পাখিঅলা।' ফিসফিস করে উত্তর দিল মাধব।

দুজনের গলার স্বরে চাপা উত্তেজনা। সীতাংশুর ডেরার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে পাখিঅলা কাকে যেন খুঁজছে, কাউকে খুঁজতে এসে দরজায় তালা দেখে অপ্রস্তুত হয়ে গেছে। মাধবকে নিয়ে বেড়াতে বেরোবার আগে সীতাংশু ঘরে তালা ঝুলিয়ে গিয়েছিল।

উত্তেজনা চাপতে না পেরে মাধব কেশে গলার শব্দ করল।

সীতাংশুও মনে মনে তাই চাইছিল। একটা শব্দ হলে লোকটা এদিকে ঘুরে দাঁড়াবে, দুজনকে দেখতে পাবে। এভাবে তালাবন্ধ ঘরের সামনে সে দাঁড়িয়ে আছে দেখে সীতাংশুর খুব খারাপ লাগছিল।

'হেই যে পাখিঅলা!' কাশির শব্দ শুনতে পায় নি দেখে মাধব শেষটায় চেঁচিয়ে উঠল। এবার পাখিঅলার কানে আওয়াজ ঢুকল, ঘুরে দাঁড়াল সে। এতক্ষণ আর মানুষ দেখছিল না। একলা চুপ করে দাঁড়িয়ে পাখির শব্দ শুনছিল, গাছের পাতার শব্দ শুনছিল, আর তার সঙ্গে একটানা ঝিঁঝিঁর ডাক। এবার দু'টি মানুষের মুখ একসঙ্গে দেখতে পেয়ে সে খুশি হলো, তার লাল বিশাল চোখ দু'টো দেখে সীতাংশু বুঝতে পারল। লাল চোখ, রাত্রির মতন মিশমিশে কালো

গায়ের রং, সাদা দাঁত। মানুষটা অবিকল আগের মতন আছে। সাদা ধবধবে দাঁত ছড়িয়ে সে হাসল।

'কোথায় ছিলে এ্যাদ্দিন!' মাধব প্রশ্ন করল।

'উত্তরে চলে গেলাম হঠাৎ', পাখিঅলা লম্বা করে নিশ্বাস ফেলল। 'তাই আসতে দেরি হয়ে গেল।

'তুমি যাবার সময় বলে গেলে কিনা—সাতদিন পর আবার আসবে, এসে দিদির পাখিটা কেমন আছে দেখবে।' মাধব অভিযোগের গলায় বলল, 'সারাটা শীত পার করে তবে এলে।'

পাখিঅলা চুপ করে রইল। যেন লজ্জা পেল। কথা দিয়ে কথা রাখতে পারে নি।

'আজ কি আবার একটা পাখি ধরবে?' একটু পরে মাধব প্রশ্ন করল।

পাখিঅলা চোখ তুলে সামনের আমলকীগাছটা দেখল, হরিতকীগাছটা দেখল।

'অনেক পাখি উড়ে এসেছে জঙ্গলে।' এবার সীতাংশু কথা বলল। 'নিত্য-নতুন পাখি দেখা যাচ্ছে!'

'হুঁ', পাখিঅলা মাথা নাড়ল। 'বসন্তকাল এসে গেল কর্তা, এখন তো পাখির সময়।'

'কিন্তু আমাদের আর পাখির দরকার নেই পাখিঅলা।' মাধব তাড়াতাড়ি বলে ফেলল, 'তোমাকে খামকা গাছে চড়ে কষ্ট করতে হবে না।'

লাল চোখ দুটো আরও বড় করে ছড়িয়ে দিল পাখিঅলা। বাচ্চা ছেলেটির কথা শুনল। তারপর একটা প্রকাণ্ড ঢোক গিলল।

বেশ হেঁয়ালীর মধ্যে পড়ে গেছে মানুষটা, সীতাংশু তার চেহারা দেখে বুঝল। তাই একটু হাসল সে। 'মাধব্ পাখি পুষতে চাইছে না, বলে কি না মেয়েরা পাখি পোষে, বেটাছেলে জন্তু-জানোয়ার পুষবে।'

শুনে পাখিঅলাও হাসল। যেন এবার সে একটু নিশ্চিন্ত হলো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চোখ ঘুরিয়ে আবার যেন কাকে খুঁজলে।

'দিদি এখানে নেই!' মাধব তৎক্ষণাৎ মাথা ঝাঁকাল। 'এখান থেকে চলে গেছে।'

'সুখী থাকলে আজ আর একটা পাখি চাইত ঠিক।' সীতাংশু মনে মনে বলল।

'কোথায় গেল দিদি?'

যেন একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করল পাখিঅলা। মাধব চট করে উত্তর দিল না। সীতাংশুর মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল।

'আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে গেছে ওর দিদি।' পাখিঅলার চোখের দিকে চোখ রেখে সীতাংশু বলল, 'ক'দিন ওখানে থাকবে।'

পাখিঅলা আবার একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা প্রশ্ন, একটা কৌতূহল তার লাল চোখ দুটোর ভিতর উঁকি দিল।

'পাখিটা সঙ্গে নিয়ে গেছে?'

'না।' মাধব মাথা ঝাঁকাল। তারপর চুপ করে রইল।

পাখিঅলা এবার সত্যি দমে গেল। যেন তারপর কী প্রশ্ন করবে বুঝতে পারছিল না।

'পাখিটা মরে গেছে, বাঁচল না। সীতাংশু আঙুল দিয়ে ওপাশের কাঠমালতীগাছটা দেখাল। শূন্য খাঁচাটা গাছের ডালে ঝুলছিল। কবে জানি মাধব ওখানে ঝুলিয়ে রেখেছে ওটা।

পাখিঅলা চুপ করে কতক্ষণ খাঁচাটা দেখল। তারপর মুখটা বিকৃত করে ফেলল। ঘাড় নামিয়ে একদলা থুথু ফেলল মাটিতে।

'ভালবাসা পায় নি, আদর-যত্ন পায় নি।' নিজের মনে বকবক করে উঠল সে। 'আদর-যত্ন পেলে ওই পাখি কখনো মরে?'

সীতাংশু শুনল, মাধব শুনল। চুপ করে রইল তারা। যেন এর পর আর কিছু বলার ছিল না।

পাখিঅলা আর দাঁড়াল না, পৈঠা থেকে লাফিয়ে নিচে নেমে কাঠমালতীগাছটার কাছে ছুটে গিয়ে দড়ির বাঁধন খুলে খাঁচাটা নামাল, চোখের সামনে শূন্য খাঁচাটা তুলে ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কী

যেন দেখল। তারপর সেটা হাতে ঝুলিয়ে হনহন করে বনের দিকে চলে গেল। একবারও পিছন ফিরে তাকাল না। যেন এখানে আর তার কোনো কাজ নেই, সব শেষ হয়েছে।

'রাগ করেছে।' মাধব ফিসফিস করে বলল।

'হুঁ, তার মনে খুব দুঃখ হয়েছে।' সীতাংশু খাটো গলায় বলল।

একটু সময় বনের দিকে তাকিয়ে থেকে মাধব এদিকে চোখ ফেরাল।

'খাঁচাটা নাকের কাছে তুলে ধরে গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে চলে গেল।'

'হুঁ', সীতাংশু ঘাড় কাত করল। 'পাখির গায়ের গন্ধ লেগে আছে খাঁচায়।'

তাই কি। কথাটা নিজের কানে খট করে লাগল। সুখী চলে যাওয়ার দুদিন পরে পাখিটা মরে যায়। তারপর তো ধরতে গেলে এই তিনমাস শূন্য খাঁচাটা কাঠমালতীর ডালে ঝুলছে। অনেক রোদ লেগেছে শিশির লেগেছে বাতাস লেগেছে। মাঘের মাঝামাঝি চমৎকার এক পশলা বৃষ্টিও হয়ে গেল। বৃষ্টির জলে খাঁচা ধুয়ে গেছে। তবু কি পাখির গায়ের গন্ধ লেগে রইল ওতে? না কি গন্ধের স্মৃতি! নাকের কাছে ধরলে টের পাওয়া যায়?

তালা খুলে সীতাংশু ঘরে ঢুকল। বাইরে রোদ এতক্ষণে নিবে গেল। অন্ধকার লাগছিল ভিতরটা।

'আলো জ্বালব?' পিছন থেকে মাধব বলল।

'দরকার কি এখনই আলো জ্বালবার।' অন্ধকারটা ভাল লাগছিল সীতাংশুর। বলল, 'আজ পূর্ণিমা, এখনি চাঁদ উঠবে। জানালা খুলে দে। চাঁদের আলো ঘরে ঢুকুক।'

প্রস্তাবটা মন্দ লাগল না মাধবের। হ্যারিকেনে তেল ভরতে হবে, হাতে কালিঝুল লাগিয়ে চিমনি সাফ করতে হবে, সলতেটা কেটেছেঁটে সমান করা—তারপর তো আলো জ্বালা, অনেক হাঙ্গামা।

তার চেয়ে জানালা খুলে দিয়ে ঘরে চাঁদের আলো ঢুকতে দেওয়া কত সহজ। মাধব তৎক্ষণাৎ দুটো জানালাই খুলে দিল। চাঁদ ওঠে নি, উঠতে আরম্ভ করেছে, পূবদিকে বনের পিছনে সবে আগুন লেগেছে। জ্যোৎস্নার পরিবর্তে বন্‌বন্‌ করে এক ঝাঁক মশা এসে ভিতরে ঢুকল, আর ঝিঁঝিঁর শব্দ।

'এখন কি উনুন ধরাব ?' মাধব আবার প্রশ্ন করে।

'উহুঁ, দরকার কি', সীতাংশু মাথা নাড়ল। 'ওবেলার পান্তা ভাত আছে, একটু শুকনো মাছ পুড়িয়ে নিলেই চলবে। সে পরে দেখা যাবে।'

মাধব খুশি হলো।

'তবে আমি একটু ঘুরে আসি।'

'তাই যাও।' সীতাংশু খুশি হয়ে অনুমতি দিল। হৃষ্টমনে কিশোর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সীতাংশু মনে মনে হাসল। দিদি চলে যাবার পর ভাইটি এখানে কাজ করছে। অবশ্য মুরারির কথা শুনেই সীতাংশু তার ঘরের কাজে মাধবকে লাগিয়ে দিয়েছে। 'বড় হয়েছে ছেলে, এখন আস্তে আস্তে দুটো পয়সা রোজগার করতে শিখুক, আর কতকাল জঙ্গলে ঘুরে খরগোসের বাচ্চা উদের বাচ্চা ধরবে।' মুরারির যুক্তি সীতাংশু অস্বীকার করতে পারে নি।

কিন্তু ওইটুকুন ছেলে। উনুন ধরানো, বসে বসে রান্না করা, ধোয়ামোছা কি ঘর ঝাঁট দেওয়া, জল তোলা, বাটনা বাটা—কতক্ষণ মন বসে তার। সীতাংশু তাই দেখছে, যত সংক্ষেপে মাধবের কাজ সারা হয়। তা না হলে তাকে সঙ্গে নিয়ে সে-ই বা বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবে কেমন করে!

তাই আবার তার বাসনকোসনে দাগ ধরতে আরম্ভ করেছে, জামাকাপড়ের মতন বিছানাপাটি ময়লা হচ্ছে, ঘরে ধুলো জমছে, বেড়ার গায়ে কালিঝুল মাকড়সা, যেমন আগে ছিল। মাধব অবশ্য মাঝে মাঝে ঝাঁটা নিয়ে আসে ঘর পরিষ্কার করতে, সাবান সোডা

নিয়ে তৈরি হয় এটা ওটা কেচে সাফ করবে বলে। সীতাংশু হাত তুলে তাকে নিবৃত্ত করে। 'আজ থাক, কাল দেখা যাবে।' পরদিন মাধব আবার হয়তো ঝাঁটা নিয়ে এল। সীতাংশু আলস্যের হাই তুলে কিশোরের মুখটা দেখল। 'এত তাড়া কি, ওবেলা সব পরিষ্কার করলেই হবে।' এবং ওবেলা মাধবেরও আর কথাটা মনে রইল না। তা ছাড়া সীতাংশু হয়তো তাকে সঙ্গে নিয়ে তখন জঙ্গলে ঘুরতে বেরিয়েছে। মোটের ওপর এবেলার কাজ ওবেলা, ওবেলার কাজ পরদিনের জন্য জমিয়ে রাখছে বলে মাধবও কিছু অখুশি না। তার ফলে যা দাঁড়িয়েছে। দিনের পর দিন ঘরে ধুলো জমছে, ঘরের চারপাশে জঞ্জালের স্তূপ, ময়লা জামাকাপড়, বিছানাপাটি মলিন থেকে মলিনতর হচ্ছে। এবং এখন আবার সীতাংশুর গালভরা দাড়ি, মাথায় বড় বড় চুল। চব্বিশঘণ্টা কানের কাছে কেউ 'পরিষ্কার' 'পরিষ্কার' করে চেঁচাচ্ছে না বলে সে খুবই নিশ্চিন্ত। তৃপ্ত বলা যায়।

তেমনি ঘর অন্ধকার করে চুপ করে বসে থাকার মধ্যে শান্তি পায় সে। পাখির খাঁচার মতন একটা ঘরের ভিতরও কোনো মানুষের গায়ের গন্ধ লেগে থাকে বৈকি, অথবা গন্ধের স্মৃতি। এই জন্যই আলো জ্বালতে ভয় করছিল তার। অন্ধকারের মজা এইখানে। স্মৃতিকেও চাপা দিয়ে রাখে, ঢেকেঢুকে রাখে। তা না হলে বেড়ার ঝুলকালি, ময়লা বিছানা, মেঝের ধুলো জঞ্জাল, ময়লা জামাকাপড়, আমাজা বাসনকোসন—এসব দেখে তিনমাস আগের কথা মনে পড়ত তার। হঠাৎ একটি পরিচ্ছন্ন মেয়ে এসে এই ঘর, ঘরের প্রত্যেকটা জিনিস কেমন ঝকঝকে করে তুলেছিল। কেবল তাই না, নিজের বেশভূষা সম্পর্কেও কত সচেতন হয়ে উঠেছিল সীতাংশু, তা ছাড়া নিত্য সাবান মেখে স্নান করা, নিয়মিত দাড়ি কামান, মাথায় সুগন্ধ তেল মাখা। এখন মনে হলে তার হাসি পায়। মাধবের দিদির পাল্লায় পড়ে দু'দিনের জন্য কত কী না তাকে করতে হয়েছিল।

তারপর একদিন একটা ঝড় উঠে সব ওলটপালট হয়ে গেল।

পীতাম্বরের গাছচাপা পড়াটা কিছু না। উঁহুঁ, একখণ্ড কালো মেঘও বলা যায় না ওটাকে। আবার আগের মতন কারখানার কাজ করছে সে। পায়ে ব্যাণ্ডেজ নিয়ে দিন পনেরো বিছানায় শুয়ে ছিল। এখন পা সম্পূর্ণ সেরে গেছে।

আর, সেদিন কিনা খবরটা পেয়ে সীতাংশু প্রথমটায় ভেবেছিল টিয়াটুলির শান্ত আকাশে ওই বুঝি ঝড়। কোনোদিন যা এখানে ঘটে নি। এতবড় দুর্ঘটনা। কাজ করতে এসে তার এক কর্মচারী এভাবে আঘাত পেল।

কিন্তু ঝড়টা যে তার আগের রাত্রেই হয়ে গেছে, না কি তার আগের রাত্রে।

ঠিক টিয়াটুলির জঙ্গলে না, তবে কাছেই, সেই বাঁশের সাঁকোর ওপর। বারোটা বেজে গিয়েছিল তখন, নিশুতি রাত খাঁ-খাঁ করছিল। কুয়াশা ও জ্যোৎস্না নিয়ে সে এক অদ্ভুত রাত।

কিন্তু রাত্রের দিকে যে এমন একটা ঝড় উঠবে, এতবড় দুর্ঘটনা ঘটবে, সেদিন বিকেলেও সীতাংশু টের পায় নি। টের পাওয়া উচিত ছিল।

স্বামী-স্ত্রী বেড়াতে এসেছিল এই জঙ্গলে, তার ডেরা দেখতে এসেছিল। সেই সঙ্গে কারখানা।

সীতাংশুর বোঝা উচিত ছিল, তখন থেকে ঝড়ের সূত্রপাত। এই জঙ্গল থেকে মেঘের উৎপত্তি।

কিন্তু আগে থাকতে যদি পৃথিবীর সব জিনিস দেখা যেত, বোঝা যেত!

দেখা যায় না, বোঝা যায় না। এই জন্যই আমরা পদে পদে ভুল করি। যেটা অভিনয় সেটাকে সত্য বলে ধরে নিই, সত্যটাকে মনে করি অভিনয়। সত্য-মিথ্যায় গুলিয়ে ফেলি।

হুঁ, রাত্রের ঝড়ের জের পরদিন ছিল, তার পরদিনও। থেকে থেকে ঝাপটা দিচ্ছিল, সোঁ সোঁ শব্দ হচ্ছিল হাওয়ার। সেই এলোমেলো মত্ত হাওয়ার বাড়ি খেয়ে টলতে টলতে রণধীর এসে দাঁড়াল এইখানে, সীতাংশুর ঘরের দরজায়। বন্ধুর হাত ধরে সে তাকে ভিতরে নিয়ে এল। মাধবের দিদি ইজিচেয়ারটা বিছিয়ে দিল। শোকার্ত মানুষটির সেই মূর্তি ভুলবার নয়। তার কান্না উথলে উঠেছিল। তাই তো, প্রিয়তমা পত্নীর অকালমৃত্যু এই জগতে কোন্ সৎ স্বামীকে না কাঁদিয়েছে! প্রেম যেখানে গভীর, সমুদ্রের মতন উত্তাল বিস্ফারিত।

রণধীব আরও বেশি কাঁদছিল তার ঘরের কথা ভেবে। যে-ঘর অষ্টপ্রহর উদ্যানের মতন সাজিয়ে রেখেছিল ব্রততী। যত্নের অভাবে দু'দিনের মধ্যে তা কাঁটাবন হয়ে গেল।

আর তার পোষাক।

দুদিনেই কেমন জীর্ণ মলিন হয়ে গেছে।

ব্রততী নেই, তার বেশভূষার পরিচর্যা করে কে।

ঠিক এই জায়গায় মাধবের দিদি ডাক্তারকে সান্ত্বনা দিয়েছিল। ময়লা পোষাকের জন্য ভাবতে হবে না। সে ধুয়ে-কেচে সব ইস্ত্রি করে দেবে। আর, গিন্নী নেই বলে ডাক্তারবাবুর ঘরদুয়ার যদি এর মধ্যেই এলোমেলো বিশৃঙ্খল হয়ে গিয়ে থাকে, একদিন রাণীরবাগ গিয়ে সুখী সব গোছগাছ করে দিয়ে আসবে, অসুবিধা কিছু হবে না, সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়ে আসবে বাংলোর ভেতর বার।

প্রবোধ পেয়ে রণধীর কিছুটা সুস্থ হয়েছিল। সীতাংশুর কথা-মতন আর কাঁদাকাটা না করে দাড়ি কামাল, গায়ে সাবান মেখে ভাল করে স্নান করল। ময়লা পোষাক ছেড়ে ফেলে সীতাংশুর ধোয়া জামাকাপড় পরল। তারপর খেতে বসল। মাধবের দিদি একসঙ্গে দুজনকে পরিবেশন করল। দুই বন্ধু মাছের ঝাল ঝোল দিয়ে ভাত খেল।

তখন ডাক্তারের চেহারা দেখে বোঝা গেছে, সীতাংশুর উপদেশ

ও সেই সঙ্গে মাধবের দিদির অনুরোধে কাজ হয়েছে। টিয়াটুলির জঙ্গলের ডেরায় দু-চারদিন থাকবে ডাক্তার, থেকে শরীর ও মন দুটোকে বিশ্রাম দেবে।

কিন্তু থাকল কি শেষ পর্যন্ত। বিকেল পড়তে আবার সে ব্যাকুল হয়ে উঠল। কাঁদতে আরম্ভ করল। এবার আর ফুঁপিয়ে কান্না না, যেন ঝড়ো হাওয়ার বাড়ি খেয়ে সমুদ্র উথলে উঠল, হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল রণধীর, বুক চাপড়াতে লাগল। যা বলা হচ্ছিল, ঝড়ের রেশ। দামাল বাতাস লেগে সমুদ্র নতুন করে উত্তাল হয়ে উঠতে সীতাংশু চিন্তা করল, তাই তো হবে। এতকাল প্রেমের সমুদ্রে সাঁতার কাটছিল দুজন। সাঁতার কেটে খুব সম্প্রতি তারা একটা নিভৃত সুন্দর দ্বীপে পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু বিধি বাম। দ্বীপে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রততী বিচ্ছিন্ন হলো, ইহলোক থেকে সরে গেল। সঙ্গীহীন ডাক্তার ফিরে এল সমুদ্রে, এবার দুঃখের পাথার, যাকে বলে অন্তহীন শোকসমুদ্র। কতকাল কাঁদবে বুক চাপড়াবে কে জানে।

'আমার ঘর, আমার ঘর।'

'বলছি তো, তোর ঘর আবার সুন্দর হবে, কাঁটাবন থাকবে না', এবার একটু উত্যক্ত হয়ে উঠেছিল সীতাংশু। চুপ থাকতে না পেরে শ্লেষের গলায় বলেছিল, 'বাগানের মতন সাজিয়ে দেওয়া হবে তোর বাংলো, যেমন ছিল।'

'কবে। কখন?' বুক চাপড়ান শেষ করে রণধীর বুঝি মাথার চুল ছিঁড়তে আরম্ভ করেছিল। দুপুরের কাজ সেরে বাড়ি গিয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে সুখী আবার তখনি বিকেলের কাজে হাত লাগাতে ফিরে এসেছিল।

'না, এতটা অস্থির হলে তো চলবে না, ডাক্তারবাবু।' নতুন করে ডাক্তারের অস্থিরতা আরম্ভ হয়েছে দেখে সে-ও বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। 'বলছি তো, আমি নিজে গিয়ে একদিন সব গোছগাছ করে দিয়ে আসব। একটুও এলোমেলো দেখাবে না আপনার ঘর, বৌদি যেমন

করে সাজিয়ে রাখতেন—'

'কবে, কখন?' আর্ত অসহায় চোখ দুটো সুখীর মুখের দিকে মেলে ধরেছিল রণধীর।

'দুদিন এখানে থেকে বিশ্রাম করুন, চেহারা এত খারাপ হয়ে গেছে আপনার—' সুখী নতুন করে বোঝাতে আরম্ভ করেছিল। কিন্তু রণধীর তা শুনল না, অবোধ শিশুর মতন সুখীর দুটো হাত জড়িয়ে ধরে হাউ-হাউ করে উঠল।

'না, না, এক মুহূর্ত এখানে আমার থাকতে ইচ্ছে করছে না, আমার ঘর আমার স্বপ্ন—আমার সব সঙ্গতি যে ওখানে পড়ে আছে, মাধবের দিদি। আমি এখনি রাণীরবাগ চলে যাব।' বলতে বলতে সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

'আশ্চর্য আপনি!' এবার সুখী ডাক্তারের একটা হাত চেপে ধরল। 'একটু পরেই অন্ধকার হয়ে যাবে, গাড়িটাও নিয়ে আসেন নি, এতটা রাস্তা হেঁটে যেতে আপনার কষ্ট হবে—'

এই সময়টা সীতাংশু চুপ থেকে তাকিয়ে সুখীকে দেখছিল। হলুদে-সবুজে ডোরাকাটা সুন্দর একখানা শাড়ি পরনে, টুকটুকে লাল রঙের একটা ব্লাউজ গায়ে, যেন বিকেলে এখানে আসবার আগে পরিপাটি করে চুল বেঁধেছিল তাই বড় বেশি উঁচু দেখাচ্ছিল খোঁপাটা, পান খাওয়া ঠোঁট দুটো কেমন টসটস করছিল।

অবশ্য মাধবের দিদির এমন সাজসজ্জা সীতাংশু রোজই দেখছিল। মানুষকে পরিপাটি পরিচ্ছন্ন থাকতে দেখতে যেমন ভালবাসে তেমনি নিজেও সর্বদা সেজেগুজে পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকতে যুবতীর কত না আগ্রহ। তা হলেও সেদিন বিকেলে মাধবের দিদির সাজটা একটু বেশি সুন্দর লাগছিল্। হয়তো এতটা তার ইচ্ছাকৃত ছিল না, বসন্তের বিকেল, তার ওপর গায়ের রংটাও এমন অনবদ্য উজ্জ্বল— হলুদে সবুজে ডোরাকাটা শাড়িতে রূপলাবণ্য যেন ফেটে পড়ছিল। আর ঐ পানের রসে ছোপানো ঠোঁট।

কিন্তু সীতাংশু তার চোখ তুটোই বেশি করে দেখছিল। মমতার বান ডেকেছিল সেখানে। অস্থির অপ্রকৃতিস্থ ডাক্তারকে সান্ত্বনা দিতে আর যেন ভাষা খুঁজে পাচ্ছিল না মাধবের দিদি। কালো গভীর ছলছল দৃষ্টি নিয়ে অসহায়ের মতন একবার সে সীতাংশুকে দেখল, যেন সীতাংশুর পরামর্শ খুঁজল। কেননা ঠিক সেই মুহূর্তে তার মুঠো থেকে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বেড়ার কাছে ছুটে গিয়ে ডাক্তার খুঁটির গায়ে মাথাটা ঠুকছিল।

'কী করা যায়!' অস্ফুট গলায় সুখী শুধোলো।

'আমিও বুঝতে পারছি না।' নিচু গলায় সীতাংশু উত্তর করল। তারপর এক সেকেণ্ড চুপ থেকে ভাবল। তারপর আবার সুখীর চোখ তুটো দেখল। 'আমার মনে হয় চলে যাওয়াই ভাল।'

'একলা যাবে এই রাত করে? এভাবে একা ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে কি!'

'না, তা হয় না।' সীতাংশু মাথা নাড়ল।

'আমার ঘর—আমার সাজান ঘর কী হয়ে গেল!' চিৎকার করে কেঁদে সমস্ত অরণ্যকে শোনাচ্ছিল ডাক্তার। আর মাথা ঠুকছিল।

'ঘরের অগোছাল চেহারাটাই ভুলতে পারছে না।' বিড়বিড় করে বলল সুখী।

'হুঁ, তুমিও আজই চলে যাও', মাটির দিকে চোখ রেখে সীতাংশু বলেছিল, 'তুদিন থেকে ঘরটর গুছিয়ে দেবে, আর ডাক্তারবাবুর খাওয়া-দাওয়াটাও যাতে সময়মত হয় দেখবে। তু-একটা দিন একজন সেখানে না থাকলে চলবে না।'

সুখী একটা ঢোক গিলেছিল।

'কিন্তু এখানে সব করবে কে, দেখবে কে?'

'আমার জন্যে ভাবতে হবে না।' একটু ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছিল মাধবের দিদি। সীতাংশু বুঝিয়েছিল, 'তুদিন আমি নিজেই চালিয়ে নিতে পারব। তা ছাড়া তুমি আসার আগে এতকাল তো একা

একা আমাকেই সব করতে হয়েছিল।' কথাটা শেষ করে সে একটু হেসেছিল যেন।

'আমি দুদিনের বেশি থাকব না।' সুখী তৎক্ষণাৎ বলে ফেলেছিল। সীতাংশু কিন্তু আর কিছু বলে নি। তৎক্ষণাৎ ইয়াসিনকে ডাকিয়ে গ্যারেজ থেকে ট্রাকটা বার করতে বলল। ঘুর পথ হলেও রাত করে হেঁটে না গিয়ে গাড়ি করে যাওয়াই যে নিরাপদ এই বিষয়ে কারো সন্দেহ ছিল না। তা ছাড়া ডাক্তার একলা যাচ্ছে না, সুখীও যখন সঙ্গে যাচ্ছে। মাধবকে পাঠিয়ে সুখী বাড়ি থেকে অতিরিক্ত দুখানা শাড়ি ও ব্লাউজ আনিয়ে নিল। দু'জনের রওনা হতে হতে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল, সীতাংশুর মনে আছে। তার একটা কারণও ছিল। স্টার্ট নেবার সময় গাড়ির এঞ্জিন একটু গোলমাল করেছিল। সেটা সারিয়ে নিতে ইয়াসিনের যেন বেশ খানিকটা সময় লেগেছিল। আর এই সময়টা রণধীর আগাগোড়া পাথরের মূর্তির মতন আমলকীতলায় স্থির স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কারো দিকে তাকায় নি কারো সঙ্গে কথা বলে নি। সুখী সঙ্গে যাচ্ছে শোনার পর থেকে কান্নাটা অবশ্য থেমে গিয়েছিল, কান্না এবং অস্থিরতা। অতিরিক্ত শান্ত ও চুপ থেকে একদৃষ্টে ইয়াসিনের এঞ্জিন সারান দেখছিল।

হুঁ, তিন মাস আগের ঘটনা। সুখীর আর টিয়াটুলির জঙ্গলে ফিরে আসা হয় নি। দুদিন-চারদিন করে মাসের প্রায় আধাআধি যখন কেটে গেল, সীতাংশু বুঝতে পারল রাণীরবাগের বাংলো ছেড়ে মাধবের দিদি আসতে পারছে না। ঐ পর্যন্ত সীতাংশু মনে মনে মানুষটার জন্য অপেক্ষা করেছিল ঠিকই, তারপর আশা ছেড়ে দিয়েছে। তারপর বুঝতে পেরেছে কোনোদিনই সুখী আর এখানে আসবে না।

ছোট্ট ছেলে মাধব তো নয়ই, মুরারিও এই নিয়ে সীতাংশুকে কোনো প্রশ্ন করে নি।

যেন তারা বুঝতে পেরেছিল সুখী না এলেও সীতাংশুর তেমন কোনো কষ্ট হবে না। তার এই জঙ্গলের ডেরায় ঝাঁটা পড়ুক বা না পড়ুক, জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখা হোক কি না হোক, নিয়মিত উনুন ধরিয়ে কেউ তাকে রান্না করে দিক না দিক—এই নিয়ে সীতাংশু মোটেই মাথা ঘামাবে না। যেমন চলছিল চলে যাবে তার, চলে যাচ্ছে—যেমন সুখী আসার আগে চলে যাচ্ছিল। বরং সুখী না থাকলে ডাক্তারবাবুর অসুবিধা হবে, চরম কষ্টে পড়বে ভদ্রলোক। ঘর ঝাঁট দেওয়া, ঘর গোছান, ধোয়া-মোছা রান্না-বান্না, পোষাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার রাখা—পান থেকে চুন খসবার যার উপায় নেই,—তাই তো, সেই মানুষকে একলা ফেলে রেখে মাধবের দিদিই বা কী করে চলে আসে। চাকর? পাঁচটা চাকর থাকলেও সংসারে এমন মানুষ আছে যাকে দেখেশুনে রাখতে আরো একজোড়া বিশেষ চোখের দরকার পড়ে। ব্রততীর আমলে চাকর ছিল না। তবে আর চব্বিশ ঘণ্টা তাকে এতসব দেখতে হতো কেন। কাজেই সেই বিশেষ চোখের দেখা অন্য লোক দিয়ে হবে না বলেই রাণীরবাগের ডাক্তারের দেখাশোনার ভার এখন মুরারির মেয়ে নিয়েছে।

না, সীতাংশুর অসুবিধা হচ্ছে না। তা ছাড়া, তার ঘরের কাজকর্ম করতে একেবারেই যে কেউ নেই এমন তো নয়, মাধব রয়েছে।

মাধব। সারামুখে একটা নিঃশব্দ হাসি ঝুলিয়ে সীতাংশু জানালায় উঁকি দিল। এটা তার ঘরের পিছন। হিজল গাছটা দেখা যাচ্ছে। দুধের সরের মতন পাতলা জ্যোৎস্নায় কাফেলার বেড়াটা তার চোখে পড়ল। হুঁ, যেখানে ধলাকে কবর দেওয়া হয়েছিল। বেড়ার প্রায় বারো আনাই ভেঙে পড়েছে, আগাছা গজিয়েছে খুব। ঝোপের কাছে মাধবকে দেখা গেল। সীতাংশু তাই আশা করছিল। মুঠো করে জোনাকী ধরছে ছেলে। ক'দিন ধরে এই নেশা হয়েছে। অন্য কোনো জীবজন্তু না, অন্ধকার হলেই ঝোপের মধ্যে ঢুকে জোনাকী পোকা ধরা।

তাই তো, একটা নেশা না থাকলে মানুষ বাঁচে কী করে।

সীতাংশু বাধা দিল না, ডাকল না তাকে। একটু পরে নিজে থেকেই শ্রান্ত হয়ে ঘরে এসে ঢুকবে, এবং তখনি মাত্বর বিছিয়ে মেঝের এক কোণায় শুয়ে পড়বে। তখন আর সীতাংশু ঐ ছোঁড়াকে কাজের কথা বলবে কী, ফুসফাস করে তার নাক ডাকতে আরম্ভ করবে। রাত্রে এখানেই শোয়। এখন আর দিদি নেই। তাই সীতাংশু ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে একলা তাকে বাড়ি যেতে দেয় না।

যত সকাল সকাল সে ঘুমিয়ে পড়ে ততই সীতাংশুর সুবিধা। মাধবের নাক ডাকতে আরম্ভ করলে সে আর একমিনিট ঘরে থাকে না, আস্তে আস্তে বেরিয়ে পড়ে। বাইরে থেকে দরজায় শিকল তুলে দিয়ে লম্বা পা ফেলে হাঁটতে আরম্ভ করে। তার এই নিঃসঙ্গ নৈশ-অভিযান তিন মাস একনাগাড়ে চলেছে। একদিন ব্যতিক্রম ঘটে নি। মাধবের যেমন জোনাকী পোকা ধরার নেশা, তেমনি রাত হলেই খাদের দিকে ছুটে যাওয়ার নেশায় পেয়েছে তাকে। কেমন যেন শ্বাস বন্ধ করে ছুটতে আরম্ভ করে সে। তারপর বাঁশের সাঁকোটার কাছে গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ায়। তারপর একটু দম নিয়ে আস্তে আস্তে সাঁকোর ওপর ওঠে। না, অন্ধকার কি জ্যোৎস্না, আকাশের তারা কি মেঘ, দূরের ঝাপসা গাছপালা বা সাঁকোর নিচের অন্ধকার পাতালপুরী—কিছুই তার দেখার নেই। সন্ধানী চোখ নিয়ে সে সাঁকোর তুপাশের বাঁশ তুটো শুধু দেখে, কেউ বলে রেলিং, কেউ বলে বেড়া—খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সীতাংশু বেড়াটা পরীক্ষা করে, রোজই করছে, ভাঙা বাঁশ তার চোখে পড়ে না কেন। একদিকের বেড়া দেখা হয়ে যাবার পর আর একদিকের বেড়াটা খুঁটিয়ে দেখতে আরম্ভ করে সে। দেখা হয়ে যাবার পর চোয়াল তুটো শক্ত করে স্থির হয়ে দাঁড়ায়। তখন আকাশের দিকে চোখ রেখে নিজের মনে হাসে। না কি সেদিন বাঁশটা ভেঙে যাবার পর কেউ রাতারাতি আর একটা নতুন বাঁশ বেঁধে দিয়েছিল। এমন পরোপকারী মানুষ কেউ এই

তল্লাটে আছে ? তাছাড়া সব ক'টা বাঁশই তো শ্যাওলা ধরে কালো হয়ে গেছে। নতুন বাঁশ খুঁজতে গিয়ে এত হয়রান হচ্ছে কেন সে! তার কপাল ঘামতে থাকে, অঘ্রাণের ঠাণ্ডা রাত্রে ঘেমেছিল, পৌষে ঘেমেছে, এখন তো মাঘ শেষ হয়ে গেল, ফাল্গুনের মিষ্টি গরম এসে গেল। এখন না ঘামাটাই অস্বাভাবিক। 'বুঝতে পেরেছি, তুই আমায় অবিশ্বাস করছিস সীতাংশু, আমার কথা তোর বিশ্বাস হচ্ছে না।'

'কি করে বুঝলি ?'

'তোর চোখ বলছে, তোর তাকানো দেখে বোঝা যাচ্ছে।'

সীতাংশু চট্ করে চোখটা আকাশ থেকে নামিয়ে আনে।

'না, না, দরকার কি আমার এভাবে তাকানো, আমি কেন চোখে অবিশ্বাস বয়ে বেড়াব !' যেন লজ্জা পেয়ে নিজের মনে বিড়বিড় করে ওঠে সীতাংশু, মাথাটা দুবার ঝাঁকায়, তারপর আস্তে আস্তে সাঁকো থেকে নেমে আসে। যখন সে ডেরায় ফেরে তখন সপ্তর্ষি ঘুরে গেছে, চাঁদ থাকলে চাঁদ ডুবে যায়। শিকল নামিয়ে আস্তে আস্তে সে ভেতরে ঢোকে। হ্যারিকেনটা বাড়িয়ে দিয়ে মাধবের ম ৈ দেখে। স্বপ্ন দেখে কিশোর হাসছে। হয়তো একটা উদের বাচ্চা দেখছে সে এখন, কি সাদা ধবধবে একটা খরগোসের ছানা। না কি নাম-না-জানা রঙিন ফুটফুটে কোনো পাখি। আর সীতাংশু তখন চিন্তা করে, ইতিমধ্যে রণধীর মাধবের দিদিকে একটা ভাল পাখি জোগাড় করে দিয়েছে কি ? শোনে নি সে। তবে এটা শোনা গেছে, তার কাঠের বেপারীদের মধ্যে যেন কার মুখ থেকে শুনেছে সীতাংশু, রাণীরবাগের ডাক্তারবাবু একটা ছোট গাড়ি কিনেছে। মোটর সাইকেলটা বেচে দিয়েছে। মাধবের দিদিকে পাশে বসিয়ে প্রায়ই বিকেলের দিকে অনেকটা রাস্তা বেড়ায়, মাঝে মাঝে পিয়ালীছড়া ছাড়িয়ে চণ্ডীতলা পর্যন্ত গাড়ি চালিয়ে যায়। সুখী বেশ মোটা হয়েছে, রংটা আরো বেশি ফরসা হয়েছে।